হেনরি রাইডার হ্যাগার্ডের

মর্নিং স্টার

রূপান্তর: নিয়াজ মোরশেদ

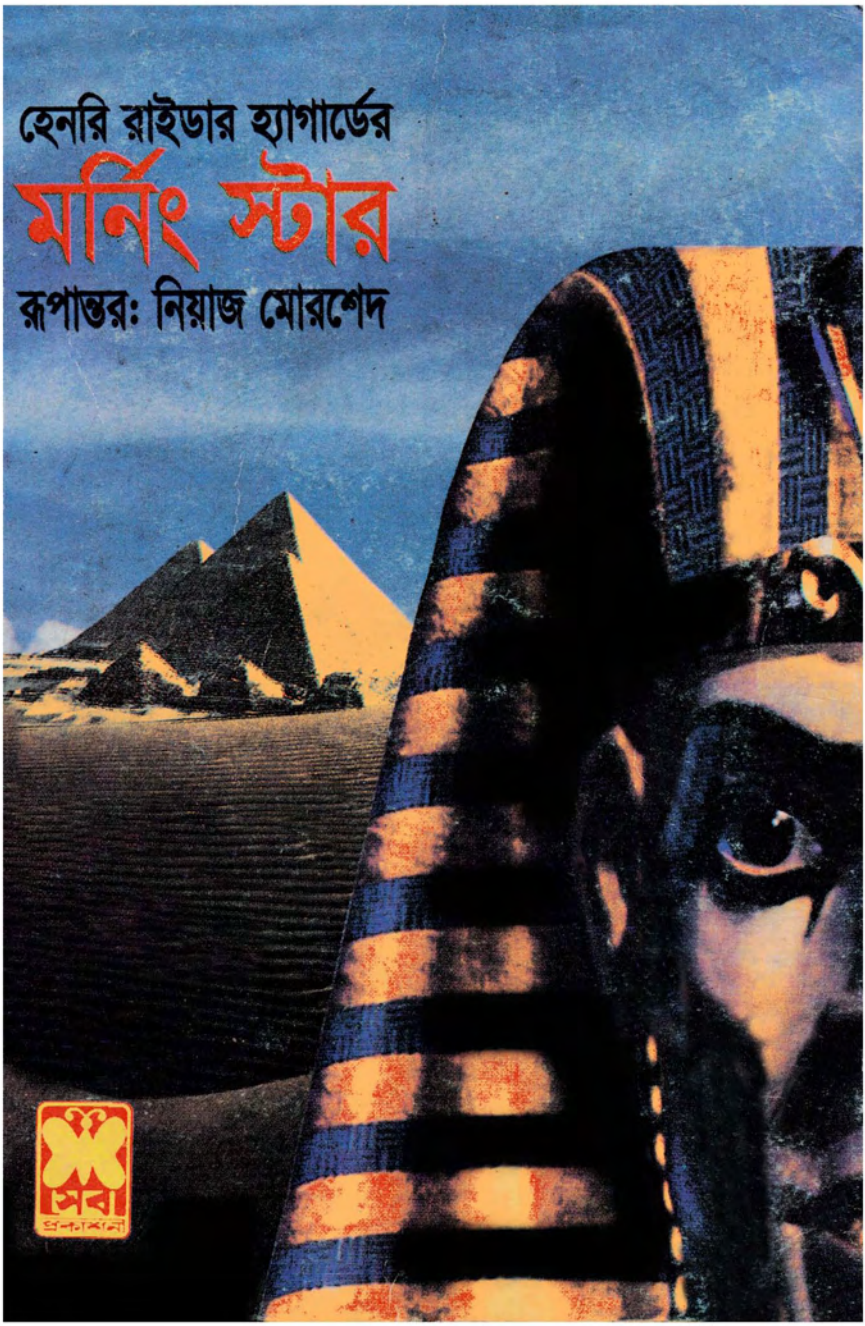

সেবা প্রকাশনী

অনুবাদ

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

মর্নিং স্টার

রূপান্তরঃ নিয়াজ মোরশেদ

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-3169-3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯১

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি.পি.ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.anebooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

MORNING STAR
By: Henry Rider Haggard
Trans. By: Neaz Morshed

সেবা প্রকাশনী

আটত্রিশ টাকা

মর্নিং স্টার

সেবা প্রকাশনীর
ক'টি কিশোর ক্লাসিক

লিউ ওয়ালেস/কাজী মায়মুর হোসেন
বেন-হার
চার্লস নর্ডহফ ও জেমস্ নরম্যান হল/নিয়াজ মোরশেদ
বাউন্টিতে বিদ্রোহ
সারভান্তেস্/নিয়াজ মোরশেদ
ডন কুইক্সোট
কানাইলাল রায়
কিশোর রামায়ণ
দশ কুমার চরিত
শেক্সপীয়ার/কাজী শাহনূর হোসেন
নাটক থেকে গল্প
ভিক্টর হুগো
লা মিজারেবল/ইফতেখার আমিন
দ্য ম্যান হু লাফস/শেখ আবদুল হাকিম
চার্লস ডিকেন্স/নিয়াজ মোরশেদ
অলিভার টুইস্ট
আ টেল অভ টু সিটিজ
মার্ক টোয়েন/শেখ আবদুল হাকিম
পুডন্‌হেড উইলসন
এমিলি ব্রনটি/নিয়াজ মোরশেদ
ওয়াদারিং হাইটস
হ্যারিয়েট বীচার স্টো/অনীশ দাস অপু
আঙ্কল টমস কেবিন
হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড/কাজী মায়মুর হোসেন
চাইল্ড অভ স্টর্ম
লর্ড লিটন/নিয়াজ মোরশেদ
দ্য লাস্ট ডেজ অভ পম্পেই
লরা ইঙ্গলস ওয়াইল্ডার/কাজী আনোয়ার হোসেন
ফার্মার বয়
লিটল হাউজ অন দ্য প্রেয়ারি
অন দ্য ব্যাঙ্কস অভ প্লাম ক্রীক
লিটল টাউন অন দ্য প্রেয়ারি
রাফায়েল সাবাতিনি/কাজী আনোয়ার হোসেন
দ্য ব্ল্যাক সোয়ান
লাভ অ্যাট আর্মস
টমাস হার্ডি/কাজী শাহনূর হোসেন
টেস অভ দ্য ডার্বারভিল
ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড
জুড দ্য অবসক্যিওর
দ্য মেয়র অভ ক্যাস্টারব্রিজ
চার্লস কিংসলে/শেখ আবদুল হাকিম
হাইপেশিয়া
এইচ. দ্য ভের স্ট্যাকপোল/মামনুন শফিক
ব্লু লেগুন
হেনরি হল কেইন/কাজী মায়মুর হোসেন
দ্য বন্ডম্যান
স্ট্যানলি ওয়েইম্যান/কাজী আনোয়ার হোসেন
আ জেন্টলম্যান অভ ফ্রান্স
আলেকযান্ডার বেলায়েভ/কাজী মায়মুর হোসেন
দি অ্যামফিবিয়ান ম্যান
আর্নেস্ট হেমিংওয়ে
দ্য ফিফ্‌থ্ কলাম/শেখ আপালা হাকিম
আ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস/নিয়াজ মোরশেদ
আলেকজান্দার দ্যুমা
মার্গারেট ডি-ভ্যালয়/শেখ আপালা হাকিম

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

লেখকের কথা

'কা' অর্থাৎ 'দ্বিতীয় সত্তা' সিংহাসনে বসে আছে আর সেই কা-য়ের মালিক আসল দেহ নিয়ে দূর-দূরান্তরে নানা দুঃসাহসিক কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে–এমনকি প্রাচীন মিশরের কাহিনীতেও কা বা দ্বিতীয় সত্তা নিয়ে এমন ধারণার অবতারণাকে বাড়াবাড়ি বলে মনে হতে পারে। আমার মনে হয় ব্যাপারটা মোটেই তেমন নয়। প্রাচীন মিশরীয় তত্ত্ব অনুসারে কা বা দ্বিতীয় সত্তার নিজস্ব অস্তিত্ব ছিল, ওয়াইডারম্যান যাকে বলেছেন 'ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিত্ব'। দেহ নশ্বর হলেও কা অবিনশ্বর। দেহ মারা গেলেও কা মারা যায় না। দেহের মৃত্যুর পর কা সেই দেহ ছেড়ে গিয়ে অপেক্ষায় থাকে দেহের পুনরুজ্জীবনের জন্য, যাতে কা আবার দেহের সঙ্গে মিলিত হয়ে অনন্তকাল বসবাস করতে পারে। এ-প্রসঙ্গে আবারও ওয়াইডারম্যানের উদ্ধৃতি 'কা দেহ ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু দেহ কা ছাড়া বাঁচতে পারে না।...তা সত্ত্বেও কা দেহের মতই একটি সত্তা।' এমনকি মনে হতে পারে কোন কোন দিক থেকে দেহের চাইতেও শক্তিশালী ও উন্নত এই কা। মিশরের নৃপতিরা অনেক সময়ই নিজেদের কা-দের দেবতা জ্ঞান করে তাদের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য দিতেন।

মাসপেরো অনূদিত 'সেৎনা অ্যান্ড দ্য ম্যাজিক বুক' এবং ফ্লাইন্ডার্স পেট্রির 'ইজিপ্সিয়ন টেল্‌স' গ্রন্থে কা-দের সুস্পষ্টভাবে নিজস্ব ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়–স্বামী মেম্ফিসে সমাহিত, আর স্ত্রী রয়েছে কপটোসে, কিন্তু স্ত্রীর কা শত শত মাইল দূরে স্বামীর সমাধি-মন্দিরে গিয়ে যাদুর বই চুরি করতে আসা রাজপুত্রের সাথে কথা বলছে। তবে বর্তমান উপন্যাসে কা-য়ের যে অসাধারণ ক্ষমতার বিবরণ দেয়া হয়েছে, এমন কোন বর্ণনা আমি কোন প্রাচীন মিশরীয় পুঁথি বা পাণ্ডুলিপিতে পাইনি। প্রাচীন মিশরীয়দের সর্বোচ্চ দেবতা আমেন-এর দয়ায় নেতের-তুয়ার দ্বিতীয় সত্তার অপরিমেয় ক্ষমতা লাভ এবং নেতের-তুয়াকে তার বাবার হত্যাকারী চাচার জোর করে বিয়ে করতে চাওয়ার পর সেই বিয়ে ঠেকানো এবং নেতের-তুয়াকে রক্ষা করার জন্যে তার কা-য়ের সক্রিয় হয়ে ওঠা–এসবই আমার কল্পনাপ্রসূত।

চাচার-ভাইঝির বিয়ের কথায় আঁৎকে ওঠার কিছু নেই। প্রাচীন মিশরে রাজা-বাদশাহদের মধ্যে শুধু নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যেও ভাই-বোনের বিয়ের প্রচলন ছিল। এ-কাহিনীতেও আছে মার্মিসের সঙ্গে

সৎবোন আসতির বিয়ের কথা।

যাদু-মোমের মূর্তির সাহায্যে তুক-তাক করা, এই কাহিনীতে যাদুকর কাকু যেমন করেছে ফারাওকে–এ-ধরনের বহু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচীন মিশরীয় আখ্যান-উপাখ্যানে। তিন হাজার বছরেরও বেশি আগে তৃতীয় রামেসিসের সময় রাজাকে হত্যা করার জন্য এমন মূর্তি ব্যবহার করা হয়েছিল বলে প্রাচীন বিবরণীতে পাওয়া যায়। 'জঘন্য অপরাধ' হিসেবে বিবেচিত এই কাজ যারা করত তাদের মনে করা হত 'দেশের ঘৃণ্যতম মানুষ'। প্রতিপক্ষের ক্ষতি করার জন্য এক ধরনের যাদু-দলিলের বিবরণও পাওয়া যায়। এর সাহায্যে 'দেবতাদের যাদুশক্তি' ব্যবহার করত মানুষ। এধরনের যাদু-টোনা যারা করত তাদের পরিণাম ভাল হত না। তাদের অপরাধ ধরা পড়ত, এবং তারা শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করতে বাধ্য হত।

কা ন যাদু-মোমের মূর্তির ক্ষমতা সম্পর্কে আমি একটু বাড়িয়ে লিখেছি বটে, তবে এ-যুগেও তো এধরনের ঘটনার কথা জানা যায়। পশ্চিম আফ্রিকায় এখনও দেখা যায়, প্রতিপক্ষের অনিষ্ট করার জন্য তার আদলে পুতুল তৈরি করে তার গায়ে পেরেক বা সুঁই ফুটিয়ে দেয়া হয়। কোন পর্যটক বা মিশর-তত্ত্বের ছাত্রের কাছে দূর অতীতের মিশর যে রহস্যময়তা নিয়ে ধরা দেয়, এ-কাহিনীতে আমি কেবল সেই পরিবেশ এবং রঙ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। নেতের-তুয়া নামের কেউ হয়তো সত্যিই সিংহাসনে বসেনি, তবে আমেন-এর 'আরেক কন্যা', দোর্দণ্ডপ্রতাপ হাতশেপুর মাথায় মিশরের রাজমুকুট উঠেছিল। তিনি দেশে দেশে দূত পাঠিয়েছিলেন (প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র) পান্টের রহস্য সন্ধানে। এসব নিয়ে চমকপ্রদ রোমাঞ্চকর বিবরণীও নিশ্চয়ই প্রচুর লেখা হয়েছে, যদিও ধর্মগুরু পুরোহিতদের সব বিবরণীই সংক্ষিপ্ত।

এযুগের পাঠকের কৌতূহল মিটবে এই বিশ্বাস থেকে আমি প্রাচীন মিশরের এই উপাখ্যান উপস্থাপনের সাহস দেখিয়েছি। উদ্দেশ্য প্রাচীন মিশরের চেয়েও প্রাচীন, আর তা হচ্ছে শত বিপদ ও কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও প্রকৃত প্রেমের বিজয়কে তুলে ধরা। দেবতারা এধরনের প্রেমিক-প্রেমিকাদের পক্ষে থাকেন, এবং তাদের সমর্থনে নানা অলৌকিক কাণ্ড-কারখানা ঘটান–এমন ভাবতে ভালই লাগে, যদিও আধুনিক বিজ্ঞান বলে তেমন অলৌকিক কিছু ঘটতে পারে না।

প্রাচীন মিশর ও যেসব জাতির সঙ্গে এই দেশটি যুদ্ধ ও ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে, রহস্যময় ও ভয়ানক যাদুশক্তি তাদের জীবনকে কীভাবে

প্রভাবিত করেছে তা জানতে বেশি দূর যেতে হয় না, বাইবেলের বুক অভ এক্সোডাস পড়াই যথেষ্ট। প্রাচীন মিশরের মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করত। বহু নাম আর প্রতীক রূপে তারা তাঁকে কল্পনা করত। এবং তারা বিশ্বাস করত, যে ঈশ্বরের উপাসনা তারা করে সেই ঈশ্বরই তাঁর ইচ্ছাপূরণ বা মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ঐসব রহস্যময় পন্থার আশ্রয় নেন। একারণেই প্রাচীন মিশরের ইতিহাস অলৌকিকতা আর যাদুর কাহিনীতে ঠাসা।

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড

১
আবির ষড়যন্ত্র

সন্ধ্যা নামছে মিশরে। হাজার হাজার বছর আগের কথা। নীলনদের তীরে এখন যাকে বলা হয় লাক্সর বা কার্নাক, প্রাচীন যুগের সেই বিশাল নগরী উয়াস্ট বা থিবি-র প্রাচীরের কাছে পৌঁছেছে মেফিসের প্রশাসক কুমার আবির জাহাজ। বিশালদেহী আবির রং কাল। তার মা ঘৃণিত হিকসোস জাতির মেয়ে। মায়ের রং পেয়েছে আবি। বর্বর হিকসোসরা একবার মিশরের সিংহাসন দখল করে নিয়েছিল। সেই থেকে তারা ঘৃণিত।

জাহাজের পাটাতনে সুদৃশ্য তাঁবুর নিচে বসে আছে আবি। দূরে ঊষর পাহাড়ী এলাকায় রাজাদের সমাধিসৌধের ওপর অগ্নিপিণ্ডের মত জ্বলছে অস্তায়মান সূর্য। সেদিকে আবির চোখ। পাশে দাঁড়িয়ে দুই দাসী চামর দোলাচ্ছে। আবির কর্কশ মুখের ভ্রূকুটি আর বিশাল কাল চোখে আগুন দেখে তারা বুঝতে পারছে ভয়ানক রেগে আছে সে। একটু পরে তারাও পেলো আগুনের উত্তাপ। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় অপরূপ দেখাচ্ছে থিবি নগরীকে। সুউচ্চ মন্দির আর প্রাসাদশ্রেণী দেখে মুগ্ধ এক দাসী মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হলো। তার হাতের চামরের পালক আলতো করে ছুঁয়ে গেল আবির চুল। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে মেয়েটার কান বরাবর এক চড় কষিয়ে দিল আবি। পাটাতনের ওপর ছিটকে পড়ল মেয়েটা।

'আনাড়ি বেড়াল!' খেঁকিয়ে উঠল আবি। 'ফের যদি এমন করিস, চাবকে তোর জামা পিঠে সেঁটে দেব!'

'মাফ করে দিন, মহামহিম প্রভু,' কাঁদতে কাঁদতে বললো মেয়েটা, 'হঠাৎ হয়ে গেছে। বাতাসে পাখা নড়ে গেছিল।'

'আরও সাবধান না হলে চাবুক তুই এড়াতে পারবি না, মেরিত্রা। নাকি কান্না থামিয়ে এখন যা, জ্যোতিষী কাকুকে পাঠিয়ে দে। দুজনই যা। তোদের কুৎসিত মুখ দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

উঠে দাঁড়ালো মেয়েটা। সঙ্গিনীকে নিয়ে ত্রস্ত পায়ে চলে গেল নিচে নামবার সিঁড়ির দিকে।

'আমাকে বলে বেড়াল!' দাঁতে দাঁত চেপে বললো মেরিত্রা। 'আমি

যদি বেড়াল হই তো প্রতিহিংসার দেবী বেড়ালমুখো সেখেত আমার ধর্ম-মা।'

'আমাদেরকে বলে কুৎসিত!' ফুঁসে উঠলো অন্যজন। 'রাজসভার প্রত্যেকে আমাদের এত প্রশংসা করে, আর ও বলে কুৎসিত! কামরে গিলে খাক কালো শুয়োরটাকে!'

'রাজসভার ওদের কথা আর বোলো না! এতই যদি প্রশংসা তো কিনে নিলেই পারে আমাদের। উপযুক্ত দাম পেলে দাসী তো দাসী নিজের মেয়েদেরও বেচতে পারে আবি!'

'বিনে পয়সায় একদিন পেয়ে যাবে এই আশাতেই কেনে না। যা-ই বলো, আমি কিন্তু চাই ওদের কেউ পেয়ে যাক আমাকে। এই জীবন আর সহ্য হয় না। সুযোগ থাকতে আনন্দ-ফুর্তি করে নাও। কে জানে মৃত্যুদেব ওসিরিস কোন কোনায় ঘাপটি মেরে আছেন।'

'চুপ!' ফিসফিসিয়ে উঠলো মেরিত্রা, 'বদমাশ জ্যোতিষীটা এদিকেই আসছে! এ-ব্যাটাও মনে হচ্ছে রেগে আছে।'

হাতে হাত ধরে শীর্ণদেহ জ্যোতিষীর দিকে এগিয়ে গেল দুই তরুণী। শ্রদ্ধা জানানোর ভঙ্গিতে মাথা নোয়ালো।

'হে নক্ষত্রদের প্রভু,' মেরিত্রা বললো, 'আপনার জন্য বার্তা নিয়ে এসেছি। না, আমার গালের দিকে তাকাবেন না। এগুলো কোন যাদুর চিহ্ন নয়। পাঁচ আঙুলের এই ছাপ আমাকে দান করেছেন মহামহিম কুমার আবি, যার পিতা ছিলেন ফারাও, যিনি এখন মনের সুখে ওসিরিসে রাজত্ব করছেন ইত্যাদি ইত্যাদি, এবং যার মাতা এক ঐশ্বরিক নারী, যাকে সৃষ্টির দেবতা তাহ্ বা খেম কালো রঙের গামলায় চুবিয়ে উঠিয়েছিলেন।'

'খেম না হেম।' সন্ত্রস্ত চোখে চারদিকে তাকাল কাকু। কেউ নেই দেখে বলল, 'তোমার আরও সাবধান হওয়া উচিৎ, মেরিত্রা। কুমার আবি তার মৃতা মায়ের গায়ের রঙের এমন সবিস্তার বিবরণ শুনতে পছন্দ করবেন না। কিন্তু তোমাকে চড় মারল কেন?'

বললো মেরিত্রা কেন তাকে চড় মারা হয়েছে।

'আ-হা-হা,' কাকু বললো, 'আমি হলে অমন সুন্দর গালে চুমু খেতাম। সত্যিই তুমি সুন্দর।'

'কী, বোন, বলিনি, শক্ত খোসার ভেতরেই মিষ্টি বাদাম থাকে?' মেরিত্রা বললো। 'প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ, হে জ্ঞানের সাগর। এখন আমাদের ভাগ্যে কী লেখা আছে বলবেন বিনা পয়সায়?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। অন্তত আমি যে পারিশ্রমিক চাইব তা দিতে

তোমাদের কোন খরচ হবে না।' গম্ভীর হয়ে উঠলো কাকুর কণ্ঠস্বর, 'ফালতু কথা রাখো এখন, মনে হচ্ছে প্রভুর মেজাজ খারাপ?'

'এর চেয়ে খারাপ আর কখনও দেখিনি। আমার ভাগ্য ভাল, জ্যোতিষী, গ্রহ-নক্ষত্রের বিচার করেন আপনি, আমি না। ঐ শুনুন!'

ওপর থেকে ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল আবির, 'হতভাগা জ্যোতিষীটা কোথায়?'

'বলছিলাম না? যান, যান তাড়াতাড়ি যান।'

'হ্যাঁ, যাই,' মইয়ের দিকে ছুটতে ছুটতে বললো কাকু।

'দেব-দেবীরা সব আপনার সহায় হোন!' পেছন থেকে বললো এক মেয়ে। 'আজ তাদের সবার সাহায্যই আপনার দরকার হবে!'

'জীবিত যদি ফিরতে পারেন, প্রতিশ্রুতির কথা ভুলবেন না যেন! আমাদের ভাগ্য গণনা করে দেবেন বলে কথা দিয়েছেন!' যোগ করলো অন্যজন।

একটু পরেই দেখা গেল গ্রহ-নক্ষত্রের বেত্তা দীর্ঘদেহী বাঁকানো নাকওয়ালা মানুষটি উপরের পাটাতনে আবির সামনে ষাষ্টাঙ্গে প্রণত। সিরীয় ধাঁচের টুপিটি খুলে পড়েছে চুলহীন মাথা থেকে।

'এতক্ষণ লাগলো কেন আসতে?' খেঁকিয়ে উঠলো আবি।

'হে সূর্যদেবের রাজকীয় পুত্র, আপনার দাসীরা আমাকে খুঁজে পায়নি। আমি নিজের কামরায় কাজ করছিলাম।'

'তাই নাকি? আমার তো মনে হলো ছুঁড়িগুলো নিচে খিল খিল করে হাসছে তোমার সঙ্গে। আমাকে কী বলে ডাকলে তুমি? সূর্যদেবের রাজকীয় পুত্র? এ তো ফারাওয়ের নাম! নক্ষত্ররা তোমাকে কিছু দেখিয়েছে নাকি?' ভ্রূ কুঁচকে তাকালো আবি কাকুর দিকে।

'না, কুমার, ঠিক তা নয়। যা মোটামুটি অবধারিত তা নিয়ে নতুন করে গণা-পড়া করার প্রয়োজন বোধ করিনি।'

'মোটামুটি!' গম্ভীর কণ্ঠে বললো আবি। 'তোমার এই *মোটামুটির* মানেটা কী? আমি আমার ভাগ্যের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, জানি না মিশর সাম্রাজ্যের ফারাও হতে পারব নাকি ব-দ্বীপ অঞ্চলের একটা নগরী আর প্রদেশের সামান্য শাসনকর্তাই থেকে যাব! আর তুমি বলছ মোটামুটি! এর মানেটা কী?'

'মহানুভব ঠিক কী জানতে চান যদি বলেন তাহলে হয়তো ঠিক জবাবটা দিতে পারব,' বিনীতভাবে বললো কাকু।

'মহানুভব! আচ্ছা! আমি মেম্ফিসের প্রশাসক মাত্র। কোন কর্তৃত্ববলে আমাকে মহানুভব বলছ আমি জানতে চাই। গণা-পড়া করে

কিছু পেয়েছ? নক্ষত্রদের কাছ থেকে ভবিষ্যৎ জানার জন্য যে আদেশ দিয়েছিলাম তা পালন করেছ?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আপনার আদেশ অমান্য করার সাহস আমার আছে? কাল সারারাত ওদের পর্যবেক্ষণ করেছি, তারপর থেকে এই এখন পর্যন্ত ফলাফল বিশ্লেষণে ব্যস্ত ছিলাম। প্রশ্ন করুন, মহানুভব, জবাব দিচ্ছি।'

'জবাব তো দেবে অবশ্যই, কিন্তু কী জবাব? তুমি যেমন কাপুরুষ, নিশ্চয়ই সত্য বলবে না। তবু কেউ যদি সত্য জানতে পারে, সে তুমি। কিন্তু–' হিংস্র হয়ে উঠলো আবির কণ্ঠস্বর, 'মিথ্যে যদি বলো তো মুণ্ডটা তোমার কেটে নিয়ে গিয়ে ফারাওকে উপহার দিয়ে বলবো বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলে। আর ধড়টা পাঠিয়ে দেব, কোন সমাধি-মন্দিরে নয়, কুমীরের পেটে, যেখান থেকে পুনরুজ্জীবন আর সম্ভব নয়। ...কাজের কথায় আসা যাক। ঐ দেখ, রাজাদের সমাধি-মন্দিরের পেছনে সূর্য ডুবছে। এটা আমার জন্য অশুভসঙ্কেত। আমি এ-শহরে আসতে চেয়েছিলাম সকালে, যখন সূর্যদেব রা থাকেন পুব আকাশে জীবনের ঘরে। কিন্তু টাইফোনের লেলিয়ে দেয়া অভিশপ্ত বাতাসের কারণে যখন পৌঁছুলাম তখন সূর্যদেব মৃত্যুর ঘরে। তবু বলো, শেষ পর্যন্ত কী আছে আমার ভাগ্যে? বলো, হে গগন-সন্ধানী, ঐ সমাধি-উপত্যকায় আমি শেষ ঘুম ঘুমাতে পারব?'

'মনে হয় পারবেন, কুমার; অন্তত আপনার গ্রহ তা-ই বলছে। দেখুন ঐ দিকে, আপনার ওপরে জীবনের ঝর্নাধারা।' অস্তায়মান লাল সূর্যের একেবারে ওপরের অংশ থেকে বিচ্ছুরিত এক আলোকপ্রভার দিকে ইশারা করলো কাকু।

'কিছু একটা তুমি গোপন করছ আমার কাছে!' হিংস্র চোখে কাকুর মুখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করছে আবি। 'সোজাসুজি বলো, রাজাদের উপত্যকায় আমি নিজের জন্য যে অনন্তগৃহ তৈরি করাবো, সেখানে আমার স্থান হবে কি না?'

'হে রা-য়ের পুত্র, তা আমি বলতে পারব না,' জবাব দিল জ্যোতিষী। 'আপনার আদেশ মত আমি খোলাখুলি কথা বলব আপনার সাথে। আপনি ক্রুদ্ধ হতে পারেন জেনেও সত্য বলব। আপনার জীবনের ঘরে এক অশুভ প্রভাব দেখতে পাচ্ছি। একটা নক্ষত্র আপনার ভাগ্য-পথের ওপর দিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসছে। অনেকদিন এড়িয়ে চলতে পারলেও শেষ পর্যন্ত তা আপনাকে গ্রাস করবে।'

'কোন নক্ষত্র? ফারাওয়ের?'

'না, কুমার, আমেন-এর নক্ষত্র।'

'আমেন! কোন আমেন?'

'দেবতা আমেন; কুমার, দেবতাদের পিতা আমেন।'

'দেবতা আমেন!' ধীরকণ্ঠে উচ্চারণ করলো আবি। 'কেমন করে মানুষের পক্ষে লড়া সম্ভব দেবতার সঙ্গে?'

'দুই দেবতার সঙ্গে লড়তে হবে আপনাকে, কুমার। আমেন-এর নক্ষত্রের সঙ্গে থাকবে প্রেমের দেবী হাথোরের নক্ষত্রও। গত কয়েক হাজার বছরের মধ্যে এরা কছাকাছি হয়নি। কিন্তু এখন হচ্ছে, এবং আপনার জীবনকাল পর্যন্ত তা-ই থাকবে। দেখুন!' পুব দিকচক্রবালের দিকে ইশারা করলো কাকু।

পশ্চিম আকাশ থেকে প্রতিফলিত আবছা একটু গোলাপি আভা তখনও রয়েছে সেখানে। আবি তাকিয়ে থাকতে থাকতেই আভাটুকু মিলিয়ে গেল, আর সেখানে ফুটে উঠলো উজ্জ্বল সুন্দর এক তারা। তার কাছেই আরও একটি তারা। কয়েক মুহূর্ত পরেই তারা-যুগল হারিয়ে গেল দিগন্তের নিচে।

'আমেন-এর ভোরের তারা, সঙ্গে হাথোরের তারা,' জ্যোতিষী বললো।

'গর্দভ, তাতে কী?' খেঁকিয়ে উঠলো আবি। 'আমার নক্ষত্র থেকে ওগুলো অনেক দূরে। তাছাড়া ওগুলো তো ডুবে গেল, আর আমি ওপরে উঠছি তর তর করে।'

'কিন্তু, কুমার, আর এক বছরের মধ্যেই ওরা আপনার নক্ষত্রকে গ্রাস করতে শুরু করবে। আমেন আর হাথোর আপনার বিরুদ্ধে, কুমার। আলখাল্লার ভেতর থেকে একখানা পাকানো প্যাপিরাস বের করলো কাকু, 'দেখুন, এই প্যাপিরাসে আমি এঁকে দেখিয়েছি ওরা কখন কোন পথে এসে ঐ যে ওখানে–ঐ মৃত রাজাদের উপত্যকায় আপনার নক্ষত্রকে গ্রাস করবে। তার আগের কুড়িটা বছর অবশ্য আপনার অগ্রযাত্রা হবে অপ্রতিহত।'

পাকানো প্যাপিরাসটা ছিনিয়ে নিয়ে জ্যোতিষীর মুখের ওপর ছুঁড়ে মারলো আবি। 'ভণ্ড, প্রতারক! নক্ষত্র নিয়ে এইসব আবোল তাবোল বলে আমাকে ভয় পাইয়ে দেবে ভেবেছ?' কোমর থেকে খাটো একটা তরবারি বের করে কাকুর মাথার ওপর নাচাতে নাচাতে আবি বললো, 'এই ধারালো ব্রোঞ্জই আমার একমাত্র নক্ষত্র। ব্যাটা মিথ্যার রাজা, আবার যদি আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করো তাহলে আমার এই নক্ষত্রই তোমাকে গ্রাস করবে!'

'আমি গুণে-পড়ে যে সত্য জেনেছি তা-ই বললাম,' অবিচল আত্মমর্যাদার সঙ্গে বললো কাকু। 'কুমার, আপনি যদি চান এখন থেকে যা শুনলে আপনার ভাল লাগবে শুধু তা-ই বলব। তাতে আমার কষ্টও কম হবে–রাত জেগে গণাপড়া করতে হবে না। তবে আপনার এই রাশিচক্রে তেমন খারাপ কিছু তো আমি দেখছি না। দীর্ঘ বিশ বছর আপনার অব্যাহত সুদিন যাবে। আপনার যা বয়েস, এ-বয়েসে ক'জনের এমন সৌভাগ্য হয়? তার পরে যদি দুর্ভাগ্য আসেই তো আসুক না!'

'তা ঠিক, তা ঠিক,' ধীরে ধীরে বললো আবি। 'আমার মেজাজটা আজ বড্ড খারাপ হয়ে আছে। সব উল্টো-পাল্টা ঘটছে। আমার সোনার পানপাত্র দিয়ে তোমার এই গণনার দাম শোধ করব। আমাকে অভিশাপ দিও না, জ্যোতিষী। আর হ্যাঁ, মিথ্যা বলে কখনও আমার মন যোগানোর চেষ্টা করবে না। নক্ষত্রদের কাছ থেকে যে বার্তা তুমি পাবে শুধু তা-ই বলবে। সত্য, তা যত কঠিনই হোক, শুধু তা-ই আমি শুনতে চাই।'

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা যেভাবে মিটলো তাতে খুশি হয়ে উঠলো কাকু। বিশেষ করে আবির ঐ সোনার পানপাত্রটার ওপর অনেকদিন ধরেই নজর ছিল তার। আবিকে কুর্ণিশ করলো সে। ঝুঁকে দুমড়ানো মোচড়ানো প্যাপিরাসটা তুলে নিয়ে সিঁড়ির দিকে রওনা হতে যাবে কাকু, চোখ গেল নীলনদের পাড়ের দিকে। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয় দেখলো, গাধার পিঠে চেপে কয়েকজন লোক আসছে জাহাজটা যেখানে নোঙ্গর করে আছে সেই দিকে। একটু পরপরই তারার আলো ঝিক করে উঠছে তাদের ব্রোঞ্জের শিরোস্ত্রাণের ওপর।

'আমার রক্ষীদলের প্রধান ফারাওয়ের জবাব নিয়ে ফিরছে,' আবি বললো। 'না, কাকু, যেও না, শোনো ফারাও কী বলেছে। তারপর কিছু পরামর্শ থাকলে দেবে–সৎপরামর্শ।'

অতএব অপেক্ষা করতে লাগলো জ্যোতিষী। একটু পরেই রক্ষী-প্রধান এসে কুর্ণিশ করে দাঁড়ালো।

'কী বললো আমার ভাই ফারাও?' জিজ্ঞেস করলো আবি।

'বললেন, যদিও তিনি না ডাকা সত্ত্বেও আপনি এসেছেন তবু তিনি আপনাকে স্বাগত জানাবেন। তিনি মনে করেন তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে আপনি আসেননি। আপনি যে মরু-বর্বরদের যুদ্ধে হারিয়েছেন সে-খবর তিনি আগেই জেনেছেন। আর তাদের সেনাপতিদের যে কাটা মাথা আপনি নিয়ে এসেছেন সেগুলো তিনি

দেখবেন না।'

'ভাল, মহান ফারাও দেখছি এ-ধরনের ব্যাপারে এখনও মেয়েমানুষই রয়ে গেছে,' ব্যঙ্গের সুরে বললো আবি। 'ভাগ্য ভাল ফারাওয়ের, যুদ্ধ জানা সেনাপতিরা আছে তার সাথে। তারা জানে রাজ্য রক্ষার জন্য কী করে শত্রুর মাথা কাটতে হয়। ঠিক আছে, কাল যাব ফারাওয়ের সাথে দেখা করতে।'

'প্রভু,' রক্ষী-প্রধান বললো, 'আরও বার্তা আছে। ফারাও বললেন, তার কাছে খবর গেছে আপনার সাথে তিনশো সৈন্য আছে। তাদেরকে তিনি নগর-ফটকের ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেননি। তিনি বলে দিয়েছেন, শুধু পাঁচজন দেহরক্ষী নিয়ে আপনি তাঁর সামনে যাবেন।'

'আচ্ছা!' ঘৃণার হাসি হাসলো আবি। 'ফারাও তাহলে ভয় পায় আমাকে! ভেবেছে তিনশো সৈন্য নিয়ে আমি এত বড় নগর দখল করে তাকে বন্দী করবো?'

'না, কুমার,' রক্ষী-প্রধান বললো, 'আমার মনে হলো উনি ভয় পাচ্ছেন আপনি তাকে হত্যা করে রক্তের সম্পর্কে প্রথম উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজেকে ফারাও ঘোষণা করে বসবেন।'

'রক্তের সম্পর্কে প্রথম উত্তরাধিকারী! তার মানে রাজার ঘরে কোন শিশু এখনও আসেনি?'

'না, কুমার। রাজকীয় স্ত্রী পরমাসুন্দরী আহুরাকে আমি দেখেছি, ফারাওয়ের অন্যান্য স্ত্রী এবং একান্ত দাসীদেরও দেখেছি। কারো কোলে বা পায়ের কাছে বাচ্চা দেখিনি। ফারাও এখনও নিঃসন্তান।'

'আ!' বললো আবি। আস্তে আস্তে তাঁবুর নিচ থেকে বেরিয়ে সামনে জাহাজের গলুইয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

এর মধ্যে রাত নেমেছে। বিশাল চাঁদ উঠে আসছে আকাশে। স্নিগ্ধ রুপালি আলো ঢেলে দিচ্ছে মরুভূমি, পাহাড়শ্রেণী, বিশাল থিবি নগরী আর নীলনদের প্রশস্ত বুকে। নগরীর সোনা ও তামায় তৈরি স্তম্ভ ও মিনারশ্রেণী সে আলোয় ঝকমক করছে। রাজপ্রাসাদ ও হাজার হাজার বাড়ির জানালাপথে বেরিয়ে আসা আলো অগুনতি তারার মত জ্বলছে। বাগান, সড়ক আর মন্দিরের চত্বর থেকে ভেসে আসছে সঙ্গীতের অস্পষ্ট ধ্বনি। একটু পরপরই নগর প্রাচীরের ওপর থেকে শোনা যাচ্ছে টহল প্রহরীদের প্রহর ঘোষণার আওয়াজ।

অসাধারণ এই দৃশ্য হৃদয় নাচিয়ে দিলো আবির। কী অপরিসীম সম্পদ আর ক্ষমতা ওখানে রয়েছে! তার ভাই ফারাও, দেবতা না হয়েও মানুষ রূপে দেবতা, তার গরিমাময় প্রাসাদ ঐ যে। ঐ প্রাসাদ

এখনও সন্তানহীন। ফারাও যখন ওসিরিসের সিংহাসনে আরোহণ করবেন (অর্থাৎ মারা যাবেন), তাঁর যে স্বাস্থ্য তাতে বেশি দেরিও নেই তার, তখন তাঁর কোন সন্তান তাঁর রেখে যাওয়া সিংহাসনে বসবে না। সেক্ষেত্রে আবির সুযোগ...

হ্যাঁ, কিন্তু তার আগেই অলৌকিক কিছু ঘটে যেতে পারে। যেন তেন ভাবে ফারাওয়ের উত্তরসূরী একজন খুঁজে বের করে তাকে স্বীকৃতি দেয়া হতে পারে। আমেন-এর পুরোহিতরা, রাজপরিষদ এবং জনগণ ফারাওকে পছন্দ করে, কিন্তু আবিকে সবাই ভয় পায়, অপছন্দ করে তার নিষ্ঠুরতা আর তার দেহের হিকসোস রক্তের কারণে। ওহ, পৃথিবীতে এত সুন্দরী মেয়ে থাকতে কী জন্যে যে তার বাবা তার মা হিসেবে এক হিকসোস রাজকন্যাকে বেছে নিয়েছিল। হিকসোস রক্তের কারণেই আজ সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সিংহাসন থেকে বঞ্চিত হতে চলেছে। অবশ্য এটাও ঠিক, আজ তার যে শৌর্য-বীর্য এ-ও ঐ হিকসোস রক্তের কারণে।

কেন দেরি করবে আবি? কেন সে ভাগ্য-পরীক্ষা করবে না? সঙ্গে রয়েছে তিনশো বাছাই করা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, তার প্রতি যাদের আনুগত্য প্রশ্নাতীত। এখন উৎসবের সময়। নগরের ফটকগুলোতে পাহারা তেমন জোরালো নয়। রাতের অন্ধকারে এগিয়ে গিয়ে রক্ষীদের পরাস্ত করে প্রাসাদ দখল করে নিলে কী হয়? তারপর ফারাওকে তার পূর্বপুরুষের সমাধিস্থলে পাঠিয়ে দিয়ে রাত ভোর হবার আগেই সিংহাসনে বসে পড়লে কে ঠেকাবে তাকে? বুকের ভেতর হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠলো আবির। মিশরের জোড়-মুকুটের ওজন অনুভব করতে লাগলো মাথায়। ধীর পায়ে ফিরে এলো সে তাঁবুর নিচে।

'আমি ভাবছি এখন–এই রাতেই আঘাত হানলে কেমন হয়?' বললো আবি। 'বলো, আমার রক্ষী-প্রধান, তুমি এবং তোমার সৈন্যরা যাবে আমার সাথে ঐ নগরীতে? পরিণামে মিলবে সিংহাসন অথবা কবর। যদি প্রথমটা ভাগ্যে থাকে তাহলে তুমি হবে আমার পুরো বাহিনীর সেনাপতি। আর তুমি, জ্যোতিষী, তুমি হবে আমার প্রধানমন্ত্রী। হ্যাঁ, ফারাওয়ের পরে তোমরা দুজনই হবে রাজ্যের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মানুষ।'

রক্ষী-প্রধান আর জ্যোতিষী ঢোক গিললো আবির দিকে তাকিয়ে।

'খুবই দুঃসাহসের কাজ, কুমার,' অবশেষে বললো রক্ষী-প্রধান। 'তবু যে পুরস্কারের কথা বললেন তাতে আমি এই ঝুঁকি নিতে রাজি। কিন্তু সাধারণ সৈন্যদের কথা বলতে পারি না। এই পরিকল্পনার কথা

আগে ওদের বলতে হবে। শুনে ওদের মধ্যে কে কী করবে বা ভাববে তা জানার কোন উপায় নেই। একজনও যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে কাল শেয়ালের দল অথবা মমির কারিগররা আমাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।'

জ্যোতিষীর দিকে তাকালো আবি।

'এই ভয়ানক চিন্তা মাথা থেকে তাড়িয়ে দিন, কুমার,' বললো কাকু। 'মনের গভীরে কবর দিয়ে ফেলুন এখনই। নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের সময় এরকম একটা কিছুরই আভাস আমি পাচ্ছিলাম, কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না ব্যাপারটা কী। এখন পারছি। আপনি আমাদের পায়ের নিচে নরকের কালো গর্ত খুঁড়তে চাইছেন। দেবতাতুল্য ফারাওয়ের বিরুদ্ধে আঙুলটা নাড়লেও নরকবাস হবে অবধারিত। দেবতারা সরাসরি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবেন। যেমন আছে সব তেমন থাকতে দিন। আপনি অনেক বছর রাজত্ব করার সময় পাবেন। আর এখন আঘাত করলে আপনার মাথায় উঠবে লজ্জার মুকুট, মৃত্যুর পরে হবে নামহীন কবর; অনন্তকাল ভোগ করবেন নরকযন্ত্রণা।'

এক দৃষ্টিতে কাকুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল আবি। বুঝতে অসুবিধা হলো না জ্যোতিষী কথা বলছে অন্তর থেকে, তার মন রাখবার জন্য নয়।

'ঠিক আছে,' বললো আবি, 'মেনে নিচ্ছি তোমার পরামর্শ। অপেক্ষা করবো আমি। ঠিকই বলেছ তোমরা, এতে ঝুঁকি বড় বেশি। আর এটাও ঠিক দেবতাদের দিকে তীর ছুঁড়ে কেউ রেহাই পায় না, বিশেষ করে যদি তার হাতে যথেষ্ট তীর না থাকে। আরও কিছুদিন বেঁচে থাকুক ফারাও, এর মধ্যে আমি তৈরি হয়ে নেই। কালই ফারাওকে বলবো যেন আমাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো জ্যোতিষী। রক্ষী-প্রধানকেও অসন্তুষ্ট মনে হলো না। 'ঘাড়ের ওপর মাথাটাকে এখন অনেক বেশি শক্ত মনে হচ্ছে,' বললো সে। 'সন্দেহ নেই কোন কোন সময় বুদ্ধির জোর বাহুর জোরের চাইতে বেশি কাজ দেয়। নিশ্চিন্ত মনে ঘুমান, কুমার, কাল সূর্যোদয়ের দু-ঘণ্টা পরে ফারাও আপনাকে সাক্ষাৎ দেবেন। এখন কি আমরা বিদায় নেব?'

'আমি বুদ্ধিমান হলে তোমাদের দুজনের জন্যেই চিরবিদায়ের ব্যবস্থা করতাম,' তরবারির বাঁটে হাত রেখে বললো আবি। 'তোমরা আমার হৃদয়ের সব গোপন কথা জেনে গেছ। তোমরা একটু মুখ

খুললে আমার সর্বনাশ অনিবার্য।'

সন্ত্রস্ত চোখে একে অপরের দিকে তাকালো দুজন। প্রভুর মত তলোয়ারের বাঁটে খেলা করছে রক্ষী-প্রধানের হাতও। 'জীবন সবার কাছেই প্রিয়, কুমার,' ইঙ্গিতপূর্ণ কণ্ঠে সে বললো। 'আপনার মনে সন্দেহ জাগানোর মত কোন কাজ তো আমরা কখনও করিনি।'

'তা ঠিক। তেমন কিছু হলে আগে আঘাত করতাম, কথা বলতাম পরে। তবু তোমাদের শপথ করতে হবে, জীবনে বা মরণে আজকের আলাপের কিছু তোমরা প্রকাশ করবে না।'

মৃত্যু ও শেষ বিচারের দেবতা ওসিরিসের পবিত্র নামে দুজন শপথ করলো।

'রক্ষী-প্রধান,' আবি বললো, 'তোমার কাজে আমি সন্তুষ্ট। তোমার বেতন এখন থেকে দ্বিগুণ হয়ে গেল। আর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি কখনও ফারাও হলে তুমি হবে আমার প্রধান সেনাপতি।'

রক্ষী-প্রধান মাথা নুইয়ে ধন্যবাদ জানালো। কাকুর দিকে ফিরলো আবি। 'নক্ষত্ররাজির মালিক, আমার সোনার পানপাত্র এখন থেকে তোমার। আর কোন বাসনা আছে?'

'ঐ দাসীটা,' বললো জ্যোতিষী, 'মেরিত্রা, যাকে একটু আগে আপনি চড় মেরেছেন...'

'আমি চড় মেরেছি তুমি কী করে জানলে?' ঝট করে জিজ্ঞেস করলো আবি। 'আকাশের তারারা এসব খবরও দেয় নাকি তোমাকে? ঠিক আছে ধূর্ত বেয়াদবটাকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি। নিয়ে নাও ওকে। আমার মনে হয় শিগগিরই ও চড়িয়ে তোমার গাল ফাটাবে।'

কিন্তু এই খুশির খবর জানানোর জন্য যখন ছুটে গেল কাকু পেলো না মেরিত্রাকে। সারা জাহাজ খুঁজেও পেলো না।

উধাও হয়েছে মেরিত্রা।

২
দেবতার প্রতিশ্রুতি

ভোর হয়েছে থিবিতে। নতুন সূর্যের উজ্জ্বল কিরণে বিশাল নগরটা জ্বল জ্বল করছে। রাজকীয় বজরায় বসে আছে আবি। দারুণ জমকালো এক পোশাক তার পরনে। জ্যোতিষী কাকু, রক্ষী-প্রধান ও তিন রক্ষী রয়েছে আবির সাথে। পেছনে অন্য একটি বজরায় দাস-দাসীরা। আরও

রয়েছে যুদ্ধে আটক দুই গোত্রপতি আর কয়েকজন শ্বেতাঙ্গিনী নারী, আর নুন মাখানো কাটা মুণ্ড। ফারাওয়ের জন্য উপঢৌকন হিসেবে এনেছে এগুলো আবি।

শাদা পোশাক পরা দাঁড়িরা ঝুঁকে পড়ে দাঁড় টেনে চলেছে। নদীর মাঝখান দিয়ে তরতরিয়ে এগোচ্ছে বজরা দুটি। নদীর দু-তীরে সারি সারি যুদ্ধজাহাজ। সেগুলোর ওপর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে সৈনিকরা। দেখতে দেখতে আবি ভাবলো, সৎপরামর্শই দিয়েছিল কাকু। নিঃসন্দেহে তার আগমন উপলক্ষেই নৌবাহিনীর এই প্রদর্শনীর আয়োজন। নদীর পাথর বাঁধানো দু-তীরেও পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈনিকরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকে সশস্ত্র। মাত্র তিনশো সৈন্য নিয়ে নগর দখলের চেষ্টার পরিণতি কী হতো ভেবে শিউরে উঠলো আবি।

রাজকীয় ঘাটে পৌঁছুলো বজরা। বর্মাবৃত সেনাধ্যক্ষরা এবং আনুষ্ঠানিক পোশাক পরা পুরোহিতগণ এগিয়ে এসে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালো আবিকে। রাজকীয় প্রহরায় সে এগিয়ে চললো নগর-তোরণ পেরিয়ে ফারাওয়ের প্রাসাদের দিকে। আমেন-এর মন্দির দেখতে পেলো আবি। মন্দিরের সুউচ্চ মিনারের উপর সূঁচালো দণ্ডে বাঁধা উজ্জ্বল রঙের পতাকা উড়ছে। সড়কের দুপাশে সারি সারি উঁচু বাড়ি। প্রতিটা বাড়ির চারপাশে চমৎকার বাগান। দেখতে দেখতে চলেছে আবি। অবশেষে পৌঁছুলো প্রাসাদ তোরণের কাছে। সেখানেও সুসজ্জিত সৈনিকের সারি। মুহূর্তের উত্তেজনায় এই ব্যূহ ভেদ করার স্বপ্ন দেখেছিল, ভাবতেই আরেকবার শিউরে উঠলো সে। সারি সারি গাছের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া পথ ধরে আবিকে নিয়ে যাওয়া হলো ফারাওয়ের দরবারকক্ষে।

দুপাশে দুই সারি থাম ধরে রেখেছে দরবারকক্ষের ছাদ। বাইরের উজ্জ্বলতার পর বিশাল কামরাটাকে একটু যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হলো। কেবল উপরের একটি খোলা জানালা দিয়ে আলো এসে পড়েছে কামরার শেষ প্রান্তে একটা জায়গায়, যেখানে হাতির দাঁত আর সোনায় তৈরি সিংহাসনে জোড়-মুকুট মাথায় বসে আছেন ফারাও। পাশে তাঁর রানী। তাঁদেরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন মন্ত্রিবর্গ, পারিষদ, সেনাধ্যক্ষ আর নকলনবিশরা। তাঁদের ওপাশে পিঠ বাঁকানো আসনে বসে আছেন ফারাওয়ের আর সব রানী। তাঁদের পেছনে দাঁড়ানো তাঁদের সুন্দরী পরিচারিকারা। তাদের পরনেও মূল্যবান পোশাক। সিংহাসনের পেছনে আর থামগুলোর মাঝে সতর্ক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে দুশো বিখ্যাত

ন্যুবিয়ান রক্ষী। ফারাওয়ের ব্যক্তিগত রক্ষী হবার জন্য দুটো মাত্র যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয়েছে তাদের–বিশ্বস্ততা আর সাহসিকতা।

এমন জাঁকজমকপূর্ণ আনুষ্ঠানিক পরিবেশের মধ্যমণি হয়ে বসে আছেন ফারাও। দরবারকক্ষের প্রতিটা চোখ সেঁটে আছে তাঁর ওপর। ছোটখাট শীর্ণ মানুষ। বয়স চল্লিশের ঘরে। দয়ালু মুখটায় আপাত প্রশান্তির আড়ালে একটু যেন উৎকণ্ঠার ছাপ। রাজকীয় সর্পখচিত জোড়-মুকুটের ভার যেন বইতে পারছে না তাঁর মাথা। স্বর্ণবর্ণ পরিচ্ছদের কারুকার্য নিয়ে অস্থিরভাবে খেলা করছে তাঁর হাত। ইনিই ফারাও–বিশ্বের সব চাইতে পরাক্রমশালী নৃপতি, লক্ষ লক্ষ মানুষের শাসক, যারা স্বচক্ষে দেখেনি তাঁকে, তবু পূজা করে দেবতার মত।

আবি, গাট্টা-গোট্টা কৃষ্ণবর্ণ আবি; ফারাওয়ের একই বাবার ঔরসে জন্ম নেয়া আবি সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছে ফারাওয়ের দিকে। শেষবার তাদের দেখা হওয়ার পর বহু বছর পেরিয়ে গেছে। ছেলেবেলায় যখন প্রাসাদে থাকতো তখনও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে দুজনের মধ্যে তৈরি করে দেয়া হয়েছিল ব্যবধান। পৌরুষের তেজ আর শক্তিমত্তা নিয়ে তাকিয়ে আছে আবি শীর্ণদেহ ফারাওয়ের দিকে, যাঁর বাবা-মা ছিলেন ভাই-বোন, দাদা-দাদীও ছিলেন ভাই-বোন। ফারাও-ও তাকিয়ে আছেন তাঁর সৎভাইয়ের দিকে। সেই দৃষ্টিতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এমন এক রাজকীয় সৌরভ, যার সামনে আবির সব রুক্ষতা মাথা নোয়ালো। ফারাওয়ের ঐ শীর্ণ দেহ যে শত সম্রাটের উত্তরাধিকার তার প্রকাশ ঘটেছে কেবল ঐ দুচোখের চাহনিতে।

সিংহাসন-বেদীর কাছে এগিয়ে গিয়ে নতজানু হলো আবি। এক মূহূর্ত অপেক্ষা করে তার দিকে রাজদণ্ড এগিয়ে দিলেন ফারাও। তাতে চুম্বন করলো আবি।

'স্বাগতম, কুমার, আমার ভাই,' ফারাও বললেন। 'ছেলেবেলায় অনেক কলহ করেছি তোমার সাথে। বহু বছর পেরিয়ে গেছে তার পর। কালস্রোতে একসময় সব ক্ষতই শুকিয়ে যায়। স্বাগতম, আমার পিতার পুত্র। ভাল আছ কিনা তা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হচ্ছে না,' সামনে হাঁটু গেড়ে থাকা মানুষটার পেটানো শরীরের দিকে ঈর্ষার দৃষ্টি ফেলে কথা শেষ করলেন ফারাও।

'মহানুভব দীর্ঘজীবী হোন,' ধীর উদাত্ত কণ্ঠে বললো আবি। 'আপনি ওসিরিসের বেত্রদণ্ডের বাহক, আমেনের সমর্থনধন্য, আপনার মাথায় রা-য়ের উষ্ণীষ; সুস্বাস্থ্য ও শক্তি আপনার চিরসাথী হোক।'

'ধন্যবাদ, কুমার,' মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলেন ফারাও। 'যে স্বাস্থ্য আর

শক্তির কথা বললে তা বোধহয় ওসিরিসের পদতলে ঠাঁই পেলেই ফিরে পাব। আমার বিষয় এখন থাক। কাজের কথায় আসি। কেন তুমি অনুমতি না নিয়ে মেম্ফিসের সরকারী দায়িত্ব ফেলে আমার সাথে দেখা করতে এসেছ?'

'আমার ওপর রাগ করবেন না, মহানুভব,' সবিনয়ে বললো আবি। 'কিছুদিন আগে মরু-বর্বররা যখন আপনার সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি হয়ে উঠেছিল আপনারই নির্দেশে আমি তাদের দমন করতে গিয়েছিলাম। যুদ্ধের দেবতা মেনথুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দিয়েছি হাজার হাজার বিদ্রোহীকে। তাদের দুই গোত্রপতিকে আমি বন্দী করেছি, বন্দী করেছি তাদের সব স্ত্রীকে। তাদের আমি সাথে নিয়ে এসেছি যাতে মহানুভব তাদের প্রাণদণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। এছাড়াও জয়ের প্রমাণস্বরূপ আমি সঙ্গে করে এনেছি তাদের একশো দলপতির কাটা মুণ্ড আর পাঁচশো সৈন্যের কাটা হাত। হুকুম দিন, মহানুভব, সেগুলো সাজিয়ে দেয়া হবে আপনার সামনে। আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি, মহানুভব, অন্তত এক পুরুষের মধ্যে আর বর্বররা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। আপনার সাম্রাজ্য উত্তরের এই উপদ্রব থেকে এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ। এবার অনুমতি দিন, মহানুভব, কাটা মুণ্ড আর হাতগুলো এনে আপনাকে গুণে দেখাক।'

'না, না,' বললেন ফারাও। 'আমার সেনাধ্যক্ষরাই পরে গুণে দেখবে। আমি মৃত্যুর বিভৎস দৃশ্য দেখতে পছন্দ করি না। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করছি। এখন বলো, আমার এবং মিশরের এই যে উপকার তুমি করেছ এর জন্যে কী পুরস্কার তুমি চাও?'

রাজার পাশে বসা রানী আহুরা এবং রাজার অন্যান্য স্ত্রীর দিকে একবার তাকিয়ে আবি বললো, 'মহানুভব, এখানে আপনার স্ত্রীদের দেখছি, কিন্তু আপনার কোন ছেলে-মেয়েকে দেখছি না। নিশ্চয়ই অন্দর মহলে রয়েছে। অনুগ্রহ করে তাদের আনাবেন এখানে? আমি তাদের ফুটফুটে মুখগুলো দেখে নয়ন সার্থক করতাম, আর মেম্ফিসে ফিরে গিয়ে ওদের চাচাতো ভাই-বোনদের বলতে পারতাম ওদের কে কেমন দেখতে।'

লজ্জা আর অপমানের ছায়া পড়লো রানী আহুরার সুন্দর মুখটায়। ফারাওয়ের অন্য স্ত্রীরাও মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস শুরু করেছেন। রাগের ছাপ সবার মুখে। কেবল ফারাও আগের মতই অবিচল। 'কুমার আবি,' বললেন তিনি, 'দেবতারা যে রমণীদের বঞ্চিত করেছেন তাদের এই অনাবশ্যক অপমান দেবতারা ক্ষমা করবেন না।

তুমি জান আমার কোন সন্তান নেই। তাহলে কেন তাদের দেখতে চাইছ?'

'মহানুভব, লোকমুখে একটা কথা শুনেছিলাম, বিশ্বাস করতে পারিনি। তাছাড়া এত স্ত্রীর মধ্যে কোন একজনের এর মধ্যে মা হওয়াটা অসম্ভব নয়। তাই নিশ্চিত হয়ে নিলাম, কারণ আমার একটা আর্জি আছে। শুধু আমার নয়, মিশরের এবং আপনার স্বার্থও এর সাথে জড়িত। মহানুভব, সবার সামনে কথাটা বলার অনুমতি পাব?'

'বল! মিশরের স্বার্থে যে কথা মিশর তা শুনুক!'

'মহানুভব বলেছেন, দেবতাদের অনুগ্রহ না পাওয়ায় আপনি সন্তান বঞ্চিত। ওসিরিসের কাছে মহাপ্রস্থানের পর রেখে যাওয়া সিংহাসনে বসার জন্য দেবতারা এমনকি একটা কন্যা সন্তানও আপনাকে দেননি। ছেলে না হোক, একটা মেয়েও যদি আপনার থাকত, আমি কিছু বলতাম না। কবরের মত নিশ্চুপ থাকতাম। দেবতাদের উদ্দেশ্যে এত মন্দির নির্মাণ করিয়েছেন, তবু তাঁরা আপনার প্রার্থনা শোনেননি; আপনার এত সুন্দরী স্ত্রীর একজনেরও গর্ভে সন্তান দেননি। এমনকি আমেন, আপনার পিতা আমেন, যার নাম আপনি ধারণ করে আছেন, তিনিও অলৌকিক কিছু ঘটাননি। এ নিশ্চয়ই আমেনেরই ইচ্ছা, মহান ফারাও, আপনি একাই রাতের আকাশে পূর্ণ চাঁদের মত জ্বলবেন, আপনার গৌরবের অংশীদার হওয়ার জন্য সেখানে একটা তারাও থাকবে না।'

চুপ করে আবির কথা শুনছিলেন রানী। এবার তিনি কথা বলে উঠলেন তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে। 'কী করে জান তুমি, মেম্ফিসের কুমার? কখনও কখনও দেবতারা সদয় হন, এবং যা থেকে অনেকদিন বঞ্চিত রেখেছেন তা-ই দেন। আমার প্রভু বেঁচে আছেন, আমি বেঁচে আছি, মিশরের সিংহাসন পূর্ণ করার জন্য আমাদের কোলে সন্তান আসবে না কে বলতে পারে?'

'তা-ই হোক, মহারানী,' মাথা নুইয়ে আবি বললো। 'আমি সে-প্রার্থনাই করি। স্বর্গলোকের রাজাদের অভিপ্রায় বুঝবো সে-সাধ্য তো আমার নেই। একটি মেয়েও যদি হয় আপনাদের, আমি আমার কথা ফিরিয়ে নেব, আর সিংহাসনে এবং আপনার উদ্দেশ্যে গড়া সব সৌধে আপনাকে রাজমাতা বলে যে মিথ্যা উপাধি উৎকীর্ণ হয়েছে আমি নিজে সেই উপাধিতে আপনাকে ভূষিত করবো।'

আবির এই বিদ্রূপের জবাব দিতে যাচ্ছিলেন রানী। তাঁর হাঁটুতে হাত রেখে বাধা দিলেন ফারাও। 'বলে যাও, কুমার, আমার ভাই,'

বললেন তিনি। 'এতক্ষণ তোমার কাছে যা শুনলাম সবই আমাদের জানা–আমি নিঃসন্তান। যা আমরা জানি না, তোমার এত সব কথার নিচে লুকিয়ে আছে তোমার যে হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, সেই কথা বলো।'

'মহানুভব, আমার কথা হলো, আমি আপনারই পবিত্র রক্তের দ্বারা সম্পর্কিত, জন্ম একই পিতার ঔরসে–'

'কিন্তু এমন এক মায়ের গর্ভে যার রক্ত ঐশ্বরিক নয়,' বলে উঠলেন আহুরা। 'মেম্ফিসের কুমার, তোমার মা এমন এক গোত্রের মেয়ে যাদের ওপর রয়েছে খেম-এর অশেষ অভিশাপ। যেকোন আয়নাই তোমাকে তা দেখিয়ে দেবে।'

রানীর কথা শুনতেই পায়নি এমন ভঙ্গিতে বলে চললো আবি, 'মহান ফারাও, দিনে দিনে আপনি দুর্বল হয়ে পড়ছেন, স্বর্গ আপনাকে চাইছে। ওদিকে উত্তরে এবং দক্ষিণে অনেক বিপদ মিশরকে হুমকির মুখে ফেলছে। এমনি সময়ে, কোন উত্তরাধিকারী ছাড়াই আপনি যদি হঠাৎ মারা যান, মিশরের সিংহাসন দখলের জন্য বর্বররা সব দলে দলে ছুটে আসবে। মহানুভব, আমি যোদ্ধা, আমার শরীর দৃঢ়; আমার সন্তান-সন্ততি অনেক, সৈন্যদের আস্থা আছে আমার উপর, লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাকে ভালবাসে। তাই আমার নিবেদন, আমাকে আপনার শাসন কাজের সহায়ক করে নিন। আমাকে এবং আমার ছেলেদেরকে আপনার উত্তরাধিকারী হিশেবে ঘোষণা করুন, যাতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমাদের রাজবংশ টিকে থাকতে পারে; আপনিও শান্তিতে আপনার জীবনকাল শেষ করতে পারেন। এ-ই আমার নিবেদন।'

আবির এই দৃঢ় নিঃশঙ্ক অনুরোধে পুরো রাজপরিষদ জমে পাথর হয়ে গেল যেন। মুহূর্ত পরেই ফিস ফিস করে আলাপ শুরু করলেন তাঁরা। আর রানী আহুরার মুখ লাল হয়ে উঠলো রাগে। হাতের পদ্মফুলটি তিনি ছুঁড়ে ফেললেন মেঝেতে। কেবল ফারাও এখনও স্থির, নিশ্চুপ। মাথাটা তাঁর ঝুঁকে আছে, চোখ বন্ধ, যেন প্রার্থনায় আছেন। বেশ কিছুক্ষণ পর যখন মাথা তুললেন, মৃদু হাসি শীর্ণ মুখটায়।

'আবি, আমার ভাই,' ধীরকণ্ঠে বললেন তিনি। 'তোমার জিহ্বা লম্বা জানতাম, তবে এতটা যে লম্বা হয়েছে তা জানা ছিল না। আমার আগে যারা এই সিংহাসন অলঙ্কৃত করে গেছেন তাঁদের কেউ তোমার এই কথা শুনলে রাজদণ্ডের মুহূর্তের ইশারায় এতক্ষণে তোমার মৃতদেহ পড়ে থাকত ওখানে। তোমার পুরো পরিবারের নাম মুছে যেত পৃথিবী থেকে। তবু, আবি, তুমি যে সাহস আর দৃঢ়তা দেখিয়েছ, তুমি যে তোমার হৃদয়ের কথা খুলে বলেছ এজন্যে আমি তোমাকে ক্ষমা করছি।

কিন্তু, আবি, সব কথা তুমি বলোনি।' অখণ্ড নীরবতা দরবারকক্ষে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন ফারাও। তারপর আবার শুরু করলেন, 'কাল রাতে তুমি যে তোমার রক্ষীদলের সহায়তায় আমার প্রাসাদের দখল নিয়ে আমাকে হত্যা করে রক্তের অধিকারে নিজেকে ফারাও ঘোষণা করা সম্ভব কিনা সেই বিচার বিশ্লেষণ করছিলে একথা তুমি বলোনি। হ্যাঁ, ভাই আবি, আমার রক্ত নিয়ে রক্তের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার কথা ভেবেছিলে।'

ফারাওয়ের কথায় মহাশোরগোল উঠলো দরবারকক্ষে। মহিলারা সব দাঁড়িয়ে গেল। সেনা কর্মকর্তারা তলোয়ার বের করে এগিয়ে গেল আবির দিকে। ফারাও তাঁর রজদণ্ড নেড়ে ইশারা করতে সবাই শান্ত হল। কেবল আবি চেঁচিয়ে উঠলো ক্রুদ্ধস্বরে।

'কে এমন জঘন্য মিথ্যা কথা লাগিয়েছে?' আগুনঝরা চোখে সে প্রথমে কাকুর দিকে তারপর তার রক্ষী-প্রধানের দিকে তাকালো।

'তোমার কর্মকর্তাদের সন্দেহ কোরো না, কুমার,' আগের মতই শান্ত অচঞ্চল ফারাওয়ের কণ্ঠস্বর। 'ওরা নির্দোষ। ভাই, আবি, রাজহত্যার ষড়যন্ত্রের জন্য জাহাজের পাটাতনের ওপর তাঁবু খুব ভাল জায়গা নয়। ফারাওয়ের চর আছে সব জায়গায়। তাছাড়া কখনও কখনও দেবতারাও ঘুমের ভেতর তার কানে কানে অনেক কথা বলে যান। তোমার জ্যোতিষীর কাছে আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ। ঐ পাগলামি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা করলে, রক্তপাত যত অপছন্দই করি না কেন, তোমাকে হত্যা করা ছাড়া আমার কোন উপায় থাকতো না। জ্যোতিষী, তুমি জ্ঞানী, তোমাকে আমি পুরস্কৃত করবো। যা তুমি হারিয়েছ, হয়তো তা-ই ফিরে পাবে। কাল রাতে তোমার মালিক তার এক দাসীকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছিল না?'

কাকু মাটিতে সটান শুয়ে পড়ে ফারাওকে সম্মান জানালো। বুঝতে তার বাকি নেই হারিয়ে যাওয়া মেয়ে মেরিত্রাই আড়াল থেকে শুনে আবির ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়েছে ফারাওকে। কাকুর দিকে আর মনোযোগ না দিয়ে ফারাও বলে চললেন, 'আবি, রাজকুমার, ভাই আমার, আমি তোমাকে ক্ষমা করছি। দেবতারা এবং পূর্বপুরুষদের আত্মারাও যেন তোমাকে ক্ষমা করেন। তুমি যে দাবি জানিয়েছ সে-প্রসঙ্গে আসি। তুমি আমার একমাত্র জীবিত ভাই, সুতরাং আমি তোমার দাবি বিবেচনা করব, যদিও তোমার জন্ম সম্পূর্ণত রাজকীয় নয়। তোমার দেহে বইছে এমন এক জাতির রক্ত যাদেরকে ঘৃণা করে মিশর। তুমি তোমার প্রভু ফারাওকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলে, কিন্তু

তুমি সাহসী এবং অন্তত এক দিক থেকে তোমার দেহে রাজরক্ত বইছে। তাই শেষ পর্যন্ত আমি যদি কোন সন্তান না রেখেই মারা যাই তুমি আমার শূন্যস্থান পূর্ণ করলে খারাপ হবে না। কিন্তু আমি এখনও মারা যাইনি, তাছাড়া আমার সন্তান লাভের সম্ভাবনাও শেষ হয়ে যায়নি। এখন বলো, আবি, ওসিরিস যতদিন না আমাকে ডাক দেন ততদিন তুমি বন্দী থাকবে নাকি অঙ্গীকার করবে?'

'অঙ্গীকার,' ঢোক গিলে বললো আবি।

'তাহলে হাঁটু গেড়ে বসো এখানে। ওসিরিসের নামে শপথ করে বল, তুমি আমার বিরুদ্ধে হাত তুলবে না বা ষড়যন্ত্র করবে না। শপথ করে বলো, আমার ঘরে যদি কোন সন্তান আসে, তা ছেলে হোক বা মেয়ে, তুমি আইনসিদ্ধ ফারাও এবং প্রভু হিসেবে মেনে তার প্রকৃত সেবা করবে। এই রাজপরিষদের উপস্থিতিতে শপথ করো, কাজের দ্বারা বা আচরণের দ্বারাও যদি এই অঙ্গীকার ভঙ্গ হয় তাহলে জীবিত অবস্থায় মিশরের সকল দেবতার অভিশাপ পড়বে তোমার ওপর আর মৃত্যুর পর ভোগ করবে অনন্ত নরকযন্ত্রণা।'

উপায়ান্তরহীন আবি এই অঙ্গীকার করে শপথের প্রতীক হিসেবে রাজদণ্ডে চুম্বন করলো।

রাত হয়েছে। নগরীর উত্তরাংশ, যার নাম কার্নাক, সেখানে আমেন-এর বিশাল মন্দিরের একেবারে ভেতরের অংশে সুদৃশ বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে আছে পবিত্রদের মধ্যে পবিত্র, দেবতাদের পিতা আমেন-রা-এর মূর্তি। মাথায় পালকের উষ্ণীষ। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত আর মিশরের রাজরক্তধারী ছাড়া আর কারো এই নিভৃত-কক্ষে প্রবেশাধিকার নেই। ফারাও ও তাঁর স্ত্রী আহুরা সাধারণ মানুষের মত বাদামী আলখাল্লা পরে দেবতার পায়ে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছেন। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে তাঁরা প্রার্থনা করছেন একটি সন্তানের জন্য।

একটি মাত্র আলোয় আবছা আলোকিত কামরাটা। ফারাও ও তাঁর স্ত্রী তাঁদের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করছেন দেবতার কাছে। তাঁদের সন্তানহীনতা নিয়ে আবির ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কথা বললেন তাঁরা। বললেন, তাঁদের কোলে সন্তান–একটিমাত্র সন্তান না এলে তাঁদের প্রাচীন বংশের সমাপ্তি ঘটবে, এই মন্দিরে এসে প্রার্থনা করার জন্য তাঁদের বংশে আর কেউ থাকবে না। তাঁরা দেবতার উদ্দেশ্যে মানত করলেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন প্রশস্ত ভূমিতে নতুন মন্দির গড়িয়ে দেয়ার।

'মানুষের সামনে আমাকে আর হাসির পাত্র কোরো না,' কান্নাভেজা

স্বরে দেবতার পায়ের কাছে পাথরের বেদীতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বললেন রানী। 'একটি সন্তান দাও, যাতে আমি প্রভু ফারাওয়ের আসন পূর্ণ করতে পারি, বিনিময়ে ইচ্ছা হলে আমার জীবন তুমি নিয়ে নিও।'

দেবতা কোন উত্তর করলেন না। অনেকক্ষণ অমনি প্রার্থনা করে উঠে দাঁড়ালেন রাজা-রানী। মন্দিরের দরজার কাছে দেখা হলো লোলচর্মবৃদ্ধ প্রধান পুরোহিতের সাথে।

'দেবতা কোন ইশারা দেখালেন না,' ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন ফারাও।

'কোন দৈববাণী আমরা শুনতে পাইনি,' কান্নাভেজা স্বরে বললেন রানী।

রানীর অশ্রুভেজা মুখ দেখে করুণার এক আলো ফুটে উঠলো জ্ঞানী বৃদ্ধের চোখে। বললেন, 'আমি দেখতে পাইনি, কিন্তু মনে হলো, একটা কণ্ঠস্বর যেন আমাকে বলে গেল···। মহান ফারাও, রানী আহুরা, আপনারা প্রাসাদে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। পাশাপাশি শোবেন দুজন। আমেন দয়ালু, তাঁর যে সন্তানরা তাঁকে ভালবাসে তিনিও তাদের ভালবাসেন। আমার মনে হয় ঘুমের ভেতর কিছু একটা ইশারা তিনি আপনাদের দেখাবেন। সেই ইশারা মত কুমার আবির সঙ্গে কথা বলবেন। ভাল বা মন্দ যা-ই হোক তা ঘটবেই। সুতরাং নির্ভয়ে কোন রকম সন্দেহে না ভুগে কথা বলবেন।'

রাজদম্পতি হাতে হাত ধরে দুটো ছায়ার মত এগিয়ে গেলেন সারি সারি স্তম্ভের মাঝ দিয়ে মন্দিরের প্রধান ফটকের দিকে। তাঁরা পৌঁছুতেই ফটকের কপাট খুলে গেল। সেখানে পালকি অপেক্ষা করছিল। তাঁরা উঠে বসতেই বাহকরা তা কাঁধে তুলে নিয়ে দৌড়াতে শুরু করলো। প্রশস্ত মেষমুখো-স্ফিঙ্কস সড়ক ধরে গিয়ে রাজপ্রাসাদের পেছনের এক গোপন দরজার কাছে পৌঁছুলো পালকি।

মধ্যরাত পার হয়ে গেছে। নিঃশেষ কাল অন্ধকার আর গভীর নৈঃশব্দ্য বিছিয়ে আছে থিবি নগরীর ওপর। মাঝে-মধ্যে কুকুরের চিৎকার আর প্রাচীরের ওপর সৈনিকদের হাঁক-ডাকে ভেঙে যাচ্ছে সেই নীরবতা। রাজপ্রাসাদে সোনার পালঙ্কে পাশাপাশি শুয়ে গভীর ঘুমে নিমগ্ন ফারাও ও রানী আহুরা। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল রানীর। ধড়মড় করে উঠে বসে ভয়ার্ত চোখে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন তিনি। পরমুহূর্তে ফারাওয়ের বাহু আঁকড়ে ধরে ফিস ফিস করে উঠলেন, 'ওঠো, ওঠো! আমি পেয়েছি!'

রানীর কণ্ঠে এমন কিছু ছিল, মুহূর্তে ঘুম ছুটে গেল ফারাওয়ের। 'কী হয়েছে, আহুরা? কী পেয়েছ?'

'ও ফারাও, অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখেছি আমি। জানি না নিছকই স্বপ্ন কিনা। দেখলাম অন্ধকার যেন দুভাগ হয়ে গেল, আর তার ভেতর দেখা দিল এক স্বর্গীয় জ্যোতি। কোন রূপ বা আকার নেই তার। সেই জ্যোতি নিচু মিষ্টি এক কণ্ঠে কথা বললো আমার সাথে। বললো, "রানী আহুরা, কন্যা আমার, তুমি আর তোমার স্বামী কিছুক্ষণ আগে আমার মন্দিরের পবিত্রতম কক্ষে যার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেছ আমি সেই নিরাকার সত্তা। তোমাদের দুজনেরই হয়তো মনে হয়েছে তোমাদের প্রার্থনা কেউ শোনেনি। কিন্তু তা ঠিক নয়, আমার পুরোহিত তা জানে। রানী আহুরা, তুমি ও তোমার স্বামী ফারাও এত বছর আমার ওপর যে আস্থা রেখেছ, তা বিফলে যায়নি। তোমরা একটি কন্যা সন্তান লাভ করবে। আমার সৌরভ থাকবে সেই শিশুর ভেতর। সে এমন সৌন্দর্য আর গৌরবের অধিকারী হবে, যেমনটা এর আগে কোন নারী হয়নি। আমি তাকে স্বাস্থ্য, ক্ষমতা আর জ্ঞানে আবৃত করে দেব। উত্তর ও দক্ষিণ ভূখণ্ডের ওপর রাজত্ব করবে সে। হ্যাঁ দীর্ঘদিন মিশরের জোড়মুকুট শোভা পাবে তার মাথায়। মিশরের সিংহাসনে তার আগে যারা বসেছে বা তার পরে যারা বসবে তাদের সবার চাইতেও বড় শাসক হবে সে। সমস্যা এবং বিপদ তার চলার পথকে কণ্টকিত করবে, তবে আমি যে চৈতন্য তাকে দেব তা তাকে রক্ষা করবে সকল বিপদ থেকে। সব শত্রুকে পায়ের নিচে মাড়িয়ে সে এগিয়ে যাবে। রাজরক্তের এক প্রেমিক তার কাছে আসবে। এই প্রেমে সার্থক হবে সে। তাদের প্রেম থেকে উৎসারিত হবে বহু রাজা ও রাজপুত্র। নেতের-তুয়া, ভোরের তারা হবে তার নাম। আমেন-এর প্রধান পূজারিনী হবে সে, কারণ সে আমার কন্যা; আমি তাকে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে পাঠাচ্ছি। ফারাও এবং তোমাকে যে সন্তান আমি দিচ্ছি আমার খুবই প্রিয় সে। দেব-দেবীদের নিযুক্ত করছি তার সাথী হিসেবে, এবং ওসিরিসকে নির্দেশ দিচ্ছি, তাকে স্বাগত জানাবে জীবনের সায়ংকালে।

'"দেখ, আমার ইচ্ছার নিদর্শন হিসেবে আমি তোমার বুকে আমার প্রতীক রাখছি। তোমার সন্তানের বুকেও থাকবে এই চিহ্ন। তোমার উপর থেকে এই প্রতীক যখন তুলে নেব, ফারাওকে জাগাবে তুমি। তাকে বলবে, আমার এই কথাগুলো যেন লিখে রাখে প্যাপিরাসের ওপর, যাতে করে এর একটা শব্দও হারিয়ে না যায়।"

'তারপর ফারাও,' বলে চললেন রানী, 'সেই স্বর্গীয় জ্যোতি থেকে আলোকময় একটি হাত এগিয়ে এলো। সে-হাতে আগুনের মত জ্বলজ্বল করছে জীবনের পবিত্র প্রতীক। সেই জ্যোতির্ময় হাত জীবনের প্রতীকটি চেপে ধরলো আমার বুকে। আমার বুক যেন পুড়ে যেতে লাগলো আগুনে। তারপরেই আমি জেগে গেলাম।'

এই স্বপ্নের কথা শুনে ফারাও পূর্ণ হৃদয়ে চুমু খেলেন রানীকে। এর মধ্যে যে শুভসঙ্কেত রয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি তাঁর। তালি বাজিয়ে তিনি পরিচারিকাদের ডাকলেন। আলো হাতে ছুটে এলো তারা। সেই আলোয় ফারাও দেখলেন, রানীর গলার সামান্য নিচে, ফর্সা ত্বকের উপর ফুটে উঠেছে লাল এক চিহ্ন, জীবনের পবিত্র প্রতীকের মত দেখতে সেটি–একটি বৃত্ত আর তার নিচে ক্রুশ।

ফারাও প্যাপিরাস ও লেখার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আসার জন্য লিপিকরদের নির্দেশ দিলেন। ডেকে পাঠালেন আমেন মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে। তাঁর উপস্থিতিতে রানীর মুখ থেকে শুনে আমেন-এর প্রতিটা কথা লিখে ফেলল লিপিকর, একটা শব্দও বাদ দেয়া হলো না। লেখার নিচে স্বাক্ষর করলেন ফারাও এবং রানী, সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করলেন প্রধান পুরোহিত। এই বিবরণীর বেশ কয়েকটি নকল তৈরি করিয়ে আসলটি রেখে দেয়া হলো আমেন-এর গোপন মহাফেজখানায়। আর জীবনের প্রতীক চিহ্ন রানীর বুকের ওপর রইল তাঁর মৃত্যুদিন পর্যন্ত।

সকালে ফারাও তাঁর পারিষদবর্গকে ডাকালেন। কুমার আবিকেও হাজির করার নির্দেশ দিলেন তাঁর সামনে। আবি আসার পর ফারাও তাকে বললেন, 'আমার পিতার পুত্র, তুমি যে অনুরোধ করেছ–তুমি আমার সাথে মিশরের সিংহাসনের অংশীদার হবে, এবং আমার পরে তুমি এবং তোমার পুত্ররা ফারাওয়ের আসন অলঙ্কৃত করবে–তোমার এই অনুরোধ আমি বিবেচনার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। জেনে নাও, আমার কাছে এবং রানী আহুরার কাছে দেবতারা প্রকাশ করেছেন, যথাসময়ে আমাদের একটি কন্যা সন্তান দেয়া হবে, তার নাম হবে আমেন-এর ভোরের তারা। আমার পরে সে এবং তার সন্তান-সন্ততিরাই হবে ফারাও। কুমার আবি, আমি এখন আশা করব তুমি আমাদের এবং তোমার সরকারের আনন্দের অংশীদার হবে। এবং দেবতারা যে মহত্ত্ব তোমাকে দিয়েছেন তা দিয়ে আমাদের ভালবাসায় আনন্দিত হবে।'

স্বভাবসুলভ কদর্যতা দিয়ে আবি ফারাওয়ের এই কথাকে কৌশল

বলে মনে করলো। রাগে সারা শরীর জ্বলে উঠলো তার। তবু ফারাওয়ের রোষের শিকার হওয়ার ভয়ে শান্ত কণ্ঠেই সে বললো, এই ভোরের তারা যখন উঠবে তার তারা তাকে পূর্ণ শ্রদ্ধা জানাবে। মুখে বললো বটে, কিন্তু তার মনে পড়ে গেল জ্যোতিষী কাকু-র ভবিষ্যদ্বাণীর কথা– আমেন-এর ভোরের তারা তার নক্ষত্রকে গ্রাস করবে।

'কুমার আবি, তুমি ভাবছ আমি বানিয়ে বলছি এসব কথা,' ফারাও বললেন। 'এজন্যও আমি তোমাকে ক্ষমা করছি। অপেক্ষায় থাক, সময় হলেই আমাদের সন্তান আসবে। সত্য রয়েছে আমার হৃদয়ে। নেতের-তুয়া যখন জন্ম নেবে তার বুকে থাকবে জীবনের পবিত্র প্রতীকচিহ্ন। এখন ফিরে যাও তোমার মেফিসে। আমি যে উপহারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা তোমার কাছে চলে যাবে যথাসময়ে।'

আবি ফিরে গেল তার শাদা দেয়াল ঘেরা মেফিস নগরীতে। তার বদ্ধমূল ধারণা ষড়যন্ত্র করে তাকে সিংহাসন বঞ্চিত করা হচ্ছে। কিন্তু কাকু আড়ালে মাথা নেড়ে বললো, না, নেতের-তুয়া উঠবে, দেবতাদের পিতা আমেনের ইচ্ছা তা-ই।

৩
রামেস, রাজকুমারী ও কুমীর

নির্ধারিত সময়ে রানী আহুরা একটি সন্তানের জন্ম দিলেন–ফুটফুটে কন্যা শিশু। ছোট্ট মাথায় তার ঢেউ খেলানো চুল, চোখ দুটো গ্রীষ্মের আকাশের মত নীল। বুকে আঙুলের নখের মত একটি জরুল, দেখতে হুবহু জীবনের পবিত্র প্রতীকের মত। এই শিশুর আগমনে ফারাও এবং তাঁর পুরো প্রাসাদ, দেশের প্রতিটা মন্দিরের পুরোহিতরা এবং সারা মিশর আনন্দে মেতে উঠলো। অবশ্য শিশুটি মেয়ে হওয়ায় কেউ কেউ যে মন খারাপ করলো না তা নয়। প্রকাশ্যে কিছু না বললেও নিজেদের মধ্যে তারা কানা-ঘুষা করতে লাগলো, মিশরের জোড়-মুকুট মানায় নারীর নয় পুরুষেরই মাথায়।

এই শিশুর জন্মের খবর দেশ ছাড়িয়ে পল্লবিত হয়ে বিদেশেও পৌঁছুলো। বলাবলি হতে লাগলো, দেবতাদের পাঠানো উপহার এই মেয়ে; তার জন্ম মুহূর্তে মানবজাতির স্রষ্টা খেমু দেবীর সঙ্গে আইসিস, নেপথিস, এবং হাথোরের মত দেবীরা স্বর্ণপ্রভার মত আঁতুর ঘর আলোকিত করে ছিলেন। ফারাও ফরমান জারি করলেন, দেশের

যেখানে যেখানে রানী আহুরার নাম উৎকীর্ণ আছে, প্রতিটা জায়গায় 'আমেনের ইচ্ছায়, তাঁর ভোরের তারার জননী' কথাটি খোদাই করে দিতে হবে। আমেন মন্দিরে নতুন একটি মিলনায়তন নির্মাণ করিয়ে তার দেয়ালে কুমার আবির আগমন এবং রানীর স্বপ্ন দর্শনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করারও নির্দেশ দিলেন ফারাও।

তবে রানী আহুরা এসব দেখার জন্য বেঁচে রইলেন না। মেয়ের জন্মের পর থেকেই তাঁর শরীর খারাপ হতে লাগলো। চতুর্দশ দিন–পবিত্রকরণ দিবসে তিনি ধাত্রীকে বললেন মেয়েকে নিয়ে আসতে। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ফুটফুটে শিশুটির মুখের দিকে। আশীর্বাদ করলেন। কিছুক্ষণ কথা বললেন শিশুটির কা অর্থাৎ দ্বিতীয় সত্তার সঙ্গে। রানী বললেন, মেয়ের কা-কে তিনি মেয়ের পাশেই শুয়ে থাকতে দেখেছেন। জীবন ও মরণের পর পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত যত বিপদ হতে পারে সব থেকে শিশুটিকে রক্ষা করার জন্য কা-কে অনুরোধ করলেন তিনি। এরপর রানী বললেন, আমেন-এর ডাক শুনতে পাচ্ছেন তিনি, সন্তানের জন্য যে মূল্য দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন, তাঁর নিজের জীবন–তা দেয়ার জন্য ডাকছেন আমেন। স্বামী ফারাওয়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু একটু হাসলেন রানী আহুরা। সেই হাসি মুখে নিয়েই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন তিনি।

আনন্দ শোকে পরিণত হলো। রানীর দেহ মমি করতে যে দিনগুলো লাগলো সেই ক'দিন সারা মিশর কাঁদলো রানী আহুরার জন্য। নির্ধারিত সময়ে তাঁর দেহ নীলনদের ওপর দিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো রানীদের উপত্যকায় তিনি নিজের জন্যে যে দারুণ সমাধি-মন্দির তৈরি করিয়েছেন সেখানে। যেদিন রানী সেই স্বপ্ন দেখেছিলেন সেদিনই তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর দিন ঘনিয়ে আসছে। তাই রাত দিন পরিশ্রম করিয়ে তিনি তাঁর সমাধি-মন্দির তাঁর দেহ ধারণের জন্য সাজিয়ে ফেলেন।

মহা ধুমধামের সঙ্গে রানী আহুরাকে সমাহিত করা হলো। সঙ্গে দেয়া হলো তাঁর সব অলঙ্কার ও রত্নরাজি। ফারাও সত্যি সত্যিই শোকাকুল হয়েছিলেন স্ত্রীর মৃত্যুতে। রানীর সমাধি-মন্দিরের প্রার্থনা-কক্ষে দরাজ হাতে অর্ঘ্য দিলেন তিনি। আর যে নৌকায় করে রানীর মরদেহ নীলের ওপর দিয়ে বয়ে আনা হয়, সমাধি-মন্দিরের প্রবেশ মুখে সেটিকে পাথর আর বালি দিয়ে চিরদিনের জন্য চাপা দিয়ে দিলেন, যাতে করে পুনরুত্থান দিবসের আগে কেউ তার খোঁজ না পায়।

বেড়ে উঠতে লাগলো রাজকীয় শিশুটি। বয়স যখন ছ'মাস হলো লালন-পালন ও শিক্ষার জন্য তাকে নিয়ে যাওয়া হলো আমেন-এর পূজারিণীদের সঙ্গে।

রাজকুমারী নেতের-তুয়া যেদিন জন্ম নেয়, একই দিন অন্য একটি শিশুরও জন্ম হয় মিশরে। আমেন-এর মন্দির-রক্ষকদের প্রধান মার্মিস। নিজের সৎ-বোন জাদুকরী আসতিকে তিনি বিয়ে করেছেন। ক্ষমতাসীন ফারাও ও তাঁর কন্যা নেতের-তুয়া যেমন এখনকার ফারাও বংশের শেষ সন্তান তেমনি বহু যুগ আগে, বর্তমান ফারাও বংশ ক্ষমতায় আসার আগে, যাঁরা মিশর শাসন করতেন সেই বংশের শেষ বৈধ উত্তরাধিকারী মার্মিস। অনেক বছর আগে, ফারাও সিংহাসনে বসার পরপরই তাঁর পারিষদদের অনেকে মন্ত্রণা দিয়েছিলেন, তিনি যেন মার্মিস ও তাঁর বোনকে হত্যা করেন, তা না হলে একদিন তাঁরা রক্তের অধিকারে মিশরের রাজ সিংহাসনের ওপর দাবি ঘোষণা করে বিদ্রোহ করে বসতে পারেন। কিন্তু ফারাও স্বভাবত দয়ালু প্রকৃতির এবং কোন ধরনের হত্যার পক্ষপাতি নন। হত্যা তো করলেনই না, বরং মার্মিসকে ডেকে পাঠিয়ে তিনি সব কথা খুলে বললেন।

ফারাওয়ের কথায় অভিভূত মার্মিস ষাষ্টাঙ্গে প্রণতি জানিয়ে বললেন, 'ও মহামহিম ফারাও, দেবতারা খুশি হয়ে আমার বংশকে ক্ষমতাচ্যুত করে আপনার বংশকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন। আমার পূর্বপুরুষরা রাজা ছিলেন এই কারণে আমি কি কখনও আপনার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেছি, বা আপনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য কোন রকম ষড়যন্ত্র করেছি? আপনার সেনাবাহিনীর একজন সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পেরে আমি সন্তুষ্ট। আমার সৎ-বোন, জ্ঞানী মহিলা আসতিকে আমি বিয়ে করতে মনস্থ করেছি। আপনার বিশ্বস্ত বিনীত সেবক হিসেবে শান্তিতে আমরা জীবন কাটিয়ে দিতে চাই। ও মহামহিম ফারাও, আমাদের নির্দোষ রক্তে হাত রাঙালে দেবতাদের অভিশাপ পড়বে আপনার এবং আপনার বংশের ওপর; আমাদের প্রেতাত্মারাও কবর থেকে উঠে এসে আপনাদের তাড়া করে ফিরবে।'

মার্মিসের কথায় ফারাওয়ের হৃদয় গলে গেল। জীবন ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তার নিদর্শন হিসেবে তিনি রাজদণ্ড এগিয়ে দিলেন। মার্মিস ভক্তিভরে চুম্বন করলেন তাতে।

'মার্মিস, তুমি মাননীয় মানুষ,' ফারাও বললেন। 'পদমর্যাদায় না হলেও রক্তের মর্যাদায় তুমি আমার সমান। দেবতারা তাঁদের উদ্দেশ্য

সাধনের জন্য একজনকে উঁচুতে তোলেন, অন্যকে নিচে নামান। আমি বিশ্বাস করি তুমি আমার বা আমার পরিবারের কোন ক্ষতি করবে না। তাই আমিও তোমার বা তোমার বোন যাদুর কর্ত্রী আসতির কোন ক্ষতি করবো না। বরং তুমি হবে আমার বন্ধু এবং পরামর্শদাতা।'

ফারাও মার্মিসকে উচ্চ পদ এবং মর্যাদা দেয়ার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু মার্মিস বিনীতভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, এতে অনেকেই ঈর্ষান্বিত হয়ে পিছনে লাগবে, যার পরিণতি হবে তাঁর মৃত্যু। তিনি জানেন লম্বা গাছই আগে ঝড়ে পড়ে। অগত্যা ফারাও তাঁকে আমেন-এর মন্দির-রক্ষকদের প্রধান করার পাশাপাশি তাঁকে সচ্ছল জীবন যাপনের মত জমি আর বাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। আর মার্মিস যা-ই বলুন না কেন ফারাও তাঁকে বন্ধু এবং একান্ত উপদেষ্টা হিসেবেই নিলেন। তাঁর সব পরামর্শই তিনি শোনেন। পরে মার্মিস আসতিকে বিয়ে করেন। তবে ফারাওয়ের মত তিনিও দীর্ঘদিন নিঃসন্তান ছিলেন। রাজকুমারী তুয়া, আমেন-এর ভোরের তারার জন্ম যেদিন হলো সেদিন আসতিও একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন–রাজকীয় চেহারার স্বাস্থ্যবান এক পুত্রসন্তান। বংশের ধারা অনুযায়ী গায়ের রং ফর্সা হলেও চোখ দুটো তার চকচকে কাল।

শিশুটিকে কোলে নিয়ে ধাত্রী বলে উঠলো, 'দেখেছ এই বাচ্চার মাথাটা? ঠিক মুকুট পরবার মত!'

আনন্দে সব সতর্কতা ভুলে, অথবা দেবতাদের প্রেরণায় আসতি বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, আমারও মনে হয় এই মাথায় রাজমুকুট শোভা পাবে।' ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেলেন আসতি, নিজের রাজকীয় পূর্বপুরুষ, তাঁদের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নামে তার নাম রাখলেন রামেস।

এক গুপ্তচর আসতির কথা শুনে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে জানালো ফারাওয়ের মন্ত্রণা-পরিষদকে। পরিষদ আসতির কথাগুলোকে অশুভ সঙ্কেত হিসেবে ধরে নিলেন। পূর্বতন এক রাজার নামে ছেলের নাম রাখার ব্যাপারটিকেও তাঁরা সন্দেহজনক বলেই বিবেচনা করলেন। তাঁরা ছেলেটিকে হত্যা করার পরামর্শ দিলেন ফারাওকে, যেমন দিয়েছিলেন তার বাবা মার্মিসের ব্যাপারে। কিন্তু ফারাও মৃদু হেসে তাঁদের প্রশ্ন করলেন, তাঁরা কি চান তিনি একই দিনে জন্ম নেয়া আরেকটি শিশুর রক্ত দিয়ে তাঁর সন্তানের জন্মোৎসব পালন করবেন?

'রা সবার ওপর সমানভাবে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ষণ করেন,' বললেন ফারাও। 'কে বলতে পারে উচ্চ বংশে জন্ম নেয়া এই শিশু বড় হয়ে

আমেন-এর দয়ায় মিশর যে উত্তরাধিকারী পেয়েছে তার বিপদের বন্ধু হবে না? দেবতাদের বিধান মতে সব চলতে দিন। আমি কে যে দেবতাদের ইচ্ছায় বাদ সেধে একটি জীবনের ইতি ঘটাবো?'

অতএব বেঁচে রইল রামেস। মার্মিস এবং আসতি যখন জানতে পারলেন কীভাবে বেঁচে গেছে তাঁদের সন্তান, তাঁরা অকুণ্ঠচিত্তে ধন্যবাদ জানালেন ফারাওকে।

মার্মিসের বাসা আমেন-এর বিশাল মন্দিরের সীমানা-প্রাচীরের ভেতরে, আমেনের প্রধান পূজারিণীর প্রাসাদের কাছে। এই প্রাসাদেই লালিত পালিত হচ্ছে রাজকুমারী নেতের-তুয়া। রানী আহুরা মারা যাওয়ার পরপরই ফারাও ঘোষণা করে দেন, রাজরক্ত যার দেহে নেই এমন কোন নারী রাজকন্যাকে বুকের দুধ দিতে পারবে না। ফারাওয়ের এই নির্দেশের ফলেই আসতি নিয়োগ পেলেন রাজকুমারীর স্তন্যদাত্রী বা প্রধান লালনকারী হিসেবে। তুয়ার দাই-মা হয়ে উঠলেন আসতি। রাতের পর রাত তাঁর কোলে তাঁর ছেলে রামেসের পাশে শুয়ে বেড়ে উঠতে লাগল তুয়া। হামাগুঁড়ি দেয়া, হাঁটা থেকে শুরু করে কথা বলা পর্যন্ত সবই দুটি শিশু শিখলো একসঙ্গে। আরেকটু বড় হয়ে দুজন হয়ে উঠলো খেলার সাথী।

এইভাবে শুরু থেকেই তারা জমজ ভাই-বোনের মত একজন আরেকজনকে ভালবেসে বড় হয়ে উঠতে লাগল। তবে ছেলেটা অনেক বেশি সাহসী আর দুর্দান্ত প্রকৃতির হলেও মেয়েটিকেই সবসময় দেখা যায় সর্দারের ভূমিকায়। সে রাজকন্যা এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী এমন সব কথা শুনতে শুনতে এবং সবার কাছ থেকে সম্মান ও কুর্ণীশ পেতে পেতে নেতের-তুয়ার ভেতর অহমিকাবোধ তৈরি হওয়ায় যে এটা ঘটেছে তা নয়। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে এ-ধরনের কথা-বার্তা বা পারিষদ-পুরোহিতদের কুর্ণীশের মত ব্যাপারগুলো সে খেয়ালই করে না। আসলে ভেতর থেকে ফুটে বেরোনো আশ্চর্য এক শক্তির কারণেই নেতার আসনটি থাকে তার দখলে। আর দশটি স্বাস্থ্যবান শিশুর মত নেতের-তুয়াও প্রাণোচ্ছল, সপ্রতিভ। তবে একটি দিক থেকে সে আর সব ছেলে-মেয়ের চাইতে আলাদা। দিনের একটা নির্দিষ্ট সময় সে কাটায় সম্পূর্ণ একা নির্জনে। সে নিজে এর নাম দিয়েছে 'নীরব প্রহর'। এই সময় কোন পরিচারিকা, প্রাসাদের কোন মহিলা, তার পালক-মা আসতি বা এমনকি রামেসও তার কাছে আসতে পারে না। নীরব প্রহর কাটিয়ে সে হেঁটে বেড়ায় মন্দিরের বিশাল স্তম্ভগুলোর ভেতর দিয়ে।

দেয়ালে খোদাই করা ভাস্কর্য দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ফারাওয়ের সন্তান হিসেবে সব জায়গায় তার অবাধ যাতায়াত। মন্দিরের একেবারে ভেতরের সংরক্ষিত এলাকায় চলে যায় নেতের-তুয়া। দেবতাদের পাথরে তৈরি মূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে অপলক চোখে।

'ভোরের তারা, কী এত দেখ তুমি ঐসব পাথরের মূর্তির ভেতর?' ছোট্ট রামেস একদিন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল। 'নিরস জিনিসগুলো পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে কোনদিন নড়েনি। আমার ভয় লাগে ওগুলো দেখলে।'

'মোটেই নিরস নয়, আর ওগুলো দেখলে আমার ভয়ও লাগে না,' বলেছিলো তুয়া। 'ওরা আমার সাথে কথা বলে, যদিও সব কথা আমি বুঝতে পারি না।'

'কথা বলে! পাথর আবার কী করে কথা বলে?'

'আমি ঠিক জানি না। মনে হয় ওদের আত্মা কথা বলে। আমাকে নানা রকম গল্প শোনায়। আমার জন্মের আগে যা ঘটেছে, আমার মৃত্যুর পরে যা ঘটবে সব ওরা বলে। এখন চুপ করো, আমি বলেছি ওরা আমার সাথে কথা বলে, [illegible]স।'

রামেসের বয়স সাত বছর হওয়ার পর প্রতিদিন সকালে তাকে মন্দিরের বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হতে লাগলো। সেখানে পুরোহিতরা তাকে খাগড়ার কলম দিয়ে কাঠের ফলকের ওপর লিখতে শেখান, আর মিশরের সব দেবতার কাহিনী শোনান। এই সময়টায় রাজ অন্তঃপুরের মহিলা এবং পূজারিণীদের কাছে নানা বিষয়ে পাঠ নেয় নেতের-তুয়া। তার পরেও অনেকটা সময় তাকে একা কাটাতে হয়। ফারাওয়ের নির্দেশে অন্য কোন ছেলে বা মেয়েকে তার সঙ্গে খেলতে দেয়া হয় না। এর কারণ সম্ভবত মন্দিরে তার বয়সী রাজরক্তধারী আর কোন ছেলে বা মেয়ে নেই।

একদিন বিকেলে বিদ্যালয় থেকে ফিরে রামেস রাজকন্যাকে জিজ্ঞেস করলো, তাকে ছাড়া তুয়ার একা একা লাগে কিনা। তুয়া বললো, না, কারণ তার আরেকজন সাথী আছে।

'কে সে,' ঈর্ষার সাথে জিজ্ঞেস করলো রামেস। 'দেখাও তাকে, তার সাথে আমি লড়াই করবো।'

'তাকে তো তুমি দেখতে পাবে না, রামেস। সে আমার কা।'

'তোমার কা! কা সম্পর্কে আমি শুনেছি, কিন্তু কখনও দেখিনি। কেমন এই কা?'

'আমার মতই, তবে কোন ছায়া ফেলে না; আর শুধু তখনই আসে

যখন আমি খুব নির্জনে একা একা থাকি। তার কথা শুনি প্রায়ই, কিন্তু দেখা পাই খুব কম, কারণ আলোর সাথে তা মিশে থাকে।'

'আমি কা-য়ে বিশ্বাস করি না,' ঝাঁঝের সাথে বললো রামেস। 'তুমি মনে মনে বানিয়েছ এগুলো।'

দুজনের এই আলাপের কদিন পরেই এমন একটা ব্যাপার ঘটলো যে রামেস তার কা বিষয়ক ধারণা পাল্টাতে বাধ্য হলো। মন্দিরের ভেতর দিকে এক লুকানো উঠানে একটা পাড় বাঁধানো পুকুর আছে। বলা হয়, পবিত্র কুমীরের আবাস এই জলাশয়। জনশ্রুতি, বিশাল জন্তুটা কয়েকশো বছর ধরে ওখানে আছে। রামেস ও তুয়া শোনার পর থেকেই এই কুমীর দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। কিন্তু পারেনি। পুকুরটির চারপাশে উঁচু দেয়াল। তার একটিমাত্র তামার দরজায় সবসময় তালা মারা থাকে। প্রতি আটদিন পর পর পুরোহিতরা খাবার নিয়ে যায় কুমীরের জন্যে–জ্যান্ত ছাগল আর ভেড়া, কখনও কখনও বাছুর। সেগুলোর কোনটাই কখনও ফেরত আসে না।

একদিন রামেস দেখলো, তামার দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে পুরোহিতরা। তাদের যার কাছে চাবি থাকে তাকে বলা হয় দরজার অভিভাবক। সেদিন এই লোকটি দরজায় তালা লাগানোর পর যখন কোমরের থলেতে চাবি গুঁজে রাখছে, অসাবধানে চাবিটা থলের ভেতর না ঢুকে পড়ে গেল মাটিতে। ওদিকে তখন খাওয়ার সময়ও হয়ে গেছে। দরজার অভিভাবক লোকটা মোটাসোটা ভোজনরসিক। দ্রুত পায়ে সে চলে গেল খাবার ঘরের দিকে। চাবিটা যে পড়ে গেছে, টেরও পেলো না। সে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রামেস চাবিটা তুলে নিয়ে ছুটলো রাজকুমারীর কাছে।

'ভোরের তারা,' বললো রামেস, 'আজ বিকেলে আমি বিদ্যালয় থেকে ফেরার পর ওরা যখন তোমার সুঙ্গে আমাকে খেলতে দেবে তখন আমরা ঐ পুকুরে ভয়ঙ্কর জন্তুটা দেখতে যাব। এই দেখ, দরজার চাবি পেয়েছি।' কীভাবে চাবিটা পেয়েছে রাজকুমারীকে তা শোনালো রামেস। শেষে যোগ করলো, 'সাতদিন পার হওয়ার আগে মোটা পুরোহিত আর এই চাবি খুঁজবে না। আমাদের দেখা শেষ হয়ে গেলে চাবিটা আমি ফিরিয়ে দিয়ে আসব। বলবো, কুড়িয়ে পেয়েছি। অথবা চুপি চুপি তার থলেতেও রেখে দিতে পারি।'

তুয়ার চোখ চক চক করে উঠলো। পবিত্র দানবটার কথা শোনার পর থেকেই ওটা দেখার জন্য সে অস্থির হয়ে আছে। রামেসেরও সারাটা দিন গেল অস্থিরতার ভেতর। বিকেলে বিদ্যালয় থেকে ফেরার

পথে এক সহপাঠীর কাছ থেকে একটা কবুতর জোগাড় করে আনলো জন্তুটাকে খাওয়ানোর জন্য। কিন্তু রাজকুমারীর মন তখন অন্যরকম।

'আমার মনে হয় না পবিত্র কুমীর দেখতে যাওয়াটা আমাদের উচিত হবে,' দ্বিধার সঙ্গে বললো তুয়া।

'কেন?' বিস্মিত রামেস। 'কেউ ওখানে থাকবে না যে আমাদের দেখে ফেলবে। তাছাড়া চাবিটায় আমি তেল মাখিয়ে এনেছি। খোলার সময় কোন শব্দ হবে না।'

'আমার কা বলেছে,কাজটা ঠিক হবে না, রামেস। ওখানে গেলে বিপদে পড়তে হবে।'

'ওহ! নিষ্ঠুর সেৎ নিয়ে যাক তোমার কা-কে!' রাগে ফেটে পড়লো রামেস। 'আমাকে দেখাও, আমি কথা বলবো তার সাথে।'

'সেটা সম্ভব নয়, রামেস, কারণ আমিই সে। তার চেয়ে বড় কথা, সেৎ যদি তাকে নিয়ে যায় তাহলে আমাকেও নিয়ে যাবে। এ-কথা তোমার বলা ঠিক হয়নি।'

কাঁদতে শুরু করলো রামেস। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, তুয়াকে বিশ্বাস করাই তার ঠিক হয়নি। কবুতরটা জোগাড় করতে তাকে তার ব্রোঞ্জের ছোরাটা হাতছাড়া করতে হয়েছে। শেষবার যখন ফারাও মন্দিরে এসেছিলেন তখন তিনি তাকে ঐ ছোরা উপহার দিয়েছিলেন। এখন ছোরাটা খোয়ানোর কথা শুনলে ফারাও নিশ্চয়ই রাগ করবেন।

রামেসের কান্না দেখে মন গলে গেল তুয়ার। নরম করে সে বললো, 'কেন আমরা নিছক মজা করার জন্য নিরীহ একটা কবুতরের প্রাণ নেব?'

'ওর প্রাণ তো নেয়া হয়ে গেছে,' রামেস বললো। 'এমন ডানা ঝটপট করছিল যে পুরোহিত যেন দেখে না ফেলেন সেজন্য ওটার ওপর বসে পড়েছিলাম আমি। পুরোহিত যখন চলে গেলেন, উঠে দেখি মারা গেছে। এই যে দেখ।'

'তুমি তো আর মেরে ফেলতে চাওনি, সুতরাং তেমন দোষ হয়নি,' বেশ একটা বিচক্ষণতার ভঙ্গিতে বললো তুয়া। 'যাহোক, এখন মনে হচ্ছে আমরা একবার মাত্র দেখলেও খুব ক্ষতি হয়ে যাবে, আমার কা তেমনটা বোঝাতে চায়নি। তাছাড়া কবুতরটাও নষ্ট হবে। এর অর্থ দাঁড়াবে একেবারেই অকারণে মরলো বেচারি।'

রামেসও একমত হলো তার সাথে, এর চেয়ে দুঃখের আর কিছু হবে না তাহলে। অতএব দুজন বাগান পেরিয়ে পা টিপে টিপে দেয়ালের ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে গেল তামার দরজাটার কাছে। দুরু দুরু

বুকে বিরাট চাবিটা ঢোকালো রামেস তালার ভেতর। খুলে গেল তালা। দুজনে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে দরজার ভারি হুড়কোটা টেনে খুললো। পাছে কোন কারণে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে চাবিটা, এই ভেবে সেটা তালা থেকে খুলে নিয়ে রামেস সামান্য ফাঁক করলো দরজার কপাট এবং কোনমতে ঠেলেঠুলে ঢুকে পড়লো নিষিদ্ধ জায়গাটায়।

ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দুজনের মনে হলো তক্ষুনি বেরিয়ে ছুটে পালায়। পুরো জায়গাটায় এমন কিছু আছে যা ভয় ধরিয়ে দেয় মনে। ভয়ানক দুর্গন্ধে তুয়া অসুস্থ বোধ করতে লাগলো। পুকুরটা বেশ বড়। পিচ্ছিল আঠালো পানি তাতে। উঁচু দেয়ালের ছায়ায় তা কাল দেখাচ্ছে। পুকুরের মাঝখানে কৃত্রিম একটা দ্বীপ, আর চারপাশে পাড় দিয়ে চলে গেছে সরু পথ। এই পথের এক জায়গায় কয়েকটা গাছ একটা ঝোপ মত তৈরি করেছে। তার পাশে পাথর বাঁধানো একটুখানি ঢালু জায়গা। ছোট্ট একটা নৌকার গলুই ঠেকানো রয়েছে সেখানে। নৌকার ওপর দাঁড় কয়েকটা। তবে কুমীরের কোন চিহ্ন কোথাও নেই।

'কোথাও ঘুমিয়ে আছে,' ফিস ফিস করে বললো তুয়া। 'চলো চলে যাই। এই পচা গন্ধ আমার ভাল লাগছে না।'

'পচা গন্ধ কোথায়?' বললো রামেস। 'আমি তো পদ্মফুল ছাড়া আর কিছুর গন্ধ পাচ্ছি না। চলো জাগাই কুমীরটাকে। এ-পর্যন্ত এসে ফিরে যাওয়ার কোন মানে হয় না। তুমি নিশ্চয়ই ভয় পাওনি?'

'না না, ভয় পাব কেন?' বললো তুয়া। 'জাগালে তাড়াতাড়ি জাগাও।'

রামেস যা বলেনি তা হলো ইচ্ছে করলেও এখন আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, কারণ ওরা ঢোকার পরই দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, এবং ভেতর দিকে কোন চাবির ছিদ্র নেই। পুকুর পাড়ের সরু পথ ধরে এগিয়ে চললো ওরা। কিন্তু কুমীরটাকে দেখা গেল না। ওদের সাড়া-শব্দ পেয়ে জাগলোও না সেটা।

'চল, নৌকায় উঠে খুঁজে দেখি,' বললো রামেস। 'ঐ দ্বীপে লুকিয়ে আছে হয়তো।'

পাথরের ঢালু ঘাটটার কাছে নিয়ে গেল রামেস তুয়াকে। পাশেই পড়ে আছে কুমীরকে শেষবার যে খাবার দেয়া হয়েছিল তার উচ্ছিষ্টাংশ। দেখেই গা ঘিন ঘিন করে উঠলো তুয়ার। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো নৌকায়। গলুই ধরে একটা ধাক্কা দিয়ে রামেসও লাফ দিয়ে নৌকায় উঠে দাঁড় তুলে নিয়ে বাইতে শুরু করলো। দ্বীপটার চারপাশে পুরো এক চক্কর দিয়ে আসার পরও কুমীরটার কোন চিহ্ন দেখা গেল

না।

'মনে হচ্ছে না আদৌ কোন কুমীর এখানে আছে,' বললো রামেস।

'কবুতরটা দিয়ে দেখ না,' পরামর্শ দিলো তুয়া। কৌতূহল ফিরে আসছে তার মনে।

তাই তো, এতক্ষণ কেন মনে পড়েনি! সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠলো রামেস। মরা পাখিটাকে থলে থেকে বের করে ডানা দুটো মেলে ধরলো, যেন ওটাকে জ্যান্ত মনে হয়। পানিতে ছুঁড়ে দিয়ে বলে উঠলো, 'ও পবিত্র কুমীর, জেগে ওঠো!'

তারপর–কতক্ষণ পর ওরা বলতে পারবে না, আতঙ্ককর আকস্মিকতায় দুজন দেখলো, কুমীরটা জেগে উঠেছে। আঁশালো একটা মাথা উঠে এসেছে পানির নিচ থেকে। দুটো নিষ্প্রাণ চোখ। হাঁ করা মুখটায় অগুনতি দাঁত। মাথার পেছনে দানবীয় জন্তুটার বিশাল শরীর, কত হাত লম্বা কে জানে! মুহূর্তের মধ্যে দুই সারি শাদা দাঁত গিলে ফেললো কবুতরটাকে। তারপর সব উধাও।

'এই হলো পবিত্র কুমীর!' রুদ্ধশ্বাসে বললো রামেস। পানির ওপর তোলপাড়ের দিকে তার চোখ। 'আটজন ফারাওয়ের শাসনকাল জুড়ে এখানে আছে। এখন আমরা দেখলাম!'

'হ্যাঁ,' বললো তুয়া, 'এবং আমি আর একবারও ওটাকে দেখতে চাই না। এক্ষুনি আমাকে নিয়ে চলো এখান থেকে, নইলে তোমার বাবাকে বলে দেব।'

এই হুমকির পর আর কথা থাকে না। ছোঁ মেরে দাঁড় তুলে নিলো রামেস। এই সময় হঠাৎ ওদের প্রায় নিচে আবার মাথা তুললো প্রাচীন কুমীরটা। ভয়ঙ্কর হাঁ করে তরতরিয়ে আসতে লাগলো নৌকার পেছন পেছন। আতঙ্কে অস্থির তুয়া চিৎকার করে তার কা সম্পর্কে কিছু একটা বললো।

'ওকে বলো কুমীরটাকে যেন দূরে রাখে!' চিৎকার করলো রামেস। 'কা-দের কেউ ক্ষতি করতে পারে না।'

কিন্তু কুমীরটাকে দূরে রাখা গেল না। ধূসর রঙের নাক বাড়িয়ে এসে এমনভাবে থাবা মেরে নৌকার পেছন দিকটা টেনে ধরলো যে নৌকা রামেসের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। কুমীরটা হাঁ করে মুখ বাড়ালো নৌকার আরোহীদের গিলে ফেলবার জন্য।

'ওহ! খেয়ে ফেলবে আমাদের!' চিৎকার করে উঠলো তুয়া।

সেই মুহূর্তে নৌকা ঘাট ছুঁয়ে সাঁ করে আধ পাক ঘুরে গেল। গলুই এসে আঘাত করলো কুমীরের মাথায়। ঘা খেয়ে ভয়ানক খেপে গিয়ে

কুমীরটা গলুইয়ের ওপর থাবা বসিয়ে নৌকায় উঠে পড়ার চেষ্টা করলো। গলুইয়ের কাছেই বসে ছিল তুয়া। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো সে। এদিকে কুমীরের থাবার টানে নৌকার সামনের অংশ বেশ খানিকটা হেলে পড়ে পানি উঠতে শুরু করেছে। বয়স যত অল্পই হোক, রামেসের ভেতর সুপ্ত দুর্জয় সাহস জেগে উঠলো।

'পাড়ে লাফিয়ে পড়ো, পাড়ে লাফিয়ে পড়ো!' তুয়ার উদ্দেশ্যে চিৎকার করেই সে তার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে সরীসৃপটার মাথায় দাঁড় বাধিয়ে ঠেলে রাখলো।

'চলে এসো, রামেস,' ডাঙায় লাফিয়ে পড়ে চিৎকার করলো তুয়া।

কিন্তু এলো না রামেস। ওর ছোট্ট সাহসী হৃদয়ে তখন ভাবনা, ও সরলেই কুমীরটা তুয়াকে তাড়া করে খেয়ে ফেলবে। যতক্ষণ পারলো ও দাঁড় চেপে ধরে রইলো কুমীরের মাথায়। এক সময় কুমীরটা দাঁড় থেকে মাথা ছাড়িয়ে নিয়ে খপ করে কামড় লাগালো দাঁড়ের ফলায়। কাঠের দাঁড় দু-টুকরো হয়ে গেল। কুমীরটা তখন ডাঙায় যেখানে তাকে খাবার দেয়া হয় সে-জায়গার দিকে এগোতে শুরু করেছে। তুয়া দাঁড়িয়ে সেখানে। এক মুহূর্ত দেরি না করে রামেস পানিতে লাফিয়ে পড়ে সর্বশক্তিতে ঘুষি মারলো কুমীরের চোখে। ব্যথায় একটু থমকালো কুমীরটা। পর মুহূর্তে ছোঁ মেরে রামেসের ডান হাত কামড়ে ধরে তাকে টেনে নিয়ে চললো পুকুরের মাঝদিকে। একটা শব্দ করেনি রামেস, কিন্তু তুয়া দেখতে পেলো তার মুখে তীব্র যন্ত্রণার ছাপ।

'সাহায্য করো আমাকে, আমেন,' কাঁদো কাঁদো স্বরে মিনতি করলো তুয়া। লাফ দিয়ে গিয়ে ধরে ফেললো রামেসের অন্য হাতটা। পাথরের একটা খাঁজে পা বাধিয়ে টানতে লাগলো প্রাণপণে। কিন্তু কুমীরের টান প্রচণ্ড। তুয়ার একবার মনে হলো পারবে না সে রামেসকে ধরে রাখতে, পড়ে যাবে মুখ থুবড়ে। তারপর ডুবে মরবে অথবা রামেসের সঙ্গে কুমীরের পেটে যাবে। পর মুহূর্তে কিছু একটা হলো। তুয়া আর রামেস ছিটকে এসে পড়লো পাথরের ওপর। দুজন উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে এগোলো পুকুর পাড়ের সরু পথ ধরে। তুয়া খেয়াল করলো, রামেস বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে আছে নিজের ডান হাতের দিকে। তুয়াও দেখলো, রক্তে মাখামাখি হাতটায় কড়ে আঙুল নেই। এরপর পুকুর-প্রাচীরের তামার দরজায় ভারি কিছুর আঘাতের একটা শব্দ ছাড়া আর কিছু মনে নেই তার।

*

জ্ঞান ফিরে তুয়া দেখলো, মার্মিসের বাসায় শুয়ে আছে সে, দাইমা

আসতি ঝুঁকে আছেন তার ওপর। কাঁদছেন আসতি।

'কাঁদছ কেন, দাইমা?' জিজ্ঞেস করলো তুয়া, 'আমি তো বেঁচেই আছি।'

'আমার ছেলের কথা ভেবে কাঁদছি, রাজকুমারী,' আসতি বললেন।

'রামেস মারা গেছে?'

'না, ভোরের তারা, ও ওর কামরায় শুয়ে আছে। কিন্তু ফারাও শিগগিরিই ওকে হত্যা করার আদেশ দেবেন। মিশরের ভবিষ্যৎ রানীকে মহাবিপদের মধ্যে নিয়ে গেছিল সে।'

'মোটেই না,' লাফ দিয়ে উঠে বসে বললো তুয়া। 'ও আমার জীবন বাঁচিয়েছে।'

রাজকন্যার কথা শেষ হতে না হতেই ঘরে ঢুকলেন ফারাও। প্রাসাদ থেকে ছুটতে ছুটতে এসেছেন তিনি। মুখটা ফ্যাকাসে। উদ্বেগে কাঁপছে দেহ। তাঁকে জানানো হয়েছে পানিতে ডুবে গিয়েছিল তাঁর মেয়ে। কিন্তু ফারাও যখন দেখলেন মেয়ে তাঁর শুধু বেঁচেই নেই, আছে একেবারে অক্ষত, তিনি খুশি ধরে রাখতে পারলেন না। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন পাশে। দেবতাদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগলেন। তুয়া বাবাকে চুমু খেয়ে তাঁর প্রাজ্ঞ চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তিনি এত ভয় পেয়েছেন কেন।

'ভয় পাব না? আমি ভেবেছিলাম তুমি মারা গেছ।'

'কেন অমন ভাবলে? সবার বড় দেবতা আমেন আমার জন্মের আগে না প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি সব সময় আমাকে রক্ষা করবেন? অবশ্য রামেস না থাকলে আজ যে কী হতো–'

রামেসের নাম শুনেই রাগে জ্বলে উঠলেন ফারাও। 'ঐ বজ্জাত ছেলেটার কথা আর বলবে না। যতক্ষণ না মরে ওকে চাবকানো হবে।'

'এসব কথা ভুলে যাও, বাবা,' সোজা হয়ে বললো তুয়া। 'রামেস মারা গেলে আমিও মারা যাব। আজ যা ঘটেছে এর সব দায় আমার, ওর নয়। আমার কা আমাকে সতর্ক করেছিল, যেন ঐ কুমীর দেখতে না যাই। কিন্তু রামেসকে কোন কা সতর্ক করেনি। তার চাইতে বড় কথা ঐ অশুভ কুমীর আমাকে গিলে ফেলতো, যদি না রামেস তার সাথে যুদ্ধ করে আমাকে বাঁচাতো। নিজের জীবনের কথা ও একবারও ভাবেনি। পুরো ঘটনা আমি বলছি, শোন।'

দুই ছেলে-মেয়ের কুমীর দেখতে যাওয়ার পুরো বিবরণ শুনে ফারাও রামেসকে ডেকে পাঠালেন। ধরাধরি করে নিয়ে আসা হলো

ছেলেটাকে। প্রচুর রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফারাওয়ের সামনে একটা তেপায়ায় বসিয়ে দেয়া হলো তাকে।

'আমাকে হত্যা করুন, মহামহিম ফারাও,' দুর্বলকণ্ঠে বললো রামেস, 'আমি পাপ করেছি। রাজকন্যাকে আমি বিপদের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলাম। তবু আমার আত্মা যে রাজকন্যাকে রক্ষা করবার জন্য আমাকে ঐ ভয়ঙ্কর জন্তুর সঙ্গে লড়বার শক্তি যুগিয়েছে সেজন্য আমি খুশি মনেই মরবো।'

'সত্যিই কাজটা খুব খারাপ হয়েছে,' মাথা নেড়ে বললেন ফারাও। 'তুমি পুরো হাতটা হারাতে পারতে, এমনকি জীবনও। তবু তোমার প্রশংসা না করে পারছি না। রাজকীয় হৃদয় আছে তোমার। তুমি তোমার খেলার সাথীকে বাঁচিয়েছ, আর এখন আমার সামনেই নিজের ঘাড়ে সব দোষ টেনে নিচ্ছ। মার্মিসের পুত্র, আমি তোমাকে ক্ষমা করছি। আজ বুঝতে পারছি, জন্মের পরপরই তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ যারা দিয়েছিল তাদের কথা না শুনে আমি বুদ্ধিমানের কাজই করেছি।'

ঝুঁকে ছেলেটির কপালে চুমু খেলেন ফারাও। তারপর দেশের সেরা চিকিৎসকদের তার চিকিৎসার ভার নেয়ার নির্দেশ দিলেন। আর কবুতর সংগ্রহের জন্য যে ছোরা দান করতে হয়েছিল সেটার জায়গায় ফারাও আজ রামেসকে দিলেন সোনার বাঁটওয়ালা একটি তলোয়ার। বাঁটটা দেখতে কুমীরের মত। ফারাও রামেসকে বললেন, একদিন যে রানী হবে সারা জীবন সে যেন সাহসিকতার সঙ্গে ঐ তলোয়ার দিয়ে তাকে রক্ষা করে। উপরন্তু, রামেস বয়েসে বালক হলেও ফারাও তাকে *রাজানুগ্রহভাজন রাজপুরুষ* খেতাবে ভূষিত করলেন, সেই সাথে দিলেন একটা উপাধি, যার অর্থ *রাজকীয় নারীর রক্ষাকর্তা*।

ফারাও চলে যাওয়ার পর ভবিষ্যদ্বক্তা আর্সতি ফারাওয়ের দেয়া তলোয়ারটা দেখলেন।

'বাজরক্ত দেখতে পাচ্ছি এতে,' বলে সেটা ছেলের হাতে ফিরিয়ে দিলেন তিনি।

এরপর থেকে আর কখনও রামেস আর তুয়াকে একা একা একসাথে খেলতে দেয়া হয়নি। রাজকন্যা যেখানেই যাক তার সাথে থেকেছে এক বা একাধিক অভিজাত মহিলা এবং রক্ষী। বছর দুয়েকের মধ্যে রামেসকে সৈনিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এক সেনাধ্যক্ষের হাতে তুলে দেয়া হলো। তখন থেকে নেতের-তুয়া তার দেখা পায় না বললেই চলে। তবু ওদের ভেতর এমন একটা বন্ধন রয়েই গেল,

চোখের অদেখায় যা হারিয়ে যায় না। এরই মধ্যে ওরা একে অপরকে ভালবেসে ফেলেছে। প্রতি রাতে তুয়া যখন আমেন-এর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে, বাবা ফারাও এবং মা আহুরার আত্মার মঙ্গল কামনার পরই সে রামেসের জন্য প্রার্থনা করে। প্রার্থনা করে যেন শিগগিরই তাদের দেখা হয়।

৪
আমেনকে আবাহন

সময় বয়ে গেল তার নিজের গতিতে। আমেনের ভোরের তারা রাজকুমারী নেতের-তুয়া যৌবনে পদার্পণ করলো। তার পরিশুদ্ধির আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হলো ধুমধামের সঙ্গে। রূপে-গুণে অদ্বিতীয়া নেতের-তুয়া। সারা মিশরে তার জুড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঋজু, দীর্ঘাঙ্গিনী মেয়েটির দুচোখ সাগরের মত নীল, ভোরের সূর্যের মত গোলাপি গাল; আর মাথার চুলগুলো খোপা করে সোনার জালে ঢাকা না থাকলে কোমর ছাড়িয়ে পড়ে। মেধা ও জ্ঞানেও তার জুড়ি মেলা ভার। পুরোহিত-পূজারিণীরা যা যা তারা জানেন সবই তাকে শিখিয়েছেন। বীণাবাদন এবং নাচ-গানেও সে পটু হয়ে উঠেছে। আর আমেনের দেওয়া তার কা তাকে দিয়েছে আরও গভীর জ্ঞান। ঘুমন্ত পৃথিবী যেমন রাতের অন্ধকারে শিশিরকণা সংগ্রহ করে তেমনি নিজের অজান্তে শয়নে-স্বপনে-জাগরণে সে পেয়েছে সেই জ্ঞান। উপরন্তু পিতা, প্রাজ্ঞ ফারাও তাকে শিখিয়েছেন রাষ্ট্র পরিচালনা ও শত্রুকে প্রতিহত করার তাবৎ কলা-কৌশল। লেখাপড়া যখন শেষ হলো, আরেকটু আগ বাড়িয়ে ফারাও তুয়াকে রাষ্ট্র পরিচালনার সহযোগী করে নিলেন।

ফারাও বললেন, 'বরাবরই আমি শারীরিকভাবে দুর্বল, তার উপর বুড়ো হয়েছি। এই বিশাল মুকুটের ভার আমার মাথা আর বহন করতে পারছে না। এই ভারের কিছুটা তোকে নিতে হবে, মা।'

ফারাওয়ের ইচ্ছায় তরুণী নেতের-তুয়া রানী হলো মিশরের। মহা জাঁকজমকের সাথে অভিষেক সম্পন্ন হলো তার। প্রধান পুরোহিত আর পূজারিণীরা অভিষেক অনুষ্ঠানে তাকে আশীর্বাদ করলেন, দেবতাদের কাছে তার অনন্ত পরমায়ু কামনা করলেন। রাজপুত্র এবং অভিজাত জমিদার ও রাজপারিষদরা উপঢৌকন দিয়ে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ

করলেন। ভিনদেশের রাজা ও গোত্রপতিরা দূত পাঠিয়ে সম্মান জানালেন মিশরের নতুন রানীকে। এসব আনুষ্ঠানিকতার শেষে ফারাও নিজে তার মাথায় জোড়-মুকুট পরিয়ে দিয়ে তাকে দিলেন নতুন উপাধি– 'গৌরবে রা-য়ের মত, সৌন্দর্যে দেবী হাথোর'।

মুকুট মাথায় সোনার আসনে বসে আছে তুয়া। অভিষেকের আনুষ্ঠানিকতা দেখে চলেছে এক ধরনের অন্যমনস্কতায়। তার চোখদুটো তখন খুঁজছে একটি মাত্র মুখ–দীর্ঘদেহী দুঃসাহসী সেনা-কর্মকর্তা রামেস, তার দুধ-ভাই। অবশেষে খুঁজে পেলো সে মুখটা। মিলন হলো চার চোখের–সদ্য সিংহাসনে অভিষিক্ত রানীর দুচোখের সাথে নিচে রাজপুরুষদের ভিড়ে দাঁড়িয়ে থাকা তরুণ সৈনিকের দুচোখ। মুহূর্তের জন্যে মাত্র। এর মধ্যেই হলো শুভেচ্ছা বিনিময়, মনের কথার আদান-প্রদান, যার মর্ম সারাদিনের সব কথার চাইতেও বেশি অর্থপূর্ণ। নেতের-তুয়ার চোখ দুটো যেন বলতে চাইল, 'শিশু যা স্মরণ করতে পারে রানী তা ভুলে যেতে পারে না। দেবী শেষ পর্যন্ত তো নারীই।'

এত মধুর এই বার্তা যে হতচকিত রামেস সৌরাঘাতপ্রাপ্তের মত বেরিয়ে গেল রাজ দরবার ছেড়ে।

সেদিন রাতে সচিব, লিপিকর, পরিচারিকা সবাইকে বিদায় করে ক্লান্ত নেতের-তুয়া নিজের কামরায় এসে বসেছে। সাধারণ শাদা কাপড় পরনে। সারাদিনের জাঁকজমক, হৈ-চৈ, আনুষ্ঠানিকতার দৃশ্যগুলো একের পর এক মনের পর্দার ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। আজ যে রাজকীয় অবস্থান আর অসীম ক্ষমতা সে লাভ করেছে তা মনে পড়লো। সামনে যে অহঙ্কারপূর্ণ ভবিষ্যতের হাতছানি তা কল্পনা করার চেষ্টা করলো। তবে এই সব ভাবনা-কল্পনা ছাপিয়ে তার মনে স্থির হয়ে রইলো তরুণ সেনাধ্যক্ষ, ছেলেবেলার সাথী, যাকে সে ভালবাসে সেই রামেসের মুখটা। ভাবলো নেতের-তুয়া, যদি তার সকল ক্ষমতা একত্র করেও তাকে নিজের পাশে টেনে আনতে পারত: তা না পারলে লাখ লাখ প্রজা কেন, সারা দুনিয়ার উপর প্রভুত্ব করেই বা কী লাভ? সবাই আজ তাকে দেবী বলে সম্বোধন করছিল। তার নিজেরও কখনও কখনও মনে হয়, পুরোপুরি না হোক অর্ধেক হলেও তার অস্তিত্ব ঐশ্বরিক। কিন্তু তা-ই যদি হবে সাধারণ নারীর মত বুকের ভেতরটা অমন টন টন করে ওঠে কেন?

তার চাইতেও বড় কথা, সে কি সত্যিই মানবীয় দুর্ভাগ্যের উর্ধ্বে?

একটা সিংহাসন, তা যতই চকচকে সোনায় তৈরি হোক, তা কি তাকে মানবীয় দুঃখ-বেদনার ঊর্ধ্বে তুলে দিতে পারে? সত্য জানার অদম্য ইচ্ছা জেগে উঠলো তার ভেতর। ভবিষ্যতের গর্ভে কী লুকিয়ে আছে, কিসের মুখোমুখি হতে হবে তাকে, তা যদি ভয়ানক অশুভ কিছুও হয়, পরোয়া নেই, সে জানতে চায়। এক মুহূর্ত ভাবলো তুয়া। দরজার কাছে গিয়ে পরিচারিকাকে বললো তার পালক-মা, আমেনের পূজারিণী, ভবিষ্যদ্বক্তা আস্‌তিকে ডেকে দিতে। কিছুক্ষণ পরে এলেন আসতি। সম্ভ্রান্ত চেহারা। মুখটা সুন্দর খোদাই করা মূর্তির মত। কালো চুল। পঞ্চাশের ওপর বয়স হলেও সে-চুলে ধূসরের কোন ছাপ পড়েনি।

মাথা নুইয়ে রানীকে সম্মান জানিয়ে আসতি বললেন, 'মন্দিরের নিভৃতকক্ষে ছিলাম, মহামহিম রানী। তাই আসতে দেরি হলো। এজন্য ক্ষমাপ্রার্থী।'

রানী ধরে দাঁড় করিয়ে চুমু খেলো তাকে।

'সারাদিন এই সব বড় বড় পদবি আর খেতাব শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, মা। এখন আর ওসব ডাক শুনতে চাই না। শুধুই তুয়া বলে ডাকো। সেই শিশু বয়স থেকেই তো তুমি আমার মা। তোমার দুধ খেয়ে বেঁচে থেকেছি।'

'কী তোমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে, মা?' আসতি জিজ্ঞেস করলেন। সস্নেহে তুয়ার কালো চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'এই ছোট্ট মাথায় রাজমুকুট বেশি ভারি মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, মা, সোনা আর মণি-রত্নের ওজনে মাথা পিষে যেতে চায়। আমি ক্লান্ত, তবু ঘুমাতে পারছি না। বলো তো, ভোজসভার পর ফারাও পারিষদদের নিয়ে কী বৈঠক করলেন? মার্মিস ঐ মন্ত্রণাসভায় ছিলেন– তুমি নিশ্চয়ই জানো ব্যাপার কী? আজ আমাকে রানী করা হয়েছে, অথচ আমাকেই রাখা হলো না ঐ সভায়!'

'শুনবে তুমি?' একটু হেসে বললেন আসতি। 'অবশ্য রানী হিসেবে তোমার অধিকার আছে জানার। ওঁরা তোমার বিয়ের বিষয়ে আলাপ করছিলেন।'

মুহূর্তের জন্যে লাল একটা ঝলক খেলে গেল তুয়ার গালে। 'আমার বিয়ে! কার সঙ্গে?'

'অনেক নামই আলোচনায় এসেছে, মা। মিশরের রানীর তো পাণিপ্রার্থীর অভাব হওয়ার কথা নয়।'

'বলো তারা কারা।'

বললেন আসতি–মোট সাতজন। তাদের মধ্যে আছে কেশ

রাজ্যের যুবরাজ, বিদেশী কয়েকজন রাজার ছেলে, কয়েকজন বড় মাপের অভিজাত জমিদার এবং সেনাবাহিনীর এক সেনাপতি, যে নিজেকে সাবেক এক ফারাওয়ের বংশধর বলে দাবি করে। আসতি একেকটা নাম উচ্চারণ করেন আর তুয়া হাত নেড়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উড়িয়ে দেয়। একজনের ক্ষেত্রে বললো, 'ওকে তো চিনিই না,' আরেকজন প্রসঙ্গে বললো, 'বেশি বয়স,' আরেকজনকে, 'মোটা আর ভয়ঙ্করদর্শন,' আরেকজনকে, 'বিদেশী কুকুর, আমাদের দেব-দেবীদের থুতু দেয়' ইত্যাদি ইত্যাদি।

শেষে আসতি বললেন, 'ব্যস, এই ক'টা নামই বিবেচনা করতে বলা হয়েছে রাজপরিষদকে।'

'আর কোন নাম ছিল না?'

'মানে, তুয়া, তোমার মনে হচ্ছে কোন নাম বাদ পড়ে গেছে?'

জবাব দিল না তুয়া, তবে তার ঠোঁট দুটো একটা শব্দ উচ্চারণের ভঙ্গিতে নড়লো, কোন আওয়াজ হলো না। একে অন্যের চোখের দিকে চোখ দুই নারীর। মাথা নাড়লেন আসতি।

'সে যে সম্ভব নয়, মা,' ফিস ফিস করে বললেন তিনি। 'অনেক কারণ আছে তার। সবচেয়ে বড় কারণ, তোমাকে তো বলেইছি, অনেক বছর আগে আমাদের বংশের কারো সিংহাসনে বসার ওপর চির-নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। সেই আজ্ঞা লংঘনের সাহস কারো নেই, এমনকি ফারাওয়েরও না। তুমি আমার ছেলের জন্য মৃত্যু ডেকে আনবে, তুয়া। আজ রাজদরবারে যে চাহনি তুমি দিয়েছিলে, আবার যদি ওর দিকে সেই দৃষ্টিতে তাকাও ওর মৃত্যু অবধারিত।'

'না,' ধীরকণ্ঠে বললো তুয়া, 'আমি ওর জন্যে মৃত্যু নয় ডেকে আনবো প্রাণ এবং সম্মান আর–আর ভালবাসা। ভুলে যেও না, একদিন আমি ফারাও হবো। সে-সময় তুমি যদি ওকে নিয়ে আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো, তুমি আমার যত প্রিয়ই হও না কেন, আসতি, আমি তোমার জন্য মৃত্যু নিয়ে আসবো।'

'আমি বিশ্বসঘাতকতা করবো না,' মৃদু হেসে বললেন আসতি। 'ওগো সুন্দরী, আমার মনে হয় তার দরকারই হবে না। এখন বলো, আজ হঠাৎ করে তোমার চোখ কোন এক সেনা কর্মকর্তার উপর পড়তে সে হতবিহ্বলের মত দরবারকক্ষ ছেড়ে পালালো কেন?'

'বোধ হয় গরমে,' লাল হয়ে বললো তুয়া।

'হ্যাঁ, ওখানে গরম ছিল বটে, কিন্তু ঐটুকু গরম সহ্য করার ক্ষমতা ঐ সেনা-কর্মকর্তার আছে। ওর মত শক্ত মানুষ খুব বেশি নেই এই

মিশরে। তার পরেও– '

'হতে পারে আমার জাঁকজমক দেখে ও ভড়কে গেছিল,' বাধা দিয়ে বললো তুয়া। 'তুমি তো জান, মা, কেমন রাজকীয় দেখাচ্ছিল আমাকে।'

'হ্যাঁ, তা হতে পারে, বা অন্য কোন আবেগও ভর করে থাকতে পারে। কিন্তু, মা, ঐ চিন্তা তুমি দূরে রাখ, যেমন রেখেছি আমি। যখন ফারাও হবে তখন জানবে সম্রাট তার প্রজাসাধারণ আর আইনের দাস। যতই তুমি প্রেমের সঙ্গে ওর নাম জপ করো না কেন, ওসিরিসের পায়ে ঠাঁই নেওয়ার আগে এর চেয়ে বেশি ওর দেখা তুমি পাবে না।'

দু-হাতে চোখ ঢাকলো তুয়া। একটু পরে সোজাসুজি তাকালো আসতির দিকে। ওর মুখে তখন অন্য এক অভিব্যক্তি চোখে অন্য দৃষ্টি। 'যখন আমি ফারাও হবো, কিছু কিছু ব্যাপারে আমিই হবো আমার আইন। প্রজাদের যদি তা পছন্দ না হয় তাদের অন্য ফারাও খুঁজে নিতে হবে।'

অপলক চোখে আসতি শুনলেন তুয়ার কথা। খুশির এক ঝিলিক খেলে গেল তাঁর চোখের কোনায়। 'সত্যিই তোমার অন্তর বিশাল,' বললেন তিনি। 'কিন্তু, ওহ! তুমি যদি আমাকে–এবং আরেকজনকে ভালবাস, এই চিন্তা হৃদয়ের গভীরে কবর দিয়ে রাখো। তা না হলে তোমার ফারাও হওয়া পর্যন্ত ও বেঁচে থাকবে কিনা সন্দেহ। শুনে রাখো, রানী, দিনের প্রতিটা ঘণ্টা আমি ওকে নিয়ে আতঙ্কে থাকি। মনে হয় কখন বিষ মেশানো একপাত্র পানীয় তুলে দেয়া হয় ওর মুখে, অথবা রাতের বেলায় ভুল করে ছোঁড়া একটা বর্শা বা তীর এসে বেঁধে বুকে বা গলায়।'

দু'হাত মুঠো পাকিয়ে উঠলো তুয়ার। 'সেক্ষেত্রে এমন প্রতিশোধ নেয়া হবে, মেনার শাসনামলের পর মিশর যা আর কখনও দেখেনি।'

'মা আমার, বুক যখন খালি, সমাধি-মন্দিরের দুয়ার বন্ধ; তখন প্রতিশোধে কী ফল হবে?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করলো তুয়া। 'ওসিরিস ছাড়াও দেব-দেবী আছেন। মা, বলো তো, মানুষ এখন আমাকে কী বলে ডাকে? না, আমার রাজকীয় সব উপাধির কথা বলছি না।'

'ডাকে আমেনের ভোরের তারা বলে, আমেনের কন্যা বলে।'

'জাদুকরী আসতি, বলো, ঐ কাহিনী কি সত্যি?'

'হ্যাঁ। অন্তত তোমার মা ওরকম একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্নের কথা আমি তাঁর কাছেই শুনেছি। আমেনের পূজারিণী হিসেবে

মন্দিরের কাগজপত্রেও ঐ স্বপ্নের বিবরণ পড়েছি।'

'তাহলে সব দেবতার বড় এই দেবতা আমাকে ভালবাসেন তাই না? আর তা-ই যদি হয় তিনি আমার প্রার্থনা শুনবেন, আমাকে শক্তি ও ক্ষমতা দেবেন, আমার যারা প্রিয় তাদের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন, তাই না? মা, সবাই বলে তুমি গোপন বিষয়ের কর্ত্রী, তুমি দেবতাদের কান উন্মুক্ত করতে পারো, তাদের মুখ দিয়ে কথা বলাতে পারো। মা, আমি তোমার রানী হিসেবে তোমাকে আদেশ করছি, আমার পিতা আমেনকে ডেকে আনো। আমি তাঁর সাথে কথা বলতে চাই।'

'ভয় পাবে না?' আসতি জিজ্ঞেস করলেন। 'সব দেবতার চেয়ে বড় তিনি। তুচ্ছ কারণে তাকে ডাকা মহাপাপ।'

'মেয়ের কি বাবাকে ভয় পাওয়া উচিৎ?' জবাব দিলো তুয়া।

'তোমার মা, স্বর্গীয় রানী এবং ফারাও যখন তাঁর বেদীতে হাঁটু গেড়ে বসে সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, সেদিন কিন্তু আমেন তাঁদের সামনে আসেননি, পরে দেখা দিয়েছিলেন স্বপ্নে। তুমি কি তাঁদের চাইতেও বেশি সাহস দেখাতে চাও? তার চেয়ে, ও ভোরের তারা, ঘুমিয়ে যাও; স্বপ্নে তিনি দেখা দিতে পারেন।'

'না, কোন স্বপ্নে আমি আস্থা রাখতে চাই না,' দৃঢ়কণ্ঠে বললো তুয়া। 'স্বপ্ন বদলে যায়। গ্রীষ্মের মেঘের মত তা মিলিয়েও যায়। দৈহিক বা আত্মিক–যেভাবেই হোক, এই দেবতা যদি আমার পিতা হন, তাঁকে আসতে হবে আমার মুখোমুখি। আমি নিজের জন্য আরও জ্ঞান ও প্রজ্ঞা চাইব, আর আরেকজনের জন্য চাইব সুবিধা। তোমার যদি ক্ষমতা থাকে ডাকো তাঁকে, আসতি। রেগে গিয়ে যদি আমাকে হত্যাও করেন, তাঁকে ডাকো। আমি মরতে রাজি, তবু–'

'চুপ!' তুয়ার মুখে আঙুল চাপা দিয়ে বললেন আসতি। 'মৃত্যুর কথা মুখেও এনো না। ঠিক আছে, আমার যে জ্ঞান আছে তা দিয়ে তোমার জন্যে এবং আরও একজনের জন্যে আমি চেষ্টা করবো। তবে এখানে নয়। হয়তো তিনি শুনবেন, হয়তো শুনবেন না। অথবা, যদি তিনি আসেন তোমাকে এবং আমাকে তার মূল্য দিতে হবে। তেমার আলখাল্লা পরে নাও। ওপরে পরো এই ঘোমটা। তারপর এসো আমার সাথে।'

সরু অলিপথ দিয়ে তাঁরা নিঃশব্দে এগিয়ে গেলেন। বহু ধাপ গোপন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলেন। অবশেষে পাথরের দীর্ঘ এক ঢালের পাদদেশে বন্ধ এক দরজার সামনে পৌঁছুলেন। আসতি তালা

খুলে দরজার কপাট মেলে ধরলেন।

'এ কোন জায়গা?' ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলো তুয়া।

'আমেনের প্রধান পূজারিণীর সমাধিগুহা। বলা হয় দেবতা নিজে এই জায়গার ওপর নজর রাখেন। গত ত্রিশ বছরে কেউ এ-গুহায় ঢোকেনি। দেখ, পায়ের ছাপ, যারা শেষ মৃত পূজারিণীকে শেষশয্যায় শোয়ানোর জন্য বয়ে এনেছিল তাদের।'

হাতের লণ্ঠন উঁচু করে ধরলেন আসতি। তার আলোয় তুয়া দেখলো, বিরাট গুহাটার দেয়ালে বিভিন্ন দেব-দেবীর ছবি আঁকা। দেয়াল ঘেঁষে সারি দিয়ে সাজানো অনেকগুলো কফিন। প্রতিটি কফিনের ওপর খোদাই করা সোনালী রঙের একটি মুখ। পেছনে কফিনের ভেতর যাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে তার পাথরে তৈরি মূর্তি। সমাহিত করার সময় দেয়া বিভিন্ন অর্ঘ্য সাজানো তার সামনে। গুহার একেবারে শেষ প্রান্তে কালো পাথরে তৈরি একটি বেদী।

আসতি তুয়াকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন বেদীমূলে। ওকে হাঁটু গেড়ে বসতে বলে লণ্ঠনটা গুহার এক কোনায় লুকিয়ে রেখে এলেন। কালো বেদীটাকে ঘিরে এখন গভীর অন্ধকার। একটু পরেই তুয়া টের পেলো পা টিপে টিপে তার দিকে আসছেন আসতি। নিঃশব্দে হাঁটছেন, তবু তাঁর পায়ের নিচে ধুলো যেন চিৎকার করে উঠছে, আর সেই শব্দ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বদ্ধ গুহার দেয়ালে। তাঁর দেহ থেকে বেরিয়ে আসছে অদ্ভুত এক আভা–মৃতদের এই স্থানে তাঁর প্রাণের আভা। বেদীর সামনে নতজানু হয়ে বসলেন আসতি। তাঁর নড়াচড়ার প্রতিধ্বনি মিলিয়ে গেল। সেই মুহূর্তে তুয়ার মনে হলো, কফিনগুলোর ভেতর যারা সমাহিত, প্রতিটা কফিন থেকে তাদের কা জেগে উঠে ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের দেখতে পায়নি তুয়া, কিছু শুনতেও পায়নি, তবু বুঝতে অসুবিধা হলো না, তারা আছে আশেপাশে। তাদের সংখ্যাও গুণতে পারলো সে–সব মিলিয়ে বত্রিশ। তার মনের ভেতর প্রত্যেকের চেহারা ভেসে উঠতে লাগলো। সবারই অবয়ব শ্বেত-শুভ্র। চেহারায় গাম্ভীর্য আর কিছু একটা দেখতে বা শুনতে পাবার প্রত্যাশা।

নিচুস্বরে অজানা ভাষায় কিছু বলতে শুরু করলেন আসতি। বলার ভঙ্গিতে সনির্বন্ধ আকুতি। সে ভাষার এক বর্ণও বুঝতে পারলো না তুয়া, তবে নৈঃশব্দ্য আর ঐ জায়গার কারণে শব্দগুলো অপার্থিব এক ভয়ঙ্কর দ্যোতনা নিয়ে ধ্বনিত হতে লাগলো তার মনে। এই প্রথম ভয়ের একটা স্রোত তুয়ার শরীর বেয়ে নামতে শুরু করলো। ঝুঁকে প্রায় মাটির সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে সে আমেনের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে

লাগলো যেন তিনি অনুগ্রহ করে তার কথা শোনেন এবং তার হৃদয়ের আকুতি তৃপ্ত করেন। আসতিও তাঁর সেই দুর্বোধ্য ভাষায় আবেদন জানিয়ে চলেছেন। প্রার্থনা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লো তুয়া। একসময় মনে হলো অচেতন হয়ে যাবে। কিন্তু কোন জবাব এলো না। আবির্ভূত হলো না কোন জ্যোতির্ময় অবয়ব। কোন দৈববাণীও শোনা গেল না। অবশেষে আসতি তুয়ার কানে কানে বললেন,

'চলো, চলে যাই! দেবতা কান বন্ধ করে ফেলেছেন। আর আত্মারা সব তাকিয়ে আছে–রেগে যাচ্ছে ওদের ঘুম ভাঙিয়েছি বলে!'

তুয়া উঠে আসতির গায়ের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়ালো। কেন যেন ভয় তার বেড়ে উঠছে। হঠাৎ করেই তার পা শক্তি হারালো। হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো সে। গুহার অপর প্রান্তে দরজার কাছে অন্ধকার দু'ভাগ করে ফুটে উঠছে এক আভা। ধীরে ধীরে একটি অবয়বের রূপ নিলো সেই আভা–মিশরের রাজকীয় পোশাক পরা এক নারীর অবয়ব। হাতে রাজদণ্ড। আলোর মূর্তিটা এগিয়ে আসতে লাগলো তাদের দিকে। একটু পরেই তার মুখ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তুয়া চেনে না মুখটা, তবু তার মনে হলো তারই মতো দেখতে ঐ মুখ। আসতি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চিনলেন। এবং তুয়ারই মতো হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন মাটিতে।

ওদের সামনে এসে অপূর্ব মধুর স্বরে কথা বলে উঠলো আলোময় মূর্তি: 'মিশরের রানী, আমেনের কন্যা নেতের-তুয়া, অভিনন্দন! ভয় পাচ্ছ তুমি? তোমার কথা শুনবার জন্য দেবতাদের পিতাকে ডাকবার সাহস দেখিয়েছিলে, আর এখন যে তোমাকে গর্ভে ধরেছিল তার আত্মাকে ভয় পাচ্ছ?'

সারা শরীর শিউরে উঠলো তুয়ার। কোনমতে জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, পাচ্ছি!'

'আর তুমি, জাদুকরী আসতি, তুমিও ভয় পাচ্ছ? একটু আগেই না আমেন-রা-কে বলছিলে, "স্বর্গ থেকে নেমে এসে জবাব দাও"?'

'হ্যাঁ, ও রানী আহুরা,' বিড় বিড় করে বললেন আসতি।

'মূঢ় নারী, বড় পাপ করেছ তুমি। তোমার পাশের ঐ রাজকীয় কন্যাও পাপ করেছে। এক সময় যে নশ্বর মানুষ ছিল তাকে দেখেই তোমরা ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছ। আমেন যদি তোমাদের কথা শুনতেন, তাঁর স্বর্গীয় জ্যোতির সামনে দাঁড়াতে কী করে? তোমাদের দুর্বুদ্ধিমত দেবতা যদি আসতেন, যেখানে বসে তাঁকে ডাকছিলে সেখানেই তোমাদের মৃতদেহ পড়ে থাকতো। কিন্তু তিনি সর্বজ্ঞ এবং অসীম দয়ালু। তাই তিনি নিজে না এসে আমাকে পাঠিয়েছেন দূত হিসেবে, যাতে তোমরা

আগামীকালের সূর্যোদয় দেখবার জন্য বেঁচে থাকো।'

'আমেন ক্ষমা করুন আমাদের,' তুয়া বললো। 'পাপ আমি করেছি, মা। আমিই আদেশ করেছিলাম, আসতি কেবল হুকুম তামিল করেছেন। সব দোষ আমার। আমার নিজের এবং অন্য একজনের ভাগ্য নিয়ে সন্দেহ আর ভয়ের মধ্যে আছি। তাই ভবিষ্যৎ জানতে চেয়েছিলাম।'

'কেন, রানী নেতের-তুয়া, কেন তোমাকে ভবিষ্যৎ জানতে হবে? তোমার পায়ের নিচে নরকও যদি মুখ হাঁ করে থাকে তবু সময় হওয়ার আগে কেন তার সোনার দরজার ভেতর তুমি উঁকি দেবে? নশ্বর মানুষের কাছ থেকে ভবিষ্যৎ লুকিয়ে রাখা হয়, কারণ এর অবগুণ্ঠন উন্মোচন হলে ভয়াবহ আতঙ্কে তারা নিঃশেষ হয়ে যাবে। সারা জীবনের সব দুঃখ-কষ্ট আর মৃত্যুর করাল চেহারা যদি আগেই দেখা হয়ে যায় তাহলে কে বেঁচে থাকতে চাইবে আর কে-ই বা মরার সাহস দেখাবে?'

'তাহলে, মা, আমার সামনেও দুঃখ-কষ্ট আছে?'

'এর অন্যথা হবে কেমন করে? আলো আর আঁধার মিলেই দিন, আনন্দ-বেদনা মিলে জীবন। তুমি মানুষ, এ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকো।'

'যদি সব কাহিনী সত্যি হয় তাহলে আংশিক দেবীও তো!'

'তাহলে চোখের জলে দেবীত্বের মূল্য দিয়ে সন্তুষ্ট থাকো।'

'তুমি কিছুই বললে না আমাকে,' হতাশ কণ্ঠে বললো তুয়া। 'আমার জন্যে আমি জিজ্ঞেস করিনি। আমি সুন্দর, আমি আমেনের কন্যা এবং বংশগৌরবে অনন্য। তবু, আমার মনে শান্তি নেই। যদি জানতে পারতাম আমাকে ভালবাসাহীন জীবন কাটাতে হবে না, যদি জানতে পারতাম আমি যাকে ঘৃণা করি তার হাতে আমাকে তুলে দেয়া হবে না, বরং যাকে আমি ভালবাসি সে-ই আমাকে স্ত্রী বলে ডাকবে, তাহলে এই সব গৌরব আর বিলাস আমি ছুঁড়ে ফেলে দিতাম। তার এবং আমার সামনে বড় বিপদ। আমেন সর্বশক্তিমান। তিনিই মাটির মানুষের জীবনের রূপকার, আমি যদি তাঁর সন্তান হই, আমার ভেতরে যদি তাঁর নিঃশ্বাস থাকে, তাহলে তাঁর সাহায্য আমি চাই।'

'তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সাহায্য করবে। তোমাকে নিয়ে আমেনের যে কথা তা কি লিখে রাখা হয়নি? সে-লেখা পড়ে দেখ, আমাকে আর প্রশ্ন কোরো না। ভালবাসা এমন এক তীর যা কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। এ হচ্ছে ওপর থেকে আসা অনন্ত আগুন, বাতাস বা পানি যাকে নেভাতে পারে না। ভালবেসে যাও। তোমার ভালবাসা

বিফলে যাবে না। মিশরের রানী, মেয়ে আমার, বিদায়।'

'না, না, আর একটা কথা। দেবতার বার্তাবহ, যে ইঙ্গিত তুমি দিয়েছ তার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু, এসব বিপদ কখন নেমে আসবে আমার ওপর? আর বিপদ যখন আসবে, আমি যখন একা হয়ে যাব, সান্ত্বনার জন্য কার কাছে যাব?'

'তোমার ভেতরেই একজন আছে, সে-ই তোমাকে এসব ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পারবে। আমেনের তারা, তোমার জন্মের সময়ই তাকে তোমার ভেতরে দিয়ে দেয়া হয়েছে, আসতি তাকে ডাকতে পারবে। আসতি, আমার কাছে এসো, আমি যাব, তার আগে তোমাকে একটা কথা বলি।'

আড়ষ্ট পায়ে আসতি এগিয়ে গেলেন। আলোকময় মূর্তিটা ঝুঁকে এলো তাঁর দিকে। ফিস ফিস করে কিছু কথা বললো তাঁর কানে কানে। তারপর সোজা হয়ে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে তুয়ার উদ্দেশ্যে একবার হাত নেড়ে মিলিয়ে গেল মূর্তি।

দুই নারী ফিরে এসেছে তুয়ার রাজকীয় কক্ষে। দুজনেরই মুখ ফ্যাকাসে। দুজনেরই দেহ কাঁপছে একটু একটু।

'তোমার ইচ্ছা পূরণ হয়েছে, রানী,' আসতি বললেন। 'আমেন না আসলেও দূতের মারফত বার্তা পাঠিয়েছেন।'

'এই অলৌকিক দর্শনের অর্থ কী,' বললো তুয়া। 'আমি তো কিছুই বুঝিনি। আমাকে তেমন কিছু বলেওনি।'

'কেন, অনেক কথাই তো বলেছে। বলেছে ভালবাসা কখনও প্রতিদান দিতে ভোলে না। এর চেয়ে বেশি আর কী তুমি জানতে চেয়েছিলে?'

দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তুয়ার। 'অর্থ যদি এ-ই হয় তাহলে আমি খুশি।'

'এত খুশি হওয়ারও কিছু নেই, রানী। আমেনকে তার সিংহাসন থেকে ডেকে আনার দুঃসাহস দেখিয়ে আজ আমরা–আমরা দুজনেই খুব বড় পাপ করেছি। পাপও তার মূল্য দিতে ভুল করে না। রক্তই তার একমাত্র মূল্য।'

'কার রক্ত, আসতি? আমাদের?'

'না, আরও খারাপ। প্রিয়জনদের রক্ত। মিশরের সামনে দুর্যোগ, রানী।'

'যখন তা নেমে আসবে তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না, বলো!'

'সম্ভব হলে যাব না। ভাগ্য শেষ পর্যন্ত আমাদের দুজনকে এক সুতোয় বেঁধে রাখবে। আর সেই শেষ এখনও অনেক দূরে। এক সময়–যখন তুমি আমার বুকে শুয়ে থাকতে, তুমি আমার ছিলে, এখন আমি তোমার। কিন্তু, আর কখনও আমেনকে ডাকতে বলবে না আমাকে।'

৫
কেশ যুবরাজের সাথে রামেসের লড়াই

পুরো এক চাঁদ জুড়ে উৎসব চললো থিবিতে। উৎসবের সব প্রধান অনুষ্ঠানে মিশরের নতুন অভিষিক্ত রানী হিসেবে অংশ নিলো 'গৌরবে রা-য়ের মত, সৌন্দর্যে দেবী হাথোর, আমেনের ভোরের তারা' নেতের-তুয়া। ভোজের পর ভোজ চললো। প্রতিটা ভোজসভাতেই রানীর সাথে বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশ নিলো তার একেকজন পাণিপ্রার্থী। প্রতিটা ভোজের পরেই পিতা ফারাও ও তাঁর পারিষদবর্গ তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করেছেন, পাত্র পছন্দ হয়েছে কিনা। বুদ্ধিমতি তুয়া কোন ক্ষেত্রেই সম্মতি দেয়নি, সরাসরি নাকচও করেনি। শুধু বলেছে, তার মায়ের স্বপ্ন-বিবরণী এনে পড়া হোক। এবং পড়ার পর মন্তব্য করেছে, আমেন তো তার জন্য রাজকীয় প্রেমিকের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এই সব গোত্রপতি আর সেনাপতিদের কারও দেহেই রাজরক্ত নেই। সুতরাং এদের কারও কথা আমেন বলেননি। আর দেবতা তার জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তার দিকে সে চোখ মেলে তাকানোরও সাহস দেখাতে পারে না।

যারা নিজেদেরকে রাজা বলে দাবি করলেও রাজকাজে ব্যস্ত থাকায় নিজে আসতে না পেরে দূতের মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে তাদের সম্পর্কে তুয়া বললো, যাদের কখনও দেখেনি তাদের সম্পর্কে সে কথা বলবে না। তারা সশরীরে মিশরের রাজদরবারে এলে বিবেচনা করবে।

শেষ পর্যন্ত বাকি রইলো একজনমাত্র পাণিপ্রার্থী। ফারাও এবং তাঁর পারিষদরা চাইছিলেন তুয়া তাকেই স্বামী হিসেবে গ্রহণ করুক। তার নাম আমাথেল, কেশ-এর যুবরাজ। তার বৃদ্ধ পিতা মিশরের অনেক দক্ষিণে নাপাতা নগরীতে বসে রাজ্য শাসন করেন। নীলনদ বিভক্ত হয়ে দুদিক থেকে বেষ্টন করে আছে বলে কেশ রাজ্যটিকে অনেকে দ্বীপও বলে থাকেন। বলা হয় মিশরের পরে এই কেশই বিশ্বের

সবচেয়ে সম্পদশালী রাজ্য। সেখানে সোনা এত সহজলভ্য যে বলা হয় সেখানে তামা বা লোহার চাইতেও সোনার দাম কম। সেখানকার খনিতে আরও পাওয়া যায় মূল্যবান সব রত্ন। মাটিতে ফলে প্রচুর শস্য। দূর অতীতে নাপাতার এক রাজা মিশরের সিংহাসন দখল করে নতুন এক ফারাও বংশের পত্তন করেছিল। তারা বিদেশী এবং মিশরে ন্যূবিয়ান রীতি-নীতি চালু করেছিল বলে মিশরীয়রা পুরোহিতদের নেতৃত্বে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে তাদের বিতাড়িত করে। সে-সময়ই অলিখিত কানুন করে ঐ বংশের কেউ আর কখনও জোড়-মুকুট পরতে পারবে না বলে ঘোষণা দেয়া হয়। তুয়ার ছেলেবেলার খেলার সাথী রামেস সেই বংশের শেষ বৈধ উত্তরাধিকারী।

তাদের বিতাড়িত করতে পারলেও মিশর এখনও দুঃখ করে অমিত সম্পদশালী নাপাতার জন্য। সেই ফারাওয়ের পতনের সুযোগে কেশ প্রদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে নতুন এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে। যুবরাজ আমাথেল সেই বংশের উত্তরাধিকারী। ফারাও এবং তাঁর পারিষদবর্গ আশা করছেন আমাথেলের সঙ্গে রানী নেতের-তুয়ার বিয়ে হলে হারানো কেশ রাজ্য মিশরের কাছে ফিরে আসবে। ফারাওয়ের কোন ছেলে সন্তান নেই যার সঙ্গে দেশের রীতি অনুযায়ী তুয়ার বিয়ে হতে পারে। তাই তুয়ার জন্মের পর থেকেই মিশরের বড় জমিদারবর্গ ও রাজপারিষদগণ এবং ফারাও পর্যন্ত এই পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছিলেন। এজন্যে গোপনে কেশ রাজার সঙ্গে একটা চুক্তিও করা হয়। সেই চুক্তিতে স্থায়ীভাবে থিবিতে থাকার শর্তে রানীর সাথে আমাথেলের বিয়ের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ীই যুবরাজ আমাথেল রানীর অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছে। বাকি পাণিপ্রার্থীরা জনগণকে একটু মজা দেয়ার জন্য সাজানো খেলার অংশ।

ফারাও নেতের-তুয়াকে আমাথেলের হাতে তুলে দিতে চাইবেন এটা নিয়তি নির্ধারিত। তুয়া জানতো এটা, আর সেজন্যেই সে উদ্বিগ্ন হয়েছিল বেশি। এই লোকটি সম্পর্কে ভয় আর রামেসের জন্য ভালবাসার ব্যাপার না থাকলে সে আমেনকে ডাকার দুঃসাহস দেখিয়ে ধর্মদ্রোহিতা করতো না। ফারাও এখনও আমাথেলের ব্যাপারে তার সাথে কোন কথা বলেননি, আমাথেলকে সে দেখেওনি। তুয়া শুনেছে ওর অভিষেক অনুষ্ঠানে আমাথেল উপস্থিত ছিল ছদ্মবেশে। এই অহঙ্কারী রাজপুত্র মনে মনে ঠিক করেছিল, যত বড় রানীই হোক তাকে নিজ চোখে না দেখে বধূ হিসেবে গ্রহণ করবে না। কিন্তু অভিষেকের দিন তুয়াকে দেখার পর অহঙ্কারের কথা আর তার মনে রইল না।

উপরে উপরে কনে দেখে সন্তুষ্ট বলে জানালেও ভেতরে ভেতরে তক্ষুনি তুয়াকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার জন্য সে পাগল হয়ে উঠলো।

যে রাতে আমাথেলের সঙ্গে তার কনের দেখা হওয়ার কথা সে-রাতের ভোজসভার আকার এবং আয়োজন আগেরগুলোর চেয়ে অনেক বেশি জাঁকজমকপূর্ণ। বিশাল একটা ছাদহীন মিলনায়তনে অসংখ্য টেবিল পাতা। দুই পাশে সারি দিয়ে আটকে রাখা শত শত মশালের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে আছে জায়গাটা। সেখানে পৌঁছে কিছুই জানে না এমন ভান করে তুয়া ফারাওকে জিজ্ঞেস করলো, 'কে এই ভোজসভার অতিথি? আয়োজন দেখে তো মনে হচ্ছে দেবতা!'

'মা, এই আয়োজন কেশ-এর যুবরাজের জন্য,' একটু সন্ত্রস্ত মনে হলো ফারাওয়ের কণ্ঠস্বর। 'ওর নিজের দেশে ঈশ্বর-প্রেরিত হিসেবে পূজা করা হয় ওকে, যেমন এখানে করা হয় আমাদের। রাজা হওয়ার পর ও হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় রাজাদের একজন।'

'কেশ!' কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ফুটিয়ে তুলে বললো তুয়া। 'ঐ ভূখণ্ডের ওপর আমরা এখনও সার্বভৌমত্ব দাবি করিনি?'

'এক সময় ওটা আমাদেরই ছিল, মা,' ফারাও বললেন। 'ঘুরিয়ে বললে, কেশ-এর রাজারাই মিশরের রাজা ছিলেন। সেই রাজবংশের পতন ঘটিয়েই আমার প্র-প্র-পিতামহকে সিংহাসনে বসার আমন্ত্রণ জানানো হয়। ওদের মাত্র তিনজন এখন বেঁচে আছে–আমেনের রক্ষীদল-প্রধান মার্মিস, আমেনের পূজারিনী ভবিষ্যদ্বক্তা আসতি আর তরুণ রাজপুরুষ রামেস, ছোটবেলায় যে তোমার খেলার সাথী ছিল, এবং তোমার হয়তো মনে আছে, তোমাকে পবিত্র কুমীরের মুখ থেকে বাঁচিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, মনে আছে। কিন্তু মার্মিস কেন তাহলে কেশ-এর রাজা নন?'

'নাপাতার জনগণ তাদের শাসক হিসেবে অন্য এক পরিবারকে বেছে নিয়েছিল। তাদেরই উত্তরাধিকারী আমাথেল।'

'উড়ে এসে জুড়ে বসা উত্তরাধিকারী! বাবা, এর মধ্যে রক্তের অধিকারের কোন ব্যাপার নেই।'

'ও-কথা বোলো না, মা,' বিব্রত কণ্ঠে জবাব দিলেন ফারাও, 'এভাবে দেখলে তো আমাদের জায়গায় মার্মিসের ফারাও হওয়ার কথা।'

তুয়া আর কিছু বললো না। মিলনায়তনের শেষ প্রান্তে মঞ্চের ওপর সোনার আসনে ফারাওয়ের পাশে বসতে বসতে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, 'কেশ-এর এই যুবরাজও কি আমার পাণিপ্রার্থী?'

'তা ছাড়া আর কোন কারণে তার জন্যে এই রাজকীয় আয়োজন? তুমি জানতে না? ও তোমার স্বামী হবে এটা নিয়তি নির্ধারিত। চুপ! ও আসছে!'

উদ্দাম যন্ত্রসঙ্গীতের শব্দ উঠলো বিশাল মিলনায়তনের অন্য প্রান্তে। দারুণ পোশাকে সজ্জিত একদল বাদককে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। তাদের কয়েকজন ফুঁ দিচ্ছে হাতির দাঁতে তৈরি শিঙায়, কয়েকজন বাজাচ্ছে পিতলে তৈরি মন্দিরার মত এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র আর অন্যরা পেটাচ্ছে গিল্টি করা ঢাক। মিলনায়তনের কিছুটা ভেতরে এসে বাদকদল দাঁড়িয়ে গেল। তারপর ভেতরে এলো বিশালদেহী বিশজন ন্যূবিয়ান দেহরক্ষী। পরনে টিউনিক, মাথায় চিতার চামড়ার টুপি, হাতে চওড়া ফলার বর্শা আর জলহস্তীর চামড়ায় তৈরি অদ্ভুত কারুকাজ করা ঢাল।

এরপর ঢুকলো স্বয়ং কেশ-এর যুবরাজ। তার দু'পাশে দুই চামরবাহক। যুবরাজ আমাথেল বেঁটে-খাট চওড়া কাঁধওয়ালা যুবক। দেহের গঠন মোটার ধার ঘেঁষে। মুখটা ভারি। চোখ দুটো বিরাট এবং সর্বক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরছে। উৎসবের রঙচঙে পোশাক পরে আছে সে। গলায় ভারি সেনার হার, বেশ কয়েকটা ঝকমকে রত্ন ঝুলছে তাতে। মাথার কালো চুলের ওপর শোভা পাচ্ছে অস্ট্রিচ পাখির পালক। তার লম্বা আলখাল্লার পেছনটা ধরে আছে ভয়ঙ্করদর্শন দুই বামন।

তখনও অনেকটা দূরে যুবরাজ। তবু দ্রুত একবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়েই তার সম্পর্কে তুয়ার মনে তৈরি হলো ঘৃণা—এমন ঘৃণা আর কখনও কাউকে করেনি সে। একটু পরেই আমাথেলের পেছনে দ্বিতীয় রক্ষীদল এসে দাঁড়ালো। মিশরীয় সৈনিক নিয়ে গড়া এই রক্ষীদলের নেতৃত্বে আছে শাদাসিধা ব্রোঞ্জের বর্ম পরা রামেস; রানী নেতের-তুয়ার ছেলেবেলার খেলার সাথী, তার দুধ-ভাই, তার হৃদয় যাকে ভালবাসে সেই রামেস। হাতে তার কুমীর আকৃতির সোনালী বাঁটওয়ালা তরবারি, ফারাও যেটি তাকে উপহার দিয়েছিলেন। দীর্ঘাঙ্গ সুদর্শন রামেসের অভিজাত অবয়বের পাশে আমাথেলের বেঁটে-মোটা-কর্কশ চেহারাটা তুলনা করে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো তুয়া। ফারাও এটা খেয়াল করে অন্য সবার মতই ভাবলেন, হবু বরকে প্রথমবারের মত দেখে লাল হয়েছে তুয়া।

তুয়া ভেবে পেলো না যুবরাজ আমাথেলের রক্ষী হিসেবে রামেসকে কেন বেছে নেয়া হয়েছে! সঙ্গে সঙ্গে জবাবটাও উঁকি দিয়ে গেল মনে।

নিঃসন্দেহে এটা করা হয়েছে আমাথেলের অহঙ্কার তৃপ্ত করার জন্য, এবং এটা ফারাও করেননি, মোটা উৎকোচের বিনিময়ে করেছে কোনো পারিষদ অথবা অন্দরমহলের কর্মকর্তা। রামেসের বংশ আমাথেলের চেয়ে প্রাচীন, এবং রক্তের অধিকারে তারই কেশ-এর এবং মিশরেরও রাজা থাকার কথা। অপমান করার জন্যেই তাকে আমাথেলের দেহরক্ষীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

তাছাড়া রানী রামেসের সঙ্গে একসাথে বড় হয়েছে, এক মায়ের দুধ খেয়েছে; তার উপর রমেস সুদর্শন, এসব কারণে রানী যে রামেসকে পছন্দ করে তা অনেকেরই জানা। তার মনের এই পছন্দের ভাবটাকে অপমান করাও এর উদ্দেশ্য হতে পারে। মুহূর্তের মধ্যে এসব বুঝে নিলো তুয়া, এবং পিতা আমেনের নামে শপথ করলো, যারা এই চরম অপমানজনক কাজ করেছে আজ হোক কাল হোক তাদেরকে এর মূল্য দিতে হবে।

যুবরাজ আমাথেল মঞ্চে উঠে ফারাও ও রানীকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানালো। তুয়া আর ফারাও-ও উঠে দাঁড়িয়ে সম্মানসূচক মাথা নোয়ালেন। যুবরাজকে মিশরে স্বাগত জানিয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন ফারাও। ভাষণে তিনি যুবরাজের সব খেতাব পদবীর উল্লেখ করে সুন্দর সুন্দর কথার মালা গেঁথে দুই রাজ্যের ঐতিহ্যগত বন্ধনের কথা স্মরণ করে আগামী দিনগুলোতে সেই বন্ধন আরও দৃঢ় হবে বলে আশা প্রকাশ করলেন।

ফারাও তাঁর ভাষণ শেষ করে তুয়ার দিকে তাকালেন। রানী হিসেবে তারও ভাষণ দেয়ার কথা। ভাষণে সে কী বলবে তা তাকে লিখেও দেয়া হয়েছে। পাকানো প্যাপিরাসটা পড়ে আছে তার পাশে। কিন্তু সেদিকে ফিরেও তাকালো না তুয়া। বরং ঘাড় ঘুরিয়ে তার এক পরিচারিকাকে বললো একটা পাখা নিয়ে আসতে।

সময় বয়ে যাচ্ছে। পাখা এলো, কিন্তু তুয়া ভাষণ দিতে দাঁড়ালো না। পুরো মিলনায়তনে অস্বস্তি। অগত্যা আমাথেল তার ফিরতি ভাষণ দেয়ার জন্য দাঁড়ালো। মুখস্থ করা ভাষণ গড় গড় করে আউড়ে গেল সে। এমনকি যে রানী ভাষণই দেয়নি সেই 'ঈশ্বর-প্রেরিত রানীর মুখনিঃসৃত সুন্দর কথাগুলো তার হৃদয়কে মরুভূমিতে বৃষ্টির পর ফুটে ওঠা ফুলের মত কেমন কোমল করে তুলেছে' তা-ও সে বলে গেল অবলীলায়। হাসি চাপার জন্য হাতের পাখাটা মুখের কাছে তুলে রেখেছে তুয়া। তার ওপর দিয়ে সে দেখলো রামেসের মুখে এক ঝলক হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। তবে উপস্থিত বিশিষ্ট অভ্যাগতদের

অনেকেই হাসি চাপতে পারলেন না। অনেকে শব্দ করেই হেসে ফেললেন, অনেকে হাসি লুকানোর জন্য মাথা নিচু করে মুখ ঢাকলেন।

কী হয়েছে কিছু বুঝতে না পারলেও এই সব হাসাহাসিতে ভয়ানক রেগে গেল আমাথেল। ফারাও ও রানীর জন্য আনা উপহার সামগ্রী নিয়ে আসার জন্য হুঙ্কার ছাড়লো সে। কারুকাজ করা সোনার পানপাত্র, সোনায় তৈরি হাতি এবং অন্যান্য জীব-জন্তুর মূর্তি, নানা সুগন্ধী দ্রব্য ভর্তি সোনার পাত্র নিয়ে এলো দাসরা। আমাথেল সেগুলো কেশ-এর রাজা এবং তার পক্ষ থেকে ফারাওকে নিবেদন করতে গিয়ে বললো, তার দেশে এসব অতি সাধারণ জিনিস, ওজন যদি বেশি না হতো তাহলে সে এসব আরও নিয়ে আসতো।

ফারাও উপহারের জন্য যুবরাজকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিনীতকণ্ঠে বললেন, মিশরও যে দরিদ্র নয় তা যুবরাজ শিগগিরই বুঝতে পারবে। এরপর যুবরাজ তার নিজের পক্ষ থেকে আনা কিছু উপহার দিলো রানীকে। সে-সবের মধ্যে আছে নীলা, পান্নার মত অমূল্য রত্নখচিত বক্ষাবরণী ও গলার হার। তুয়া যে দেশের সবচেয়ে সুকণ্ঠী গায়িকা এবং বিভিন্ন রকম বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পটু, একথা জানা ছিল আমাথেলের। তাই সে উপহার হিসেবে এনেছে হাতির দাঁতের ওপর সোনার কারুকাজ করা অসাধারণ একটি বীণা। তার তারগুলোও সোনার।

তুয়াকে যেকোন একটা হার পরে দেখতে বললেন ফারাও। পাথরগুলো ওর পোশাকের শাদা রং আর হাতের নীলপদ্মের সঙ্গে মানাবে না, এই অজুহাত দেখিয়ে পরলো না তুয়া। তবে সে ধন্যবাদ জানালো আমাথেলকে–ভদ্রতাপূর্ণ শীতল ধন্যবাদ। এরপর উপহারগুলোর দিকে না তাকিয়েই সেগুলো দূরে নিয়ে রাখতে বললো। তার প্রধান পরিচারিকা আসতি তার পিছনেই দাঁড়ানো। তুয়া তাকে বললো, ঐসব জিনিসের ওপর যে সুগন্ধি ঢালা হয়েছে তার গন্ধে তার বমি পাচ্ছে। অবশ্য এক মুহূর্ত ভেবে হাতির দাঁতের বীণাটা কেবল কাছে রাখতে বললো।

এমনি এক তাল-কাটা অবস্থায় শুরু হলো ভোজ। প্রচুর পরিমাণে সাইপ্রাসের মিষ্টি মদ খেলো আমাথেল। দেহরক্ষী হিসেবে তার পেছনেই দাঁড়িয়ে রামেস। বার বার তাকে পানপাত্র ভরে দিতে বলছে আমাথেল। রামেস সবচেয়ে কাছে আছে বলেই নাকি তাকে খানসামার পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য ইচ্ছা করে আমাথেল তাকে দিয়ে পানপাত্র ভরাচ্ছে তা বলতে পারবে না তুয়া। তবে উপায়ান্তর না দেখে নির্দেশ

পালন করে চলেছে রামেস।

খাওয়া-দাওয়া শেষে পরিচারিকারা এঁটো বাসন পেয়ালা আর উচ্ছিষ্ট সব নিয়ে যাওয়ার পর অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্যে এলো ভেল্কিবাজ যাদুকররা। তাক লাগিয়ে দেয়ার মত বিভিন্ন কৌশল তারা দেখাতে লাগলো। এসবের একটি হলো ফুলদানির ভেতর থেকে রাজকীয় পোশাকে সজ্জিত কপালে তারা শোভিত রানী নেতের তুয়ার মত দেখতে একটি মূর্তির বেরিয়ে আসা।

স্বাভাবিকভাবেই এর পরের ভেল্কি অন্য একটি ফুলদানি থেকে আমাথেলের মূর্তি বেরিয়ে আসা। কিন্তু আসতি ঐসব ভেল্কিবাজদের চেয়ে অনেক বেশি যাদুর কৌশল জানেন। তুয়ার পিছনে দাঁড়িয়ে তিনি তার যাদুর জাল ছড়ালেন। তারপর যা ঘটলো তা বলার নয়। যাদুকর তখন সবাইকে শুনিয়ে যুবরাজকে নাম ধরে ডাকছে। কিন্তু অভ্যাগতরা সবিস্ময়ে দেখলো, ফুলদানির ভেতর থেকে আমাথেলের বদলে উঠে এসেছে একটা মুকুট ও পালক পরা বাঁদর, যার চেহারা অনেকটাই আমাথেলের মত। কয়েক মুহূর্ত সেটা দাঁড়িয়ে রইলো ফুলদানির ওপর, তারপর ভোজবাজির মত মিলিয়ে গেল হাওয়ায়।

দর্শকদের অনেকেই হেসে উঠলো এই দৃশ্য দেখে। বাকিরা চুপ। আর ফারাও এটা কোন ষড়যন্ত্রের অংশ নাকি দেবতাদের কোন অশুভ সঙ্কেত, বুঝতে না পেরে ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন অতিথিদের দিকে। ভাগ্যক্রমে যুবরাজ আমাথেল এসবের কিছুই খেয়াল করলো না। সে তখন মদের ঘোরে ব্যাকুল নয়নে তুয়ার রূপদর্শনে মগ্ন। ফারাওয়ের ভ্রূকুটি দেখেই ভেল্কিবাজ যাদুকররা মিলনায়তন ছেড়ে পালিয়েছে। প্রত্যেকেরই চিন্তা প্রাণ থাকে কিনা। ভাবছে কোন অসম ক্ষমতাশালী শক্তি ফুলদানির ভেতর ঢুকে তাদের সাজানো খেলা পণ্ড করে দিলো।

যাদুকরকরা চলে যেতেই গায়ক-গায়িকা ও নর্তকীরা তাদের জায়গা নিলো। শুরু হলো নাচ-গান। আমাথেল তখনও হাঁ করে তাকিয়ে আছে তুয়ার মুখের দিকে। অবশেষে বিরক্ত তুয়া হাত নেড়ে নাচ-গান বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে বললো, সে সেই দুই নূবিয়ান ক্রীতদাসীর গান শুনতে চায়, যাদের গানের প্রশংসা অনেক শুনেছে। নিয়ে আসা হলো দুই দাসীকে। দুজনেরই হাতে বীণা। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে ফারাও ও রানীকে সম্মান জানিয়ে তারা বীণার সঙ্গে শুরু করলো গান। তাদের মিষ্টি কণ্ঠস্বরে ভরে গেল মিলনায়তন। নূবিয়ান ভাষার গানের কথা বেশিরভাগ অতিথি না বুঝলেও তাদের মন ভরে গেল উদাস করা সুরে। গান শেষ হওয়ার পর নেতের-তুয়া বললো,

'তোমাদের গান আমাকে মুগ্ধ করেছে। বিনিময়ে আমি তোমাদের রাজকীয় উপহার দেবো। তোমাদের আমি মুক্তি দিচ্ছি। এখন থেকে আর ক্রীতদাসী নও তোমরা। আরও বলছি, তোমরা যদি এদেশে থেকে যেতে রাজি হও তাহলে তোমাদের রাজদরবারের সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে নিয়োগ করা হবে।'

দুই দাসী ষাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে রানীকে কৃতজ্ঞতা জানালো। কিন্তু যুবরাজ আমাথেল রেগে উঠে বললো, 'এই অমূল্য সম্পদ, বিশ্বের সেরা সঙ্গীত শিল্পীদের এভাবে হাতছাড়া করা মোটেই উচিত হলো না।'

'মানে, যুবরাজ, আপনি বলতে চাইছেন এই সুকণ্ঠী নারীরা বিশ্বের সেরা গায়িকা?' এই প্রথম আমাথেলের সঙ্গে কথা বললো তুয়া। 'আপনার এই কথায় আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে গান-বাজনায় আমার নিজের যে সামান্য দক্ষতা আছে তা একটু পরখ করে নেই। দেখি বিশ্বের সেরা গায়িকাদের চাইতে কতটুকু খারাপ গাই আমি।'

হাতির দাঁতের বীণাটা তুলে নিয়ে তারে টোকা দিলো তুয়া। সামান্য টুং-টাং করে সুর ও পর্দা ঠিক করে নিয়ে সুন্দর দুই চোখ তুলে আমাথেলের দিকে তাকালো সে।

'না, না, মা,' বলে উঠলেন ফারাও, 'মিশরের রানী এই অভিজাত অতিথিদের মধ্যে গান করবে এটা হয় না।'

'কেন নয়, বাবা? এখানে আমরা কেশ-এর মহামান্য রাজার উত্তরাধিকারীকে সম্মান জানানোর জন্য একত্রিত হয়েছি। ফারাও তাকে স্বাগত জানিয়েছেন। ফারাওয়ের কন্যা তার উপহার গ্রহণ করেছেন। দেশের প্রধান ব্যক্তিরা তাকে ঘিরে বসে আছেন।' থামলো তুয়া। তারপর আবার বলতে লাগলো, 'তার নিজের বংশের চাইতেও প্রাচীন এক রাজবংশ, যে রাজবংশ তার পিতা যে সিংহাসনে বসে আছেন সেই সিংহাসনের প্রতিষ্ঠাতা, সেই বংশের সন্তান তার খাদেমদার হিসেবে কাজ করছে,' মদের পাত্র হাতে দাঁড়িয়ে থাকা রামেসের দিকে ইঙ্গিত করলো তুয়া। 'তাহলে কেন মিশরের রানী নিজে গান গেয়ে এই রাজকীয় অতিথির মনোরঞ্জন করবে না?'

মৃত্যুর মত নিস্তব্ধতা মিলনায়তনে। কারোই বুঝতে অসুবিধা হয়নি নেতের-তুয়া, আমেনের ভোরের তারা কী বোঝাতে চেয়েছে। ধীরে ধীরে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সে। হাতির দাঁতের বীণাটা বাজাতে শুরু করলো বুকে চেপে ধরে। মুখটা ঝুঁকে পড়েছে বীণার ওপর।

তার স্পর্শের এমন জাদু, মুহূর্তে সবকিছু চাপা পড়ে গেল, রইলো শুধু বীণার মধুর শব্দ। এমনকি ফারাও-ও তাঁর আসনে হেলান দিয়ে

বসলেন ভাল করে শোনার জন্য। প্রথমে মৃদু টোকা। ধীরে ধীরে উঁচু গ্রামে উঠলো বীণার আওয়াজ। অবশেষে যোগ হলো তুয়ার স্বর্গীয় কণ্ঠ। এমন মধুর সে-সঙ্গীত, মনে হলো আকাশের তাকিয়ে থাকা তারাদের বুক এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যাবে তার টানে।

গানের বিষয়বস্তু প্রাচীন এক বিষাদময় প্রেমকাহিনী। হাথোরের এক উচ্চ মর্যাদার পূজারিণীর প্রেমে পড়েছিল এক সাধারণ নকলনবিশ। মর্যাদার পার্থক্যের কারণে তাদের বিয়ে সম্ভব ছিল না। গানে বলা হয়েছে, প্রেমকাতর নকলনবিশ কী করে গভীর রাতে প্রেমিকার খোঁজে লুকিয়ে মন্দিরের নিভৃতকক্ষে ঢুকে পড়েছিল এবং এই ধর্মদ্রোহিতার জন্য ক্রুদ্ধ দেবী তাকে হত্যা করেছিলেন। একই সময় সুন্দরী পূজারিণী তার প্রেমিককে ভুলে থাকার শক্তি প্রার্থনা করতে মন্দিরের নিভৃতকক্ষে আসে এবং হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় প্রেমিকের মৃতদেহের ওপর। প্রেমিককে মৃত দেখে সেখানেই মারা যায় পূজারিণী। গানে বলা হয়েছে, কী করে এই বিষাদময় দৃশ্য দেখে প্রেমের দেবী হাথোরের মন গলে যায় এবং তিনি তাদের নাকে প্রাণবায়ু ফিরিয়ে দেন। তবে অন্যলোকে চলে যাওয়া প্রাণকে আর পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব ছিল না বলে হাথোর তাদের পাতালপুরীতে থাকার ব্যবস্থা করে দেন, এবং সেখানেই তাদের মিলন হয়।

এই পুরোনো কাহিনী সবার জানা। গানটাও সবারই শোনা। কিন্তু এমন অপূর্ব কণ্ঠ, সুর ও তালে কেউ কখনও গানটি শোনেনি। তুয়া যখন গাইছে, শ্রোতাদের প্রত্যেকের চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল গানে বলা দৃশ্য ও ঘটনাগুলো। গান শুনতে শুনতে সবার মনে পড়ে গেছে এই রানী বিশ্বের প্রভু আমেনের কন্যা। সাধারণ রাজকীয় মানবী নয় সে, সে স্বর্গ থেকে নেমে আসা দেবী।

গান শেষে অখণ্ড নীরবতা মিলনায়তনে। মুহ্যমানের মত বসে আছেন অতিথিরা। বীণাটা পাশে নামিয়ে রেখে নিজের আসনে বসে পড়লো পরিশ্রান্ত তুয়া। মুখ ফ্যাকাসে, নীল চোখ দুটো জ্বলছে তারার মত। শ্রোতাদের সবার দৃষ্টি সেই চোখের দিকে। কামনা আর মদে মাতাল আমাথেলও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তুয়ার দিকে। কিন্তু তুয়ার চোখ দুটো তো তাকে দেখছে না। তাকে ছাড়িয়ে আরও পেছনে অন্য কিছু খুঁজছে রানীর চোখ।

আমেনের ভোরের তারার দৃষ্টি কিসের ওপর তা দেখার জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো আমাথেল। দেখলো, তরুণ সেনাধ্যক্ষ, যে সারা সন্ধ্যা তাকে মদ পরিবেশন করেছে, যে নাকি বংশ গৌরবে তার চেয়েও

প্রাচীন, যার পূর্বপুরুষরা এক সময় দক্ষিণ দেশের উপর রাজত্ব করতো, স্থির চোখে সে তাকিয়ে আছে রাজকীয় সঙ্গীত শিল্পীর দিকে। মাতাল হলেও রামেসের সেই দৃষ্টির অর্থ বুঝতে মুহূর্তও দেরি হলো না আমাথেলের। ভয়ানক ক্রোধে আসন ঠেলে উঠে দাঁড়াতে গেল সে। সোনালী রঙের লম্বাটে একটা মদের পাত্র তখনও রামেসের হাতে। হাতির দাঁতে তৈরি আসনের উঁচু পিঠের সঙ্গে লেগে কাত হয়ে গেল পাত্রটা। লাল মদ বৃষ্টির মত ঝরে পড়লো যুবরাজের মাথায়, পোশাকে। মদে ভিজে জবজবে হয়ে গেল তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গর্জে উঠলো আমাথেল:

'কুত্তার বংশধর দাস! শুয়োরের ভাই! এভাবে তুই আমার সেবা করছিস?' সাঁ করে হাতের পানপাত্র চালালো সে রামেসের মুখ বরাবর। পর মুহূর্তে খাপ থেকে টেনে বের করলো তলোয়ার।

রামেসের কোমরে রয়েছে ফারাওয়ের দেয়া সেই তরবারি, তার মা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা আসতি যার ফলায় রাজরক্ত দেখতে পেয়েছিলেন। মুখে পানপাত্রের আঘাতে চরম অপমানিত রামেস। নিচু এক হুঙ্কার ছেড়ে সে-ও তলোয়ার বের করলো। একই সঙ্গে আত্মরক্ষার জন্য লাফ দিয়ে সরে গেল বেশ কিছুটা পেছনে ফাঁকা জায়গায়।

'কাপুরুষ!' হুঙ্কার ছেড়ে আমাথেলও লাফ দিলো ওর দিকে। পর মুহূর্তে মিলনায়তনের স্তম্ভগুলোয় প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো, ব্রোঞ্জের সঙ্গে ব্রোঞ্জের ঠোকাঠুকির আওয়াজ।

আকস্মিক এই ঘটনায় অতিথিরা স্তম্ভিত। ফারাওয়ের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই নির্দেশের জন্য। ঘটনার আকস্মিকতায় ফারাও-ও আতঙ্কিত। মৃহ্যমানের মত নিজের আসনে এলিয়ে পড়লেন তিনি। রানীর দিকে তাকালো অতিথিরা। তুয়াও কোন নির্দেশ দিলো না বা ইঙ্গিত করলো না। বুকের ভেতর ওর ঝড় বইছে। অপলক চোখে তাকিয়ে অপেক্ষায় আছে শেষ দেখার জন্য।

সব কিছু ভুলে গেছে রামেস। সে সৈনিক, রাজকীয় এক বংশের উত্তরপুরুষ; রাজপুত্র দাবিদার এক ন্যুবিয়ান তার মুখে আঘাত করেছে, এর বাইরে আর কিছু তার মনে নেই। তার রক্ত টগবগ করে ফুটছে। তাছাড়া তুয়ার চোখে সে দেখেছে ইঙ্গিত, তার বিজয় দেখতে চায় তুয়া। মরুসিংহের মত লাফ দিয়ে সে তলোয়ার চালালো আমাথেলের গলা বরাবর। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো আঘাতটা, তবে আমাথেলের মস্তকাবরণের অস্ট্রিচ পালকের বেশ খানিকটা কেটে নিয়ে চলে গেল তার তলোয়ার। আমাথেলও লড়াইয়ে পটু, পাগলের শক্তি তার গায়ে। সে পাল্টা

আঘাত হানলো। তার তলোয়ার লম্বায় বড় রামেসেরটার চেয়ে। রামেসের বর্মের খানিকটা ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে গেল সেটা। পর মুহূর্তে রামেসের কাঁধে এসে লাগলো আমাথেলের আঘাত। হাঁটু ভেঙে বসে পড়লো রামেস। তৃতীয় আঘাত নেমে এলো রামেসের উপর। এবার তলোয়ার লাগলো তার উরুতে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো ক্ষতস্থান থেকে। ফারাওয়ের রক্ষীদলের এক সৈনিক তার দলনেতাকে উৎসাহ দেয়ার জন্য চিৎকার করে উঠলো। চিৎকার করতে লাগলো ন্যূবিয়ান রক্ষীরাও।

এতক্ষণে যেন জেগে উঠলো রামেস। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তলোয়ার চালালো সে। এবার আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না। আমাথেলের ধাতব বর্ম ভেদ করে আঘাত পৌঁছুলো জায়গা মত। তলোয়ার টেনে নিয়ে আবার আঘাত করলো রামেস। এবার আরও ভয়ঙ্কর শক্তিতে। আবার রক্ত ঝরলো আমাথেলের। খুনের নেশা চেপে গেছে রামেসের মাথায়। তলোয়ার চালানোর যত কৌশল জানা ছিল সব খাটিয়ে আবার আঘাত হানলো সে। এবার তলোয়ার লাগলো আমাথেলের কাঁধের নিচে। ন্যূবিয়ান রাজপুত্রের বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে চলে গেল মিশরীয় তলোয়ার। এক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে রইলো কেশ-এর যুবরাজ, তারপর তার মৃতদেহ ঢলে পড়লো মাটিতে।

প্রচণ্ড রোষে ফেটে পড়লো বিশালদেহী ন্যূবিয়ান রক্ষীরা। দল বেঁধে বর্শা উঁচিয়ে তারা এগোলো তাদের প্রভুর মৃত্যুর বদলা নিতে। পিছিয়ে নিজের সৈন্যদের কাতারে এসে দাঁড়ালো রামেস। ন্যূবিয়ান রক্ষীরাও তেড়ে এলো। শুরু হয়ে গেল ভয়ঙ্কর লড়াই। বংশপরম্পরায় ন্যূবিয়ানরা মিশরীয়দের আর মিশরীয়রা ন্যূবিয়ানদের ঘৃণা করে। সুতরাং লাড়াই হলো প্রাণ বাজি রেখে। তবে মিশরীয়দের সুবিধা তাদের দলপতি আছে, ন্যূবিয়ানদের নেই। একটু পরেই দেখা গেল বিশালদেহীরা পিছু হটছে অথবা নেতিয়ে পড়ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে মাত্র তিনজন খাড়া রইল। অস্ত্র ফেলে দিয়ে তারা ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলো। তারপরই প্রথমবারের মত রামেস বুঝতে পারলো কী ভয়ঙ্কর কাজ সে করে ফেলেছে। রক্তমাখা তলোয়ার হাতে মাথা নিচু করে ফারাওয়ের সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলো সে।

'আমার এবং মিশরের সম্মানহানির প্রতিশোধ আমি নিয়েছি। এবার আমাকে হত্যা করুন, মহানুভব!'

ফারাও কোন জবাব দিলেন না। এখনও চোখ বুজে আসনে হেলান দিয়ে আছেন তিনি। তুয়ার দিকে ফিরলো রামেস। 'ফারাও ঘুমিয়ে

পড়েছেন,' বললো সে, 'কিন্তু আপনার হাতেও রাজদণ্ড আছে। আমাকে হত্যা করুন, মহামহিম রানী!'

এতক্ষণ পাথরের মূর্তির মত দেখে গেছে তুয়া। রামেসের কথায় প্রাণ ফিরে পেলো। এবং প্রথমেই মনে হলো, তার বিপদ কেটে গেছে। ঐ কর্কশ কুটিল হৃদয় ন্যুবিয়ানটাকে তার আর বিয়ে করতে হবে না, রামেস তাকে হত্যা করেছে। এর জন্য রামেসকে মনে মনে ধন্যবাদ জানালো সে। তবে রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে সে ভাল করেই জানে, রামেস যুবরাজ আমাথেলের তলোয়ার থেকে বেঁচে গেলেও বিপদ তার মাত্র শুরু হয়েছে। এ-বিপদ থেকে রেহাই পাওয়া অসম্ভব। আমাথেল শক্তিশালী এক রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজা। সেই রাজ্য এতটাই শক্তিশালী যে গত এক শতাব্দীতে মিশর তাদের সাথে কোন ধরনের বিবাদে জড়িয়ে পড়ার সাহস পায়নি। তার ওপর লোকটা মারা গেছে ফারাওয়ের উপস্থিতিতে, ফারাওয়ের দেয়া ভোজসভায়, ফারাওয়েরই রক্ষীদলের কর্মকর্তার হাতে। এর অর্থ যুদ্ধ। আর, রামেস ভাল করেই জানে, যে হত্যা করেছে তার শাস্তি মৃত্যু।

সামনে নতজানু হয়ে থাকা রামেসের দিকে তাকালো তুয়া। বুকের ভেতরটা ওর হু হু করে উঠলো। দ্রুত চিন্তা চলছে মাথায়। যত জ্ঞান ও সঞ্চয় করেছে এই জীবনে সব হাতড়ে চেষ্টা করছে রামেসকে বাঁচানোর উপায় বের করতে। একটু ভাবতেই বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে মাথা সোজা করে তৎপর হয়ে উঠলো সে। সবগুলো দরজা বন্ধ করে প্রতিটা দরজায় রক্ষী দাঁড় করিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলো, যাতে কেউ মিলনায়তন থেকে বেরোতে বা ঢুকতে না পারে। একই সঙ্গে অভ্যাগতদের মধ্যে চিকিৎসক যারা ছিলেন তাদেরকে নির্দেশ দিলো আহতদের এবং ফারাওয়ের চিকিৎসা শুরু করার। এর মধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে, অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ফারাও। এরপর সে রাজ্যের সর্বোচ্চ পরিষদের সদস্যদের ডাকলো নিজের কাছে।

'সর্বোচ্চ রাজ-পরিষদের সদস্যগণ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ,' শান্ত শীতল কণ্ঠে শুরু করলো তুয়া। 'এখানে যে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেল দেবতারা তাদের গূঢ় কোন ইচ্ছায় তা ঘটিয়েছেন। মিশরের অতিথি এবং তার দেহরক্ষীদের কয়েকজনকে মিশরেরই সম্রাটের সামনে, তার দেয়া ভোজসভাতে হত্যা করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনাকে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হবে। কিন্তু আপনারা ভাল করেই জানেন, সব আপনাদের সামনে ঘটেছে, এর মধ্যে কোন বিশ্বাসঘাতকতা ছিল না। যা ঘটে গেছে তা নিছকই একটা দুর্ভাগ্যজনক

দুর্ঘটনা। আপনারা দেখেছেন, নিহত যুবরাজ কেমন মাতাল হয়েছিলেন। মাতাল অবস্থায় তিনি একজন উচ্চবংশীয় যুবক, যিনি মিশরের একজন খেতাব পাওয়া ব্যক্তি এবং ফারাওয়ের সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা, তাকে আঘাত করে বসেন। যুবরাজকে বিশেষ সম্মান দেখানোর জন্য এই উচ্চবংশীয় সেনা-কর্মকর্তাকে তাঁর সেবায় নিয়োগ করা হয়। কিন্তু যুবরাজ অকথ্য গালাগাল করে তলোয়ার নিয়ে তেড়ে যান তাকে হত্যা করতে। ঠিক বলছি আমি? এগুলো আপনারা দেখেছেন, শুনেছেন?'

'হ্যাঁ!' পরিষদ এবং অন্য শ্রোতারা সমস্বরে জবাব দিলেন।

'তাহলে কী দাঁড়াল?' বলে চললো তুয়া, 'এই সেনা কর্মকর্তা তার আত্মমর্যাদা রক্ষার বিষয় ছাড়া আর সবকিছু ভুলে গিয়েছিল। এ-কারণেই সে কেশ-এর যুবরাজের সঙ্গে লড়াইয়ে নামার সাহস দেখিয়েছে। এবং শ্রেয়তর যোদ্ধা হিসেবে তাকে হত্যা করেছে। পরে কেশ যুবরাজের রক্ষীরা যখন তাকে আক্রমণ করে তখন ফারাওয়ের রক্ষীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের বেশিরভাগকে হত্যা করে। দু'দলকে লড়াই থেকে বিরত রাখবার মত অস্ত্রধারী কেউ এখানে ছিল না। ঠিক বলেছি আমি?'

'হ্যাঁ, মহামান্য রানী,' পরিষদের মুখপাত্র হিসেবে জবাব দিলেন একজন। 'এখানে যা ঘটে গেছে তাতে রাজকীয় রক্ষীদলনেতা রামেসের কোন দোষ আছে বলে মনে হয় না।'

অন্যদের মধ্যে সম্মতিসূচক একটা গুঞ্জন উঠলো। আত্মবিশ্বাস বেড়ে উঠলো তুয়ার। সে বলে চললো, 'এমনি সঙ্কটময় এক সময়ে আমাদের দুর্দশা আরও বাড়িয়ে দেবতাদের আঘাত নেমে এলো আমার পিতা ফারাওয়ের ওপর। তিনি অচেতন হয়ে পড়েছেন। জানি না তিনি বেঁচে থাকবেন কিনা। এমনি অবস্থায় মিশরের যথাযথ অভিষিক্ত রানী হিসেবে তাঁর হয়ে আমাকেই সিদ্ধান্ত দিতে হবে। বিষয়টা কতখানি জরুরি তা আপনারা বুঝতে পারছেন।' থেমে পরিষদ সদস্যদের দিকে চোখ রাখলো তুয়া। 'এখন আপনারা বলুন, দেবতাদের ইচ্ছা অনুসারে আমি সিদ্ধান্ত দেব কি না?'

'সেটাই ঠিক হবে,' সবার পক্ষ থেকে জবাব দিলেন ফারাওয়ের সার্বক্ষণিক সহচর প্রধানমন্ত্রী।

'তাহলে, পুরোহিত, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ এবং জনগণ, আপনারাই বলুন, এই সঙ্কট উত্তরণের জন্য কী পন্থা আমরা গ্রহণ করবো? আপনাদের সবার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আপনাদের পক্ষ থেকে আমি

রামেস এবং ফারাওয়ের রক্ষীদলের ঐ সব বাছাই করা সৈনিকদের, যাদের ফারাও এত ভালবাসতেন, তাদের অবিলম্বে হত্যা করার নির্দেশ দিতে পারি। আমার মত আপনারাও জানেন, রামেসকে আজ যে অপমান করা হয়েছে কোন উচ্চবংশীয় মানুষের পক্ষে তা সহ্য করা সম্ভব নয়। অতিথি হওয়া সত্ত্বেও কেশ যুবরাজ যখন খোলা তলোয়ার হাতে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন সে-সময় নিজের প্রাণ ও মিশরীয় সৈনিকের গৌরব রক্ষার স্বার্থে তারও তলোয়ার ধরা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। আবার এটাও ঠিক সে অতিথিকে হত্যা করেছে।'

থেমে সামনের মানুষগুলোর দিকে তাকালো তুয়া। কেউ একজন বললো, 'হ্যাঁ', আরেকটা গলা শোনা গেল, 'মৃত্যুই এর একমাত্র শাস্তি'। এর পরপরই মৌমাছির গুঞ্জনের মত প্রতিবাদ উঠলো এসব কথার। পারিষদবর্গ এবং অন্য অভ্যাগতদের বেশিরভাগই মনে করছেন রামেস যা করেছে এ-ছাড়া তার উপায় ছিল না। বরং কেউ কেউ তরুণ রামেসের শৌর্য দেখে গর্ব বোধ করছেন। আর খুশি ন্যূবিয়নগুলো মারা যাওয়ায়।

পারিষদবর্গ এবং অভ্যাগতরা যখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন, তুয়া তার আসন ছেড়ে এগিয়ে গেল ফারাওকে দেখার জন্য। চিকিৎসকরা তাঁর শুশ্রূষা করছেন। কেউ হাত ডলে দিচ্ছে, কেউ পানি দিচ্ছে কপালে। একটু পরেই নিজের জায়গায় ফিরে এলো তুয়া, অপরূপ মায়াময় চোখদুটোয় অশ্রু টল টল করছে। বাবাকে অসম্ভব ভালবাসে সে।

'ফারাও খুবই অসুস্থ,' ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলতে লাগলো তুয়া। 'অশুভ সেৎ তার থাবা বাড়িয়েছে তাঁর দিকে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তাঁকে আমাদের ভেতর থেকে নিয়ে নেওয়া হয় কিনা। এই দুর্ভাগ্য আমাদের ওপর নেমে এসেছে এক বিদেশী যুবরাজের দুর্ব্যবহারের কারণে। আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না এই হাঙ্গামা শুরু করেছে ঐ লোকটা।'

শ্রোতারা সবাই একমত হলেন তুয়ার সঙ্গে। অনেকেই ক্রুদ্ধ চোখে তাকালেন বেঁচে যাওয়া ন্যূবিয়ানগুলোর দিকে। আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে তুয়ার। সে বলে চললো, 'নিয়তি যে দুর্ভাগ্যের মধ্যে আমাদের ফেলেছে তা আমাদের ভোগ করতে হবে। পাশাপাশি এ-ও সত্য, ন্যায়বিচারের যে তরবারি, ব্যক্তিগত দুঃখ-শোকের কারণে তার ধার নষ্ট করাও চলবে না। সুতরাং সেনাকর্মকর্তা রামেস ও তার সাহসী সঙ্গীরা ভাই বা স্বামী হিসেবে আমাদের যত প্রিয়ই হোক না কেন,

প্রাপ্য শাস্তি তাদের পাওয়া উচিৎ। যে কাজ তারা করেছে তার একমাত্র শাস্তি তো লজ্জাজনক মৃত্যু।'

আবার থামলো তুয়া। মিলনায়তনে অখণ্ড নিস্তব্ধতা। চিকিৎসকরাও কাজ থামিয়ে তাকিয়ে আছেন এ-মুহূর্তে মিশরের সর্বোচ্চ বিচারকের রায় শুনবার জন্য। 'কিন্তু, কিন্তু, মিশরের রাজপারিষদবর্গ, আমার দেশবাসী, দণ্ডাজ্ঞা একবার উচ্চারণ করে ফেললে তো আর তা ফেরানো যাবে না। আমি রামেস ও তার সঙ্গীদের প্রাণদণ্ডের নির্দেশই দিতে যাচ্ছিলাম, এই সময় আমাদের এই রাষ্ট্রের অভিভাবক আত্মা আমার হৃদয়ে একটা চিন্তার সঞ্চার করলেন। আমার মনে হয় এ-বিষয়ে আপনাদের মতামত নেয়া জরুরি। এই লোকগুলোকে আমরা যদি হত্যা করি তাহলে কি দক্ষিণ দেশের এবং অন্যান্য দেশের লোকেরা বলবে না, আমরাই নির্দেশ দিয়ে কেশ-এর যুবরাজকে হত্যা করিয়েছি, তারপর একথা যেন জানাজানি না হয় সেজন্য হত্যা করেছি হত্যাকারীদের? সবাই কি এমন ধারণাই করবে না, মিশর এবং মিশরের ফারাওয়ের হাতে রাজ-অতিথির রক্ত লেগে আছে? সেই অতিথি এমন একজন, যাকে–যাকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল। কোন সন্দেহ নেই আমাদেরকে, মিশরের সবাইকে বিশ্বাসঘাতক বলা হবে। কিন্তু আমরা তো জানি, এবং চোখের সামনেই দেখেছি, তাদের কাজ যত ভয়ানক আর নীচ বলেই মনে হোক, তারা নিজের সম্মান ও মিশরের সম্মানের জন্য মাথা সোজা করে দাঁড়িয়ে সাহসের পরিচয় দিয়েছে। অথচ দেশে দেশে গল্প-কাহিনীতে তাদেরকে সাধারণ খুনী হিসেবে দেখানো হবে, ওসিরিসের কাছে যখন যাবে তাদের কপালে খুনীর ছাপ মারা থাকবে। হ্যাঁ, তাদের এই লজ্জা কিছুটা হলেও মহান ফারাও ও তাঁর পারিষদবর্গের গায়েও লাগবে।'

আবারও গুঞ্জন উঠলো শ্রোতাদের ভেতর। সম্ভ্রান্ত বংশীয়া কয়েকজন মহিলা তো কেঁদেই ফেললেন তাঁদের স্বামীদের পারলৌকিক দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে। তুয়া বলে চললো, 'কিন্তু আমরা অন্য একটা উপায় যদি করি তাহলে কেমন হয়? যদি আমরা এই সেনাধ্যক্ষ রামেস ও তার সঙ্গীদের নাপাতা নগরীতে যাওয়ার নির্দেশ দেই তাহলে কেমন হয়? ফারাওয়ের মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি রক্ষীদল যাবে তাদের সাথে। সেখানকার রাজার কাছে তারা লিখিতভাবে এবং নিজের মুখে বলবে এই দুঃখজনক ঘটনার কথা, কী পরিস্থিতিতে রাজার একমাত্র পুত্র মারা গেছে সেই কথা। যদি আমরা কেশ রাজার কাছে চিঠি লিখে জানাই, "আমাদের এখানে যা ঘটেছে সব শুনে নিশ্চই আপনি

আমাদের দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের বিষয় অনুমান করতে পারছেন। সব বিচার বিশ্লেষণ করে যদি আপনি আপনার মহত্ত্বের গুণে এই লোকগুলোকে ক্ষমা করার যোগ্য মনে করেন তাহলে তাদের ক্ষমা করবেন। এতে আমরা আপনার প্রশংসা করব। আর যদি আপনার বিবেচনায় এদের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য মনে হয় তাহলে তাদের শাস্তির বিধান দিয়ে আমাদের কাছে ফেরত পাঠাবেন। আপনার বিধান মতো আমরা ওদের দণ্ড কার্যকর করব।" আমার এই পরিকল্পনা কেমন মনে হয় আপনাদের? এরপর কি কেশ-এর রাজা আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করতে পারবেন? অন্যান্য দেশের মানুষরা কি বলতে পারবে মিশরীয়রা অতিথি-হত্যাকারী? আমার জ্ঞান সীমিত। এই জ্ঞানে মিশরের মর্যাদা রক্ষার জন্য যে উপায় আমি চিন্তা করেছি তা কি বাস্তবায়নযোগ্য?'

একবাক্যে সবাই তুয়ার এ-প্রস্তাব সমর্থন করলো। পারিষদবর্গ, অভ্যাগতরা, বিচারের সম্মুখীন রক্ষীরা–সবাই হাততালি দিয়ে চিৎকার করে উঠলো এর চেয়ে ভাল বিচার আর হয় না। সবাই রানীর প্রজ্ঞা ও রাষ্ট্রনায়কোচিত গুণের প্রশংসা করতে লাগলো। কেউ কেউ এমনও বললো এই প্রজ্ঞা নিঃসন্দেহে দেবতাদের দেয়া। কেবল রামেস কোন কথা বললো না, সে তেমনি হাঁটু গেড়ে বসে আছে রানীর সামনে।

প্রশংসা গায়ে মাখলো না তুয়া। রাজদণ্ড উঁচু করে সবাইকে চুপ করার নির্দেশ দিয়ে বললো, 'পারিষদগণ, এ-ই তাহলে আপনাদের রায়? এখানে যারা উপস্থিত আছেন তারা দেশের সবচাইতে সম্ভ্রান্ত মানুষ। অভিষেকের শপথ অনুসারে আমি আপনাদের এ-রায় অনুমোদন করতে বাধ্য। সুতরাং, আমি নেতের তুয়া, যাকে বলা হয় আমেনের কন্যা ও ভোরের তারা, যার নাম দেয়া হয়েছে গৌরবে রা-য়ের মত, সৌন্দর্যে হাথোর, উচ্চ এবং নিম্ন ভূমির রানী হিসেবে যাকে অভিষিক্ত করা হয়েছে সেই আমি আপনাদের রায় অনুমোদন করছি, এবং ঘোষণা করছি–কই লিপিকরেরা? লিখে নাও, আমি ঘোষণা করছি, মিশরের সেরা দুই হাজার সৈন্য অবিলম্বে নীলনদের উপর পাল তুলে দিয়ে কেশ রাজ্যে যাবে। এই সেনাদলের নেতৃত্বে থাকবে রামেস। সবাই যাতে তার অপরাধের কথা জানতে পারে সেজন্যই তাকে এই দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে। অন্য যে সৈনিকরা রক্তপাতের সাথে জড়িত তারাও যাবে তার সাথে।'

শাস্তি কোথায়, রামেসকে তো পুরস্কৃত করা হলো, এটা বুঝতে পেরে কেউ কেউ চমকে উঠলো। আর রামেসের সারা শরীর দিয়ে বয়ে

গেল কাঁপুনির একটা স্রোত। মুখ তুলে তাকালো সে রানীর দিকে।

'আমি ঘোষণা করছি,' দ্রুত বলে চলেছে তুয়া, 'নাপাতায় পৌঁছে তারা সেখানকার রাজার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর দেওয়া বিচারের রায় শুনবে, এবং সেই রায়ের কথা আমাদের জানানো এবং রায় যাতে কার্যকর করা যায় সেজন্য ফিরে আসবে এখানে। আজ রাতের মধ্যেই সেনাদল ও তাদের বহনকারী নৌযান প্রস্তুত করে ফেলার নির্দেশ দিচ্ছি। সেই সাথে নাপাতাগামী সেনাদলের সেনাপতি হিসেবে আনুষ্ঠানিক নির্দেশ নিতে আসার আগ পর্যন্ত আমাদের ক্রোধ ও ঘৃণার নিদর্শনস্বরূপ রাজপুরুষ রামেসের জন্য রাজদরবার ও রাজপরিষদের সামনে আসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হচ্ছে। আর তার সঙ্গী যারা আজকের লড়াইয়ে অংশ নিয়েছে তারা থাকবে কড়া পাহারায়।'

রানীর আজ্ঞা দ্রুত লিখে ফেলার পর উপস্থিত সবাইকে পড়ে শোনানো হলো। এরপর তাতে স্বাক্ষর করলো রানী। গালা দিয়ে সিলমোহর মারা হলো, যাতে এর এক বর্ণও কেউ পরিবর্তন করতে না পারে। লিখিত এই ঘোষণার নকল তৈরি করিয়ে প্রতিটি প্রদেশের প্রশাসকের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হলো। এর একটা নকল এবং মিশরের রানীর পক্ষ থেকে শোকবার্তা এবং যুবরাজ আমাথেলের মৃতদেহও তার শেষকৃত্যের উপহারসহ পাঠানোর ব্যবস্থা করা হলো খোদ কেশ-এর রাজার কাছে।

অবশেষে মিলনায়তনের সব দরজা খুলে দেয়া হলো। অতিথিরা বিদায় নিলেন। রামেস এবং তার সঙ্গীদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো নিরাপদ হেফাজতে। ফারাও এখনও অচেতন। তাঁকে বহন করে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেয়া হলো তাঁর বিছানায়। মৃতদের নিয়ে যাওয়া হলো মমিকারদের কাছে। ক্লান্ত তুয়ার তখন হাঁটার ক্ষমতাও নেই। তার প্রধান পরিচারিকা, রামেসের মা আসতির কাঁধে ভর দিয়ে নিজের ঘরের দিকে চললো সে।

৬
রামেস ও তুয়ার শপথ

নিজের কামরায় এক আরাম-আসনে শুয়ে আছে তুয়া। বিছানায় যাওয়ার ইচ্ছে হয়নি। বাইরের পোশাক পরে আছে এখনও। আসতি দাঁড়িয়ে তার পাশে। 'মহামান্য রানী, অদ্ভুত সব কাণ্ড কারখানা করলে আজ,' বললেন তিনি।

তুয়া ঘাড় ফিরিয়ে আসতির দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো, 'খুবই অদ্ভুত। দেখলেই তো, দেবতাদের ইচ্ছা এবং তোমার অঘটনপ্রিয় ছেলের দুঃসাহস আর ফারাওয়ের আকস্মিক অসুস্থতা নিয়তির সুতো আমার হাতে তুলে দিলো, আমি সেই সুতো টানলাম। এ-ভাবে সুতো টানা আমার খুবই পছন্দের বিষয়, কিন্তু আগে কখনও সুযোগ আসেনি।'

'তবে শুরু হিসেবে একটু বেশি জোরে টানা হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, এত জোরে যে আমার মনে হয় সেই জোরে তোমার ছেলেকে বধ্যভূমি থেকে তুলে এনে কিছুটা হলেও সম্মানের জায়গায় বসাতে পেরেছি। এখন এই জায়গায় থাকার যোগ্যতা তোমার ছেলের থাকলে হয়। অবশ্য রাজপরিষদ ও অভিজাত অভ্যাগতরা মনে করেছেন তারাই সুতো টেনেছেন।'

'মহামান্য রানী, খুবই বুদ্ধির খেলা দেখিয়েছ আজ। অনেক বড় রানী হবে তুমি, যদি না বেশি টানতে গিয়ে সুতো ছিঁড়ে ফেল।'

'তুমি যে খেলা দেখিয়েছ তার অর্ধেকও না। যেভাবে তুমি ফুলদানির ভেতর থেকে রাজপুত্রের বদলে বানর বের করে আনলে,' হাসতে হাসতে বললো তুয়া। 'উঁহুঁ অমন ভালমানুষের মত মুখ করে থেকো না, আমি জানি তোমার যাদুতেই ওটা হয়েছে। কেমন করে করলে, দাই মা?'

'কী করে ফুলদানির ভেতর থেকে বানর বেরোলো তা আমি বলতে পারি যদি তার আগে তুমি বল, কী করে নাপাতায় সামরিক অভিযানের ব্যাপারে রাজপরিষদ ও অভিজাতদের সমর্থন দিতে বাধ্য করলে। অভিযান তো অভিযান তা-ও আবার নেহায়েত এক ছোট মাপের সেনাকর্মকর্তার অধীনে, যে কিনা সেই রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজাকে হত্যা করেছে। রামেস সম্পর্কে সামান্যতম ধারণাও যদি আমার থাকে

তাহলে বলবো, মহামান্য রানী, আজ যে রাজাজ্ঞা তুমি অনুমোদন করিয়ে নিয়েছ, তার অর্থ কেশ রাজ্যের সঙ্গে মিশরের যুদ্ধ।'

'এভাবে যদি বল তাহলে তো আমি কখনও কিছু শিখতে পারবো না। আমার কাছে যা তুমি জানতে চাইছ সে-ব্যাপারে কিছুই আমি জানি না। আমার গলায় যেমন করে সুর আসে তেমনি মনের মধ্যে চলে এলো, আর করে ফেললাম। কালো শুয়োরটার দাঁতের আঘাত সহ্য না করার দায়ে তক্ষুনি রামেসের গর্দান নেয়া উচিৎ ছিল, না কী? তোমার কি মনে হয় ইচ্ছে করে ও আমাথেলের মাথায় মদ ঢেলে দিয়েছিল?'

'আমার মনে হয় না এতক্ষণ ও বেঁচে থাকত, যদি না মহামান্য রানী ওকে অতটা পছন্দ–'

'মদের কথা বলছিলাম,' বাধা দিয়ে বললো তুয়া, 'দাও না আমাকে এক পেয়ালা। কেশ-এর মহামান্য যুবরাজ–আমার স্বামী হওয়ার কথা ছিল তার–জানো, আসতি, সত্যিই ওরা ঐ কালো বর্বরটার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চেয়েছিল? স্বর্গীয় যুবরাজ এখন ওসিরিসের সাথে রাতের খাবার খাচ্ছেন। কিন্তু তখন এত মদ গিলছিল যে তা দেখে আমি এক ফোঁটাও স্পর্শ করতে পারিনি। এখন ভয়ানক পিপাসার্ত আমি, তার ওপর রাতে আরও কিছু কাজ করা বাকি রয়েছে।'

আসতি কামরার এক কোণের টেবিল থেকে এক পাত্র মদ ঢেলে এনে দিলেন।

'স্বর্গীয় যুবরাজের স্মরণে পান করছি। আশা করি আমি পৌঁছানোর আগেই তিনি ওসিরিসের টেবিল ছেড়ে উঠে পড়বেন। আরও পান করছি যে তাঁকে ওসিরিসের কাছে পাঠিয়েছে তার কল্যাণ কামনায়,' বেপরোয়া ভঙ্গিতে বলে তুয়া চুমুক দিলো মদের পেয়ালায়। শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত গলায় ঢেলে দিয়ে পেয়ালাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো মর্মর পাথরের মেঝেতে। শত টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো পেয়ালাটা।

'এই রাতে কোন দেবতা মহামান্য রানীর ভেতরে প্রবেশ করেছে?' শান্তকণ্ঠে বললো আসতি।

'যে দেবতা নিজের মনের খবর জানে,' বললো তুয়া। 'এই তো এখন আবার শক্ত মনে হচ্ছে ভেতরটা। এবার ফারাওকে দেখতে যাব। এসো আমার সাথে, দাইমা।'

ফারাওয়ের বিছানার পাশে পৌঁছে আসতি দেখলো বিপদের বড় ধাক্কাটা

কেটে গেছে। চিকিৎসকরা এর মধ্যে রক্ত মোক্ষণ করিয়েছেন তাঁর। অচেতন অবস্থা কেটে গেছে, চোখ মেলেছেন ফারাও। তবে কথা বলতে পারছেন না এবং কাউকে চিনতেও পারছেন না। তুয়াকে দেখেও কোন ভাব ফুটলো না তাঁর চোখে। তুয়ার প্রশ্নের জবাবে চিকিৎসকরা জানালেন, আপাতত প্রাণ-সংশয় নেই ফারাওয়ের। তবে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন কিনা তা এখনই বলা সম্ভব নয়। আগামী বেশ কিছুদিন তাঁকে চুপচাপ শুয়ে কাটাতে হবে। রাজকাজ দূরে থাক, কোন রকমের শারীরিক বা মানসিক কাজই তাঁর করা উচিৎ হবে না। বিশেষ করে এমন কিছু তাকে বলা যাবে না যাতে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়তে পারেন। সামান্য উত্তেজনাও তাঁর মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। খুশি হলো তুয়া। যা ভেবেছিল ফারাওয়ের অবস্থা তার চেয়ে ভাল। বাবাকে চুমু খেয়ে সে ফিরে এলো নিজের কামরায়।

'এবার কি মহামান্য রানী বিছানায় যাবে?' জিজ্ঞেস করলেন আসতি।

'প্রশ্নই আসে না,' বললো তুয়া। 'ফারাওয়ের জুতা এখন আমার পায়ে। অনেক দূর যেতে হবে এই রাতে, করতে হবে অনেক কাজ। তোমার স্বামী মার্মিসকে ডাকো।'

মার্মিস এলেন। তুয়া ছোটবেলায় যখন মার্মিসের বাসায় খেলা করতো তখন যেমন ছিলেন এখনও তেমন আছেন আমেন-মন্দিরের রক্ষীদলনেতা। ভাবশূন্য মুখ, অভিজাত চেহারা, মুখে কথা কম; কেবল চুলগুলোয় পাক ধরেছে। এ-মুহূর্তে চেহারায় একটু উদ্বেগের ছাপ। উদ্বেগ ছেলে রামেসের জন্য যেমন তেমনি বন্ধু ফারাওয়ের জন্যও। দুজনেরই অবস্থান এখন জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে। মার্মিসের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বেড়ে গেল তুয়ার। উদ্বিগ্ন ভাবটার কারণে রামেসের সঙ্গে মার্মিসের চেহারার মিল আরও বেশি করে ফুটে উঠেছে, যা আগে কখনও চোখে পড়েনি ওর।

'দুশ্চিন্তা দূর করুন, মার্মিস,' নরম করে বললো তুয়া। 'চিকিৎসকরা বললেন, ফারাও আরও কিছুদিন আমাদের সাথে থাকবেন।'

'এই সুসংবাদের জন্য আমেনের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই,' জবাব দিলেন মার্মিস। 'আজ উনি মারা গেলে আমার বংশের গায়ে তাঁর রক্তের দাগ লেগে থাকতো।'

'একথা ঠিক নয়, মার্মিস, রক্তের দাগ কারো ওপর পড়লে পড়বে দেবতাদের ওপর। রাজবংশে আপনার জন্ম, বলুন, মোটা ন্যূবিয়নটা

আঘাত করার পর যদি তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ক্রীতদাসের মত প্রাণভিক্ষা চাইত, আপনার ছেলে সম্পর্কে আপনার কেমন ধারণা হত?'

লাল হয়ে উঠলো মার্মিসের মুখ। মৃদু হেসে বললেন, 'বরং প্রশ্ন করা যেতে পারে আপনি কী ভাবতেন, মহামান্য রানী?'

'আমি? আঁ-রানী হিসেবে নিশ্চয়ই প্রশংসা করতাম, কারণ তাহলে মিশর অনেক বড় ঝামেলা থেকে রেহাই পেতো। কিন্তু নারী হিসেবে এবং ওর বন্ধু হিসেবে ওর সাথে আর কখনও কথা বলতাম না। সম্মান জীবনের চাইতেও বড়, মার্মিস।'

'নিশ্চয়ই সম্মান জীবনের চেয়ে বড়, রামেস বোধহয় তা প্রমাণ করতে চেয়েছিল।' ছাদের দিকে চোখ মার্মিসের, সম্ভবত তাঁর মুখে যে ভাব ফুটে উঠেছে তা লুকাতে চাইছেন। 'কিন্তু যার যত উপরে অবস্থান পড়লে তাকে ততটাই পড়তে হয়। ও মহামান্য রানী, ক্ষমা করবেন আমাকে, রামেস আমার একমাত্র সন্তান। ফারাও যখন সুস্থ হয়ে উঠবেন–'

'রামেস তখন অনেক দূরে,' বললো তুয়া। 'যান, এখনই ওকে এখানে ডেকে আনুন। সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এবং রাজপরিষদের প্রধান লিপিকরকেও আসতে বলবেন। এই আংটি নিয়ে যান, এটা দেখালে সব দরজা খুলে যাবে।' আঙুল থেকে তার সীলমোহর আঁকা আংটিটা খুলে দিল তুয়া।

'এই রাতে, মহামান্য রানী!?' বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন মার্মিস।

'আমি কি স্পষ্ট করে বলিনি?' অস্থিরকণ্ঠে বললো তুয়া। 'মিশরের কল্যাণ যখন হুমকির মুখে তখন আমি ঘুমাতে পারি না।'

কুর্নীশ করে চলে গেলেন মার্মিস। আসতিকে ডেকে চুল আঁচড়ে দিতে বললো তুয়া। পোশাক পাল্টে কিছু অলঙ্কার পরে দর্শনার্থীদের কক্ষে রাষ্ট্রীয় আসনে বসলো। আসতি দাঁড়িয়ে রইলেন তার পাশে। বেশ কিছুক্ষণ পর খুলে গেল কামরার দরজা। মার্মিস, প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান লিপিকরকে দেখা গেল দরজায়। মার্মিস ছাড়া অন্য দুজন হাই চাপার চেষ্টা করছেন–দুজনকেই সরাসরি বিছানা থেকে তুলে আনা হয়েছে। তাদের পেছন পেছন এলো রামেস। পায়ের জখমের কারণে খুঁড়িয়ে হাঁটছে সে।

আনুষ্ঠানিক সম্ভাষণ, কুশল বিনিময় ইত্যাদির সুযোগ দিলো না তুয়া। সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো, সন্ধ্যায় যে রাজাজ্ঞা জারি করা হয়েছে সেই মত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা! প্রধানমন্ত্রী হ্যাঁ-সূচক জবাব দিয়ে নাপাতায় পাঠানোর জন্য যেসব নৌযান, সেনাদল এবং

সেনা-কর্মকর্তাকে নির্বাচন করা হয়েছে, তাদের সঙ্গে যে রসদপত্র দেয়া হচ্ছে সেবিষয়ে সবিস্তার বিবরণ দিলেন। শোনার পর তুয়া কেশ'র জ্য পর্যন্ত নীলনদের তীরে যেসব দুর্গ আছে সেগুলোর অধিপতি জমিদার ও সেনা-কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে নির্দেশনামা লিখতে বললো। সন্ধ্যার রাজাজ্ঞার আলোকে সে মুখে মুখে বলে গেল লিপিকর তা লিখে ফেললো।

রাতের মধ্যেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করে সকালে সীলমোহর মারার জন্য নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়ে লিপিকরকে বিদায় করে দিলো তুয়া। তারপর ফিরলো রামেসের দিকে। তাকে পরদিনই রওনা হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বললো, এর মধ্যেই যে সৈন্যরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছে তাদের নিয়ে সে নীলনদের প্রথম জলপ্রপাতের উজানে তাকেনশিত-এর দুর্গে গিয়ে অপেক্ষা করবে। বাকি সৈন্যরা কেশ রাজার জন্য মিশরের উপহারসামগ্রী ও যুবরাজ আমাথেলের মমি করা দেহ নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার সঙ্গে যোগ দেবে। এরপরই সে রওনা হয়ে যাবে কেশ রাজ্যের উদ্দেশ্যে।

কুর্ণিশ করে রামেস বললো, রানীর নির্দেশ প্রতিপালিত হবে। রাতের মত কাজ শেষ। তুয়ার ইঙ্গিতে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য রওনা হলেন প্রধানমন্ত্রী, রামেস ও মার্মিস। রানীর সামনে থেকে বিদায় নেয়ার রীতি অনুযায়ী মাথা নুইয়ে পিছু হেঁটে চলেছেন তারা। রামেসের চোখ তুয়াব মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে। মাথা নিচু করে আসনের হাতল আঁকড়ে ধরে বসে আছে সে। গভীর চিন্তামগ্ন। কয়েক পা মাত্র পিছিয়েছে রামেস। এই সময় কিছু একটা সিদ্ধান্তে আসার ভঙ্গিতে মাথা সোজা করে তুয়া বললো,

'দাঁড়াও, রামেস! কেশ-এর রাজার জন্য একটা ব্যক্তিগত বার্তা দেব তোমাকে। হতভাগ্য পিতা! তার প্রতি সমবেদনা জানানোর ভাষা আমার নেই। তবু যা বল বা তা অন্য কারও শোনা চলবে না। রামেস থাক কিছুক্ষণ, আপনারা যান। আসতি, মার্মিস, আপনারা খেয়াল রাখুন কেউ যেন আমাদের কথা শুনতে না পায়। একটু পরেই আপনাদের ডাকবো ওকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।'

অদ্ভুত এই নির্দেশ শুনে ইতস্তত করতে লাগলেন তাঁরা। তবে তুয়ার দৃষ্টি দেখে আর দেরি করার সাহস হলো না, বেরিয়ে গেলেন দ্রুত পায়ে।

রামেস এবং রানী এখন একা রানীর দর্শনার্থী-কক্ষে। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে রামেস। দু'হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে রাখা।

তুয়া তাকিয়ে আছে তার দিকে। যেন কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। অবশেষে কথা বললো সে,

'সেই যে ছোটবেলায় মন্দির-প্রাঙ্গণে আমরা একসাথে খেলা করতাম, মনে আছে তোমার, রামেস, তারপর কত বছর চলে গেছে, আমরা একা একসাথে হতে পারিনি?'

'তা তো সম্ভব ছিল না, মহামান্য রানী,' বললো রামেস, 'আপনার জন্ম রানী হওয়ার জন্য, আর আমি সামান্য সৈনিক, রানীর সঙ্গে একা থাকার আশা করব কোন সাহসে?'

'আশা না হয় না করলে, ইচ্ছা তো করতে পারতে

'ও রানী, কেন আমার সাথে তামাশা করছেন?'

'তামাশা করছি না, রামেস। আমার পিতা আমেনের নামে বলছি, আমরা আবার শৈশবের দিনগুলোতে ফিরে যেতে পারলে বেশ হতো। সেই দিনগুলোই ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়। তারপরেই আমাদের পৃথক করে ফেলে তোমাকে ঠেলে দেয়া হলো সৈনিকবৃত্তিতে আর আমাকে রাষ্ট্র পরিচালনায়।'

'আপনি আপনার কাজ ভালই শিখেছেন, ভোরের তারা,' বললো রামেস।

'খেলার সাথী রামেস, আজ তোমার তলোয়ার খেলা যতটুকু দেখলাম তাতে মনে হয় না তুমি তোমার কাজ যতটা শিখেছ আমি আমার কাজ তার চেয়ে বেশি ভাল করে শিখতে পেরেছি। আমার মনে হয় আমরা দু'জনই যার যার পেশায় সেরা হয়ে উঠছি।'

'কী আর আমি বলবো, মহামন্য রানী? আমার প্রাণ আপনি বাঁচিয়েছেন, যখন--'

'যেমন তুমি একদিন আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে। তোমার হাতের দিকে তাকাও, মনে পড়বে। আজও, বন্ধু, রামেস, আরও ভয়ঙ্কর এক কুমীরের পেটে যাওয়া থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করেছ।'

'আমি তেমনই অনুমান করছিলাম, রানী। আর সে-কারণেই মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল। এটা না হলে ওকে হয়তো মাটিতে ছুঁড়ে ফেলেই ছেড়ে দিতাম। ঐ কুমীর এখন আর কোন মেয়েকেই গিলে খেতে পারবে না।'

'না,' বললো তুয়া। 'কিন্তু আমার আশঙ্কা মিশর আর কেশ রাজ্যের মধ্যে ঝামেলা বাধতে যাচ্ছে। আর সুস্থ হয়ে ফারাও কী বলবেন তা আমি জানি না। দেবতারা আমাকে তাঁর ক্রোধ থেকে রক্ষা করুন।'

'মহামান্য রানী, আমার ভাগ্যে কী ঘটবে? আমি ছোট মাপের এক সেনাকর্মকর্তা, তার ওপর ভয়ানক এমন কাজ করেছি! সেই আমাকে করা হয়েছে এই অভিযানের সেনাপতি। আমাকে কি পথেই হত্যা করা হবে? নাকি আমাকে হত্যা করার জন্যে কেশ-এর রাজার হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে?'

'পথেই যদি তোমাকে হত্যা করা হয়, রামেস, আমি বলছি কোন দেবতাও যদি তা করেন, তাকে হিশেব দিতে হবে আমার কাছে। আর কেশ-রাজের প্রতিশোধ?–তোমার সঙ্গে দু'হাজার বাছাই করা সৈনিক থাকছে, পথেও প্রয়োজন মত সৈন্য সংগ্রহ করতে পারবে। শোন এখন যা বলবো তা রাজাজ্ঞায় বা একটু আগে যে চিঠি লিখলাম তাতে নেই–,' ঝুঁকে ফিসফিস করে তুয়া বলে চললো, 'কেশ-এ মিশরের গুপ্তচর আছে। তাদের পাঠানো প্রতিবেদন আমি পড়েছি। সেখানকার জনগণ তাদের রাজাকে ঘৃণা করে। আমাথেল মারা যাওয়ার পর বুড়ো রাজা এখন একা। তার ওপর দিনের বেশির ভাগ সময় সে মদে ডুবে থাকে। সুতরাং কেশ-এ তোমাকে হত্যা করার মত অবস্থা যদি তৈরি হয়ও তুমি তাদেরকে সে-সুযোগ দেবে কেন?' শেষে অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে যোগ করলো, 'আমাথেলের বংশ যদি না থাকতো উত্তরাধিকারসূত্রে তুমিই হতে কেশ-এর রাজা, আর আমি বা আমার বংশ না থাকলে হয়তো মিশরের ফারাও হতে তুমি।'

বেশ কিছুক্ষণ মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকার পর মাথা তুললো রামেস। 'আমি তাহলে কী করবো?'

'মনে হচ্ছে অবস্থা বুঝে সেটা তোমাকেই ঠিক করতে হবে,' বললো তুয়া, ছাদের দিকে তার দৃষ্টি। 'তোমার জায়গায় আমি হলে আমি বুঝতাম কী করতে হবে। তবে একটা জিনিস কখনও করতাম না। কেশ-এর রাজাকে যদি তোমার বিচার করার সুযোগ দেয়া হয় তবে তার রায় কী হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। তার রায় যা-ই হোক না কেন, ফিরে আসলে মিশরের মানুষ সাড়ম্বরে সেনাদলসহ আমাকে স্বাগত জানাবে এ-ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমি মিশরে ফিরতাম না। না, আমি নাপাতায়ই থেকে যেতাম। শুনেছি চমৎকার নগরী নাপাতা। অসম্ভব সম্পদশালী। এক সময় মিশরেরই অংশ ছিল ঐ দেশ। ওখানে থেকে গিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতাম। এবং এর জন্যে এক সময়, আশাকরি, মিশরের মানুষ ক্ষমা করত আমাকে।'

'বুঝতে পেরেছি,' বললো রামেস, 'যা-ই ঘটুক দায় দায়িত্ব আমার

একার।'

'হ্যাঁ। এবং মনে রেখো আমাদের এই কথার কোন সাক্ষী নেই। তুমি কি অবসর সময়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চর্চা করছ, রামেস, যেমন আমি যুদ্ধবিদ্যা শেখার চেষ্টা করছি?'

কোন জবাব দিলো না রামেস। অদ্ভুত এই দুই ষড়যন্ত্রী একে অপরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো কেবল। একটু পরেই রামেস বললো, 'মহামান্য রানী নিশ্চয়ই ক্লান্ত। আমি এখন যাই।'

'পায়ের ঐ ক্ষত নিয়ে তুমি নিশ্চয়ই আমার চাইতেও অবসন্ন। যা-ই বলো, আজ রাতে আমরা দুজনই লড়াই করেছি, রামেস। কাল তুমি দূর দেশে যাচ্ছ। জানি না আর কখনও আমাদের দেখা হবে কিনা।'

'হ্যাঁ,' বললো রামেস। 'যা-ই হোক, আমার স্বার্থে আমাদের দেখা না হওয়াই ভাল। ও ভোরের তারা, আজ আমাকে বাঁচালেন কেন আপনি? আমি তো খুশি মনেই মরতে চাইছিলাম। আপনার কা কি আপনাকে বলেনি আমি খুশি মনে মরতে চাইছিলাম–আপনার কা কিংবা আমার জাদুকরী মা?'

'সেই যে মন্দিরে যখন আমরা খেলা করতাম তার পরে আর কখনও আমার কা-র কোন খোঁজ আমি পাইনি–আহ্, কী সুখের দিন ছিল তখন, তাই না, রামেস? আর তোমার মা এমনই বিবেচক মহিলা, কখনও তোমার সম্পর্কে কিছু বলেনি আমাকে। শুধু মাঝে মধ্যে সতর্ক করেছে যাতে তোমার প্রতি কখনও কোন রকম পক্ষপাতিত্ব না দেখাই, নইলে অন্যরা হিংসায় খুন করে ফেলবে তোমাকে। আচ্ছা, রামেস, আমাদের আর কখনও যদি দেখা না হয় খারাপ লাগবে তোমার? মনে হয় না। মরার জন্যে এবং আমার কাছ থেকে চলে যাওয়ার জন্যে এবং আমাদের দুজনের একসাথে যত স্মৃতি সব ভুলে যাওয়ার জন্য এমন ব্যস্ত হয়ে উঠেছ!'

হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হয়ে যেতে চাইল রামেসের। হৃৎপিণ্ডটা চলছে এখনও এটা বোঝার জন্যেই যেন বুকের ওপর হাত চেপে ধরলো ও। বিভ্রান্ত চোখে তাকালো এদিক ওদিক।

'তুয়া,' রুদ্ধশ্বাসে বললো রামেস, 'কিছুক্ষণের জন্য ভুলে যেতে পারো তুমি উচ্চ ও নিম্নভূমির রানী, হয়তো শিগগিরই ফারাও হবে, কেবল মনে রাখবে তুমি নারী, এবং নারী হিসেবে একটা গোপন কথা শুনে তা গোপন রাখবে?'

'আমরা গোপন কথাই আলোচনা করছি, রামেস, যেমন করতাম

অনেক আগে। আর রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তোমাকে যে গোপন কথা বলেছি তা তুমি প্রকাশ করবে না, তাহলে তোমার গোপন কথা আমি কেন প্রকাশ করব? তবে সংক্ষেপে বলো; দেরি হয়ে যাচ্ছে, বা বলতে পারো সময় নেই। আর তুমি তো জানো আমাদের আর দেখা হবে না।'

'বেশ, নেতের-তুয়া, আমি তোমার প্রজা হলেও সাহস করে বলছি, আমি তোমাকে ভালবাসি।'

'তাতে কী, রামেস? আমার লক্ষ লক্ষ প্রজাও তো আমাকে ভালবাসে।'

বিরক্ত ভঙ্গিতে হাত নাড়লো রামেস। 'ঐ ভালবাসার কথা বলছি না। একজন পুরুষ ও একজন নারীর যে ভালবাসা সেই ভালবাসার কথা বলছি।'

'আ!' নতুন, একটুখানি ভাঙা এক কণ্ঠে বললো তুয়া। 'সে তো অন্য কথা, তাই না? তাহলে শোন, রানী বলো, কৃষাণী বলো, সব নারীই চায় পুরুষের ভালবাসা। তাহলে রাগ করব কেন? রামেস, অতীতের মত এখনও তোমার ভালবাসার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

'কিন্তু এই ধন্যবাদ যথেষ্ট নয়। ভালবাসা তো বিলিয়ে দেয়া যায় না। ভালবাসা ধার দেয়া যায়, বিনিময়ে চাই চড়া সুদ। না, শুধু সুদ নয়, সুদ আসল কড়ায় গণ্ডায় ফেরত চাই। ও তারা! মিশরের রানীকে ভালবাসার মত উন্মাদ যে পুরুষ তার কী গতি হতে পারে?'

মারাত্মক সমস্যাটা নিয়ে একটু চিন্তা করলো তুয়া। শেষে নিচু কণ্ঠে বললো, 'কী জানি? কে জানে, হয়তো এর জন্যে তাকে প্রাণ দিতে হবে। অথবা, হয়তো–হয়তো সে রানীকে বিয়ে করে মিশরের ফারাও হবে। রানী লোকটার জন্য কতটুকু কী করতে পারবে তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করবে।'

বিকেলের বাতাসে নলখাগড়া যেমন কাঁপে তেমনি কেঁপে উঠলো রামেসের সারা শরীর। চোখ দুটো আগুনের মত জ্বলছে। 'তুয়া,' ফিস ফিস করে বললো সে, 'বুঝতে পারলাম না তোমার কথা। তুমি কি আমার ভালবাসা গ্রহণ করছ, নাকি আমাকে লজ্জা আর ধ্বংসের দিকে টানছো?'

কোন জবাব না দিয়ে তুয়া হাতির দাঁতে তৈরি ছোট রাজদণ্ডটা পাশে নামিয়ে রাখলো। পূর্ণ চোখে রামেসের চোখে চোখে তাকিয়ে দুহাত বাড়িয়ে দিলো তার দিকে।

'হ্যাঁ, রামেস,' কয়েক মুহূর্ত পরে কানের কাছে তুয়ার কোমল রিনরিনে কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো রামেস, 'আমার এই বুকে যা যা

আছে–ভালবাসা, অথবা গৌরব, অথবা লজ্জা, অথবা ধ্বংস অথবা আমাদের একজনের অথবা দু'জনেরই মৃত্যু সব কিছুর দিকে তোমাকে টানছি আমি। এই উঁচু বাজির জুয়াখেলা তুমি খেলবে?'

'এ-প্রশ্নের উত্তর তুমি জানো, তুয়া, তুমি জানো; আমাকে আর জিজ্ঞেস কোরো না।'

রামেসের ঠোঁটে চুমু খেলো তুয়া। সেই চুমুতে তার সম্পূর্ণ হৃদয় আর সমস্তটা যৌবন অনুভব করতে পারলো রামেস। তারপর খুব আস্তে তাকে বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে পেছনে সরিয়ে দিলো তুয়া। 'দাঁড়াও, তোমার সাথে কথা আছে। আগেই বলেছি, সময় খুব কম। শোন, রামেস, তুমি ঠিকই বলেছ, আমি জানি, সবসময়ই নিতাম, তুমি আরেকটু কম বোকা হলে তুমিও জানতে, তুমি আমাকে ভালবাস, আমিও তোমাকে ভালবাসি। মানুষের আত্মা যেখানে তৈরি হয় সেখান থেকেই এটা নির্ধারিত। শুরু থেকেই এটা নির্ধারিত শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত থাকবে। তুমি মিশরের এক ভদ্রলোক, মিশরের রানীকে ভালবাস, এবং সে তোমার অন্য কোন পুরুষের নয়। নিয়তি এটাই নির্ধারণ করে দিয়েছে। এটা তাঁরই বিধান, যাঁর নির্দেশে একই দিনে আমাদের জন্ম হয়েছে এবং একই বুকের দুধ খেয়ে আমরা বেড়ে উঠেছি। বেশ, যাহোক, অসুবিধা কী? ভালবাসা যদি আমাদের জন্য মৃত্যুই নিয়ে আসে, আসবে মৃত্যু, তার পরেও ভালবাসা বেঁচে থাকবে। মৃত্যুর পরেও অনেক কিছু আছে।'

'ব্যস, এ-টুকুই আমি চাই, তুয়া। আমি একজন নারীকে চাই, সিংহাসন নয়। আমার কারণে হয়তো উচ্চাসন ছেড়ে তোমাকে নেমে আসতে হবে।'

'তুমি যে নারীর কথা বলছো, সিংহাসন তার সঙ্গে থাকবে, তাদেরকে আলাদা করা যাবে না। কিন্তু, একটা কথা আমার মনে এলো, বল তো, যদি এমন হয়, আমি সাধারণ এক নারী, আমার এই দেহ আর মন ছাড়া কিছুই নেই, অন্যদিকে তুমি বসে আছ সিংহাসনে তাহলেও কি তুমি আমাকে ভালবাসবে, রামেস?'

'কেন এমন কথা বলছ?' অস্থির কণ্ঠে বললো রামেস। 'বোকার মত এই কথা। আমি আবার কোন সিংহাসনে বসবো?'

রামেসের এই কথায় মুহূর্তে বদলে গেল তুয়ার চেহারা। গলে পড়া আবেগাক্রান্ত নারীর বদলে আবার সে হয়ে উঠলো কঠিন-হৃদয় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রানী। 'রামেস,' বললো সে, 'তুমি বুঝতে পারছ, আমার হৃদয় ছিঁড়ে গেলেও কেন তোমাকে অত দূরের দেশে এতসব বিপদের

মধ্যে পাঠাচ্ছি? তোমার জীবন বাঁচানোর জন্যেই এই কঠিন কাজ করতে হচ্ছে। আজ রাতে যেভাবে ঐ ঘটনা ঘটেছে তাতে আমি এই বুদ্ধি বের না করলে আরও দু'ঘণ্টা আগেই তুমি মারা যেতে। পারিষদবর্গ আর অভিজাতদের অনেকেই তোমাকে অপছন্দ করে। তাছাড়া ফারাও সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন–দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করি তা-ই তিনি উঠুন–সুস্থ হয়ে দায়িত্ব নিয়ে তিনি আমার সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিতে পারেন।'

'এসবই আমি বুঝতে পেরেছি, রানী।'

'তাহলে জেগে ওঠো, রামেস, সামনে তাকাও ভবিষ্যৎটাও বোঝার চেষ্টা কর। আমি শক্তিশালী এক সেনাদল দিয়ে দিচ্ছি তোমার সাথে? কেশ-এর রাজা বুড়ো আর দুর্বল। তাছাড়া তার মুকুটের ওপর তোমার একটা দাবি আছে। ছিনিয়ে নাও মুকুটটা, পরে নাও মাথায়, এবং কেশ-এর রাজা হিসেবে মিশরের রানীর পাণিপ্রার্থনা কর। কে তখন তোমাকে না করবে? মিশরের রানী তো করবেই না, জনগণও না–হারানো দক্ষিণদেশ ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ওদের অনেক দিনের।'

কথাগুলো যখন বলছে এমন এক গৌরবময় আভিজাত্য ফুটে উঠলো তার চেহারায়, রামেসের মাথা আপনিই নুয়ে এলো। তুয়া তার বিচারের পাল্লায় তাকে ওজন করছে, এটা বুঝতে পেরে পরমুহূর্তে সচেতন হলো সে। সোজা হয়ে বললো·

'আমেনের ভোরের তারা, এটা সত্যি যে এখন আমার পিতা এবং আমি তোমার সামান্য প্রজা, কিন্তু আমাদের রক্ত তোমার মতই উঁচু মর্যাদার, হয়তো বা তোমার চাইতেও প্রাচীন। এটাও সত্য, যে আমাথেল আজ মারা গেছে তার চাইতে আমার পিতার পরে আমারই কেশ-এর সিংহাসনের ওপর দাবি বেশি। রানী, আমি তোমার কথা শুনেছি। সেই কথা মতই আমি কাজ করব, ঐ কথার গুণে নয়, তোমাকে পাওয়ার জন্য। যদি আমি ব্যর্থ হই, জানবে আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করে মারা গেছি। রানী, এবার বিদায় দাও। অনেক দূরের পথে যাচ্ছি, হয়তো আর কখনও দেখা হবে না। তুমি তোমার ভালবাসা দিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছ, সেই সাহসে আমি তোমার কাছে একটা প্রতিশ্রুতি চাইব, শুধু নারী হিসেবে নয়, রানী হিসেবেও প্রতিশ্রুতি দেবে, পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, যত রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতাই আসুক না কেন, আমি বেঁচে থাকতে অন্য কোন পুরুষকে তুমি স্বামী হিসেবে গ্রহণ করবে না–যৌতুক হিসেবে অর্ধেক পৃথিবী দিতে চাইলেও না।'

'দিলাম প্রতিশ্রুতি,' জবাব দিলো তুয়া। 'দূরদেশে বসে যদি শোন আমি অন্য কোন পুরুষকে বিয়ে করেছি তাহলে নারী হিসেবে আমাকে থুতু দিও, আর রানী হিসেবে আমাকে ত্যাগ কোরো, পারলে ক্ষমতাচ্যুত কোরো। তুমি আমার কথা রেখো, রামেস, আমি তোমার কথা রাখব। যে দায়িত্ব তোমাকে দিয়েছি তা পালন কোরো। আর কিছু আমার বলার নেই। বিদায়, রামেস। এসো, এবার আমাদের রাজকীয় চুক্তিতে মোহর মেরে দাও।'

হাতের রাজদণ্ডটা বাড়িয়ে ধরলো তুয়া। রামেস বিশ্বস্ত প্রজা হিসেবে চুমু খেলো তাতে। এরপর দ্রুত হাতে তুয়া তার মাথা থেকে সোনার শিরোহার খুলে রামেসের মাথায় ছোঁয়ালো। এর অর্থ রানী তার রাজাকে অভিষিক্ত করলো। শিরোহার রামেসের কপালে ছুঁইয়ে রেখেই তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো তুয়া আনুগত্যের নিদর্শন হিসেবে। তারপর মাথার মুকুট আর হাতের রাজদণ্ড ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সাধারণ নারীর মত ঝাঁপিয়ে পড়লো প্রেমিকের বুকের ওপর। ঠিক সেই সময় ভোরের প্রথম সূর্যরশ্মি পুবের জানালা দিয়ে ছিটকে এসে পড়লো দুজনের ওপর। মনে হতে লাগলো গৌরবময় অগ্নিশিখার এক চাদর মুড়ে দিলো দুজনকে।

খুবই অল্প সময় দুজন ঐ ভাবে রইলো। কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখা গেল দিনের প্রথম আলোয় আলোকিত কামরায় রাজকীয় আসনে বসে তুয়া তাকিয়ে আছে রামেসের অপসৃয়মান মূর্তির দিকে। হৃদয়টা তার ভারি হয়ে আছে। ভাবছে আর কখনও কি দেখা হবে?

৭
তুয়ার মেমফিসে আগমন

তাড়াহুড়ার মধ্যে যে কটা জাহাজ ও সৈন্য জোগাড় করা গেছে তা নিয়ে সেদিনই তাকেনশিতের পথে রওনা হয়ে গেল রামেস। সেখানকার সীমান্ত-দুর্গে অপেক্ষা করলো সে বাকি সৈন্য, রসদ, নিহত আমাথেলের মমি করা দেহ ও অন্যান্য জিনিসের জন্য। এসব পৌঁছানোর পর একটুও দেরি না করে তার বাহিনীসহ শুরু করলো দক্ষিণের পথে দীর্ঘ যাত্রা। যথাসম্ভব দ্রুত এগোনোর চেষ্টা করতে লাগলো সে যাতে করে ছেলের নিহত হওয়ার সংবাদ কেশ-রাজের কাছে পৌঁছানোর আগেই সে নাপাতায় উপস্থিত হতে পারে।

তুয়ার সঙ্গে আর কোন কথা হয়নি ওর। তবে থিবি ছেড়ে আসার সময় ওর জাহাজগুলো যখন প্রাসাদ-প্রাচীরের নিচ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল ও দেখতে পায়, প্রাসাদের যে দিকটায় রানীর ঘর সেদিকের এক জানালায় শাদা পোশাক পরা এক অবয়ব তাদের নৌ-বহরের দিকে তাকিয়ে আছে। অবয়বটা ছায়ায় থাকায় রামেস তার মুখ দেখতে পায়নি, তবে তার হৃদয় তাকে বলেছে, ঐ অবয়ব রানী ছাড়া কারো নয়, ওকে বিদায় জানানোর জন্য দাঁড়িয়েছে ওখানে।

পায়ের জখম সত্ত্বেও পাটাতনের ওপর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো রামেস। তলোয়ার উঁচু করে অভিবাদন জানালো প্রাসাদ-জানালার অবয়বটার উদ্দেশ্যে। তার নির্দেশে জাহাজের দাঁড়ী ও সৈনিকরাও তাদের দাঁড় ও অস্ত্র উঁচু করে একইভাবে অভিবাদন জানালো। জানালার মূর্তিটা সামান্য ঝুঁকে জবাব দিলো অভিবাদনের। রামেস এগিয়ে চললো তার বিধিলিপি পূর্ণ করতে, পেছনে রইল আমেনের ভোরের তারা নেতের-তুয়া তার বিধিলিপি পূর্ণ করার জন্য।

সেদিন বাবা মার্মিস এবং মা আসতি রামেসের সাথে দেখা করেছিলেন। 'অদ্ভুত এক নক্ষত্রের ঘরে জন্ম তোমার, বাবা,' মার্মিস বলেছিলেন। 'জানি না এই নক্ষত্র কোথায় তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে। প্রার্থনা করি, ওটা যেন আকাশে ক্ষণিকের জন্যে জ্বলে ওঠা উল্কা না হয়ে নক্ষত্র হয়। রানী যে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন তোমাকে তা নিয়ে সবাই কানাকানি করছে। তাঁর পাণিপ্রার্থীকে হত্যা করার পরও তোমাকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে একটা বাহিনীর প্রধান করে দূরদেশে অভিযানে পাঠানো শুধু নয়, বেশ কিছুক্ষণ গোপনে তোমার সঙ্গে কথাও বলেছেন। এমন সম্মান কজনে পায়? আমি জানি না, নিয়তি আমাকে এড়িয়ে তোমার তরুণ হাতে পাশার যে গুটি তুলে দিয়েছে তা কীভাবে পড়বে, বা তা দেখার জন্য আমি বেঁচে থাকব কিনা।'

'এমন অশুভ কথা বলছ কেন, বাবা,' বিচলিত কণ্ঠে বললো রামেস। 'আমার তো মনে হয় আমিই বেঁচে থাকব না। যে অসম্ভব দায়িত্ব নিয়ে যাচ্ছি–শক্তিশালী এক রাজাকে আমার হাতে তার একমাত্র ছেলের নিহত হওয়ার সংবাদ দেয়া–এর পরিণতি কী হতে পারে কেউ বলতে পারে? মা, তোমার তো অনেক জ্ঞান, অনেক পড়া-লেখা, আমাদের চোখ যা দেখতে পায় না তোমার চোখ তা পায়। আমাদের পিতা-পুত্রকে আশা দেয়ার মত কোন কথা কি তোমার কাছে নেই?'

'বাবা, আমি ভবিষ্যৎ খুঁজে দেখেছি,' বললেন আসতি, 'কিন্তু আমার সমস্ত পারদর্শিতা দিয়েও তেমন কিছু জানতে পারিনি। সামান্য

যা জেনেছি তা ভালয় মন্দয় মেশানো। তোমার সামনে বিশাল সম্ভাবনা আর সৌভাগ্য। আমার সাথে তোমার আবার দেখা হবে। তবে তোমার বাবাকে চিরবিদায় জানিয়ে যাও।'

মায়ের শেষ কথাটায় রামেসের বুক ভেঙে যেতে চাইল। বাবাকে সে অসম্ভব ভালবাসে। চোখের পানি লুকানোর জন্যে সে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো। মার্মিস তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'দুঃখ কোরো না, বাপ। আমাদের নিয়তি এক বিরাট রহস্য। অনেকে বলেন, মানুষ স্রোতধারার বুদ্বুদের মত, স্রোতেই তা হারিয়ে যায়; আকাশের মেঘের মত আকাশে জন্মে আকাশেই হারিয়ে যায়। আমি এমন ধারণায় বিশ্বাসী নই। আমি মনে করি দেবতারা এই মাংসের পোশাক পরিয়ে আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। আমাদের ভেতরে যে আত্মা আছে তা শুরু থেকেই আছে এবং শেষ পর্যন্ত থাকবে। এই বিশ্বাস থেকেই আমি প্রাণ ধরে রাখার জন্য লালায়িত নই, মৃত্যুতেও ভীত নই। কারণ আমি বিশ্বাস করি আমাদের জন্যে তৈরি আছে অমরত্বের রাজ্য। জীবন-মৃত্যু সেই রাজ্যে প্রবেশের দরজামাত্র। তোমার মা এবং আমার কাছ থেকে তুমি রাজরক্ত পেয়েছ। রাজরক্ত সত্ত্বেও আমরা সাধারণ জীবন যাপন করে গেছি, কিন্তু তোমার ভাগ্য হতে পারে অন্য রকম। তুমি এগিয়ে যাও অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য তোমার সৌভাগ্যের পথে, আর আমি আমার ভাগ্য নিয়ে চলে যাব আমার সমাধিতে। তোমার বিজয়, তোমার ক্ষমতায় আরোহণ দেখে যাওয়ার ভাগ্য আমার হবে না; তোমার বিজয়ী পদভারে আমার ঘুমও ভাঙবে না।

'তবু, রামেস, মনে রেখো, বিজয়ীর বেশে ফিরে এসে সোনার গালিচার ওপর দিয়েও যদি হাঁটো আর সব সময় শত্রু তোমার সামনে নতমুখ থাকে, যদি ভালবাসা তোমার চিরসাথী বা মাথার মুকুট হয়, তোষামোদ মন্দিরে ধূপের ধোঁয়ার মত তোমার চারপাশে সুগন্ধ বিলাতে থাকে তবু তোমাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাধিগৃহের পথে যেতে হবে, বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। বড় হও যদি পারো, তবে বড় হওয়ার পাশাপাশি ভালও হতে হবে। তোমার শক্তি আছে বলেই অপছন্দের লোককে হত্যা কোরো না, অসহায় আর সহজেই কেনা যায় বলে কোন নারীর অসম্মান কোরো না। মনে রেখো, যেদিন দুনিয়ায় মানুষের কাজকর্মের হিসাব নেয়া হবে সেদিন রাস্তায় খেলা করে বেড়ানো ভিক্ষুক শিশুর ভাগ্যও তোমার চেয়ে বেশি ভাল বলে প্রমাণিত হতে পারে। রামেস, বাপ আমার, রওনা হয়ে যাও, আমার আশীর্বাদ থাকছে

তোমার জন্যে। এমন আচরণ কোরো যাতে যিনি আমাদের সবাইকে এই রূপ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর আশীর্বাদও থাকে তোমার সঙ্গে। বিদায়।'

রামেসকে টেনে নিয়ে কপালে চুমু খেলেন মার্মিস। তারপর বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। এর পর আর কখনও দেখা হয়নি দুজনের। তবে আসতি আরও কিছুক্ষণ থাকলেন। রামেসের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, শোক কোরো না। পিতা-পুত্রের এমন বিচ্ছেদ নতুন নয়। মৃত্যুও নতুন নয়। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীর মানুষ এই সব দুঃখ শোক ভোগ করে আসছে, সামনেও লক্ষ লক্ষ বছর ভোগ করবে। সামনের দিনগুলো ভাল হলে তা পুরোপুরি উপভোগ কোরো। দিন খারাপ হলে ধৈর্য ধরে থেকো। পাপ ছাড়া অন্য কোন কিছুর জন্যে অনুশোচনা কোরো না, কোন কিছুকে ভয় পেয়ো না। কোন কিছু আশা কোরো না, কারণ, সবকিছুই নির্ধারিত হয়ে আছে, কোন কিছুই তা থেকে বদলাবে না।'

'বুঝেছি,' শান্তকণ্ঠে বললো রামেস। 'তোমাদের একটা কথাও ভুলবো না। এই বিশ্বাস রেখো, আমি সফল হই আর ব্যর্থ হই, আমার জন্যে তোমাদের লজ্জায় পড়তে হবে না।'

চলে যেতে গিয়েও আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন ওর মা। 'তোমার জন্যে একটা উপহার আছে আমার কাছে। যে দিয়েছে তার নাম বলা যাবে না।'

'কই, দাও,' ব্যাকুল কণ্ঠে বললো রামেস। 'আমার ভয় হচ্ছিল সব বোধহয় স্বপ্ন'

'ও,' বললো আসতি, 'তাহলে স্বপ্ন একটা আছে? কখন দেখলে? কাল রাতে যখন আমার পালিত-কন্যা, আমেনের কন্যা তোমাকে গোপন কথা বলছিল সেই সময়?'

'উপহারটা দাও, মা,' হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো রামেস।

মুচকি হেসে বুকের কাছে পোশাকের ভেতর হাত ঢুকিয়ে লিনেনে মোড়া একটা কিছু বের করে আনলেন আসতি। ওটার সঙ্গে আটকানো রাজকীয় মোহরটা কপালে ছুঁইয়ে তুলে দিলেন রামেসের হাতে। মোহর ভেঙে লিনেনের মোড়ক খুলে রামেস দেখলো একটা আংটি। সোনায় তৈরি আংটির ওপর খোদাই করা সূর্যের প্রতীক, যার দুপাশে নতজানু হয়ে আছে এক নারী ও এক পুরুষ, তাদের মাথায় মিশরের জোড়-মুকুট আর হাতে জীবনের প্রতীক চিহ্ন, বাড়িয়ে ধরা সূর্যের দিকে।

আংটিটা ঠোঁটে চেপে ধরলো রামেস। আসতি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'অনেক অনেক বছর আগে কে এই আংটি পরতেন জানো?'

মাথা নাড়লো রামেস। ওর শুধু এটুকুই মনে পড়ে, তুয়া পরতো এই আংটি।

'তোমার এবং আমার পূর্বপুরুষের আংটি এটা, রামেস। তিনি ছিলেন আমাদের বংশের শেষ শাসক, মিশর ছাড়াও কেশ রাজ্য ছিল তাঁর শাসনাধীন। কয়েকদিন আগে মমিকাররা তাঁর দেহ নতুন করে বস্ত্রে আবৃত করেছে। তোমার বাবা এবং আমি ছাড়াও রাজকুমারী উপস্থিত ছিল সেখানে। মমিদেহের হাতে দেখে আংটিটা খুলে নিয়ে তোমার বাবাকে দিতে চেয়েছিল তুয়া। কিন্তু রাজ-অঙ্গুরী বুঝতে পেরে মার্মিস ওটা নেয়নি। তখন তুয়া নিজের আঙুলেই আংটিটা পরে নিয়েছিল। এখন পাঠিয়েছে তোমার কাছে। হয়তো তুমি কেশ-এ যাচ্ছ বলেই সেখানকার কর্তৃত্বের নিদর্শন হিসেবে আংটিটা তোমাকে দিয়েছে–এই চিহ্ন কেশ রাজ্যে খুবই পরিচিত।'

'ধন্যবাদ রানীকে,' বিড়বিড় করে বললো রামেস। 'আমি সব সময় এটা পরে থাকব।'

'সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বুকে পোশাকের নিচেই পোরো, নইলে কেউ হয় তো এটা দেখে এমন কিছু জিজ্ঞেস করে বসবে যার জবাব দেয়া কঠিন হবে তোমার জন্যে।' একটু থেমে আসতি আবার বললেন, 'তুমি আমাদের এই রানীকে ভালবাসার দুঃসাহস করেছ!'

'হ্যাঁ, মা। তুমি তো সবই জানো, এটা জানতে না? আর এর দোষ তোমারও, তুমিই আমাদের দুজনকে একসাথে বড় করেছ।'

'না, বাপ, দোষ দেবতাদের, যাঁরা এভাবে তোমাদের বিধিলিপি তৈরি করেছেন। কিন্তু ও কি তোমাকে ভালবাসে?'

'তুমি তো সবসময় ওর পাশে পাশে থাকো, দরকার হলে নিজেই ওকে জিজ্ঞেস কোরো। অন্তত ও ওর আংটি পাঠিয়েছে আমাকে। ওহ, মা, ওকে তুমি দেখে রেখো। দিন-রাত চোখে চোখে রেখো। ওর যদি কিছু হয় আমি বাঁচব না। মা, সাধারণ নারীরা ইচ্ছা মত বিয়ে করতে পারলেও রানীরা তা পারে না। রাষ্ট্রীয় নীতি দিয়ে ঠিক হয় রানী কাকে বিয়ে করবে না করবে। মা, দেখো, ও যেন অবিবাহিত থাকে। সিংহাসনও যদি বিসর্জন দিতে হয় তবু যেন অপছন্দের কাউকে বিয়ে করতে না হয়। এরকম পরীক্ষার মধ্যে যদি ওকে পড়তে হয়, যদি দেখ ও বিভ্রান্ত হচ্ছে, দেবতারা ওকে ছেড়ে যাচ্ছেন, ওকে শক্তি যুগিও,

তোমার সব যাদুর ক্ষমতা দিয়ে ওকে রক্ষা কোরো।'

'আমি আমার যথাসাধ্য করব, বাপ। এই দিনটি যে আসবে তা আমি আগেই জেনেছি। প্রার্থনা করি মৃত্যুর আগে আমি যেন তোমাকে পূর্বপুরুষের সিংহাসনে ক্ষমতার মুকুট পরা অবস্থায় দেখে যেতে পারি। পৃথিবীর কেউ যে ভালবাসা ও সৌন্দর্যের সান্নিধ্য পায়নি তখন তোমার সঙ্গে থাকবে তা। কে জানে মিশরে ফিরে আসা তোমার আর হবে কি না। আরেকটা কথা, সবসময় তোমার রাজকীয় নক্ষত্রের নির্দেশ মত চলবে। ও যে পরামর্শ দিয়েছে তা-ও মেনে চলবে অক্ষরে অক্ষরে। আমি বলছি, জেনে রাখ, ওর ঐ বুকে রয়েছে দেবতাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা।'

রামেসের কপালে হাত ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন আসতিও।

রামেস রওনা হয়ে যাওয়ার পর অল্প দিনেই চাপা পড়ে গেল তার হাতে কেশ যুবরাজের নিহত হওয়া এবং কুমারী রানীর নির্দেশে সেই যুবরাজের মমিদেহ নাপতায় তার পিতার কাছে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব রামেসেরই কাঁধে বর্তানোর ঘটনা। তুয়াও তার মনের কথা দক্ষতার সঙ্গে গোপন রাখলো। সেই রাতে নাপাতা অভিযানের জন্যে নিয়োগ করা তরুণ সেনাপতির সঙ্গে তার সাক্ষাতের কথা কেউ জানতে পারেনি। তাছাড়া নাপাতা এত দূরের পথ যে সেখানে পাঠানো সেনাদলের ফিরে আসতে–যদি তারা ফিরতে পারে–অন্তত দু'বছর লেগে যাবে। কেউ কেউ বলাবলি করলো, ঐ সৈন্যদের কেউ যদি ফিরে আসে তবে তাদের মধ্যে রামেস অবশ্যই থাকবে। কেউ কেউ এমনও কানাঘুষা করলো, শিগগিরই, ওরা সীমান্ত অতিক্রম করার পরপরই রামেসকে হত্যা করে সৈন্যরা শান্তি-প্রস্তাবের অংশ হিসেবে তার লাশ নিয়ে যাবে নাপাতায়–সেরকমই নির্দেশ আছে তাদের ওপর।

তবে রানীর প্রজ্ঞার প্রশংসা করলো সবাই। যে কৌশলে সে সামান্যতম কেলেঙ্কারি ঘটতে না দিয়ে নিজের দুধ-ভাইয়ের রক্তে হাত রাঙানো থেকে নিজেকে রক্ষা করেছে তাকে এক অনন্য নজির হিসেবে গণ্য করা হতে লাগলো। বলা হলো, সঙ্গে সঙ্গে রামেসকে হত্যা করার নির্দেশ দিলে সবাই এমন ধারণা করত যে তার দেহে রাজরক্ত আছে বলেই ভবিষ্যতে সিংহাসনের দাবিদার হয়ে উঠতে পারে এই আশঙ্কায় তাকে শেষ করে দেয়া হলো।

এদিকে আরও বড় এক প্রশ্ন ঘুরছে মানুষের মুখে মুখে–ফারাও বি মারা যাবেন এবং রূপসী তরুণী নেতের-তুয়াই একক অধিকারী হবে

সিংহাসনের? তা যদি হয় তাহলে কী হবে? বিগত হাজার বছরে কোন নারী মিশরের সিংহাসনে বসেনি। তার আগে যারা বসেছে তাদের মধ্যে অবিবাহিত একজনও ছিল না। সুতরাং, প্রজারা মনে করতে লাগলো, যত শিগগির সম্ভব তার জন্যে একজন স্বামী খুঁজে বের করা দরকার।

কিন্তু ফারাও মারা গেল না। বরং খুব ধীরে হলেও তিনি সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। প্রায় তিন মাস শিশুর মত শুয়ে থাকলেন তিনি। এই পুরোটা সময় মেতে রইলেন শিশুর মতই তুচ্ছ বিষয়-আশয় আর খেলা-ধুলা নিয়ে। ছেলেবেলায় যাদের সাথে খেলা করেছেন তাদের কেউ দেখা করতে এলে তাদের ধরে বসেছেন বল বা লাটিম খেলার জন্যে।

তারপর একদিন হঠাৎ করেই সব বদলে গেল। বিছানা থেকে উঠে পারিষদবর্গকে ডাকার আদেশ দিলেন ফারাও। তাঁরা আসার পর জানতে চাইলেন, কী ঘটেছে, এবং কেন তিনি সেই ভোজের পর আর কিছু মনে করতে পারছেন না? পারিষদরা ছেলে ভুলানোর মত করে নরম নরম কথা বলে ফারাওকে ভুলানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। বিরক্ত হয়ে ফারাও তাদের বিদায় করে ডেকে পাঠালেন আমেন মন্দিরের রক্ষীদলনেতা তার বন্ধু মার্মিসকে।

'শেষ যা আমার মনে পড়ে তা হলো কেশ-এর যুবরাজ মাতাল অবস্থায় তোমার ছেলে, সুদর্শন টগবগে তরুণ রামেসের সাথে লড়াই করছে,' বললেন ফারাও। 'কে যে সেদিন ওকে যুবরাজের খাদেমদার হিসেবে নিয়োগ করেছিল! নিশ্চয়ই লোকটা গর্দভ, নয়তো এর মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র আছে–কে না জানে কেশ-এর বর্তমান রাজাদের চাইতেও প্রাচীন ও অভিজাত তোমাদের রক্ত। যাহোক, যখন দেখলাম আমার রাজকীয় অতিথি, আমার মেয়ের প্রাণিপ্রার্থী আমারই সেনাবাহিনীর এক কর্মকর্তার সাথে লড়ছে, আতঙ্কে আমি অস্থির হয়ে গেলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই। তুমি বলবে কী হয়েছিল তার পর?'

'মহামহিম ফারাও, তারপর যা ঘটলো–আমার ছেলে ন্যায্য লড়াইয়ে আমাথেলকে হত্যা করে। এরপর ঐ কালো ন্যুবিয়ান দৈত্যগুলো আপনার রক্ষীদের ওপর হামলা চালায়। সেখানে মিশরীয় সৈনিকরা সংখ্যায় কম থাকলেও রামেসের নেতৃত্বে তারা পরাজিত করে ন্যুবিয়ানদের। ওদের বেশির ভাগই নিহত হয়। সৈনিক হিসেবেই বুড়ো হলাম, কিন্তু, মহানুভব, এমন শৌর্যময় লড়াই আর দেখিনি!'

'শৌর্যময় লড়াই!' ঢোক গিলে বললেন ফারাও, 'তার অর্থ তো

কেশ রাজ্যের সঙ্গে মিশরের যুদ্ধ। তারপর? নিশ্চয়ই রাজপরিষদ রামেসকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। তুমি ওর বাবা হলেও নিশ্চয়ই স্বীকার করবে এই শাস্তি ওর প্রাপ্য।'

'না, মহানুভব, তেমন কিছু ঘটেনি। আর আমি কিছু স্বীকারও করছি না। তবে ও যদি সারা মিশরের সব অভিজাত মানুষদের সামনে কাপুরুষের কাজ করত ওকে আমি খুশি মনেই নিজের হাতে হত্যা করতাম।'

'আঁ! একই সঙ্গে সৈনিক এবং পিতা হিসেবে কথা বলছ তুমি!' ফারাও বললেন। 'বুঝতে পেরেছি। ঐ কাল লোকটা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ওকে অপমান করেছিল, তাই না? তোমার জায়গায় আমি হলেও একথাই বলতাম। কিন্তু তারপর হলো কী?'

'মহানুভব ফারাও অচেতন হয়ে পড়ার পর মহামান্য রানী নেতের-তুয়া, গৌরবে যিনি রা-য়ের মত, তাঁর অভিষেকের শপথ অনুসারে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তিনি বাছাই করা দু'হাজার সৈন্যসহ কেশ রাজ্যে এক রাজকীয় দূতদল পাঠানোর নির্দেশ দেন। তারা পরদিনই নিহত যুবরাজের মমি করা দেহ ও প্রচুর রাজকীয় উপঢৌকন নিয়ে নাপাতার পথে রওনা হয়ে গেছে।'

'মন্দ নয় এ-সিদ্ধান্ত। কিন্তু দু'হাজার সৈন্য কেন? এর খরচ তো বিরাট, যেখানে বিশজন পাঠালেই চলত? এ তো দূতদল নয় সেনাদল। কেশ-এর রাজা যখন তার পুত্রের মৃতদেহসহ এই সেনাদলকে আর রাজ্যের দিকে এগিয়ে আসতে দেখবেন, নিশ্চয়ই তিনি শঙ্কিত হয়ে যুদ্ধের নির্দেশ দেবেন।'

শ্রদ্ধার সঙ্গে মার্মিস স্বীকার করলেন যে সেটা সম্ভব।

'এই সেনাদল–তোমার ভাষায় দূতদলের নেতৃত্ব দিচ্ছে কে?'

'রামেস, মহানুভব, আমার ছেলে।'

সব দুর্বলতা সত্ত্বেও আসন থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ফারাও। 'রামেস! মানে ঐ গুণ্ডাটা, যে খুন করেছে যুবরাজকে! কেশ-এর পুরনো বৈধ রাজবংশের শেষ উত্তরাধিকারী রামেস! ছোট মাপের এক সেনা কর্মকর্তা রামেসকে দেয়া হয়েছে আমার দু'হাজার বাছাই করা সৈন্যের সেনাপতির দায়িত্ব! ওহ, আমার মাথা বোধহয় এখনও বিগড়ে আছে! কে তাকে এই দায়িত্ব দিয়েছে?'

'আমেনের তারা রানী নেতের-তুয়া। মহানুভব, মিলনায়তনে সেই লড়াইয়ের পরপরই তিনি এই রাজাজ্ঞা উচ্চারণ করেন। সে-সময় তা নিয়মমত লিপিবদ্ধও করা হয়েছে।'

'ডাকো রানীকে!' গম্ভীরস্বরে নির্দেশ দিলেন ফারাও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এলো তুয়া। বাবাকে সুস্থ মানুষের মত বসে থাকতে দেখে উৎফুল্ল হয়ে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো তাঁকে। অনেকক্ষণ কেবল তাঁর স্বাস্থ্য আর সুস্থ হয়ে ওঠার আনন্দ নিয়েই সে কথা বললো, রাষ্ট্রীয় কোন বিষয়ে কিছু বলতে দিলো না। অবশেষে ফারাও তাকে শান্ত করে তাঁর পাশে বসাতে পারলেন এবং আমেনের দোহাই দিয়ে প্রশ্ন করলেন কেন সে কাণ্ডজ্ঞানহীন তরুণ রামেসকে এতবড় এক সেনাদলের সেনাপতি করে কেশ-এ পাঠিয়েছে। তুয়া তার মধুরতম স্বরে সময় নিয়ে ধীরে ধীরে বলে গেল সেই রাতের সেই ভোজসভায় আমাথেল নিহত হওয়ার পর থেকে সে যা যা করেছে সব। তুয়ার কথা শেষ হওয়ার আগেই ফারাওয়ের দুর্বল দেহে যেটুকু শক্তি ছিল সব নিঃশেষ হয়ে গেল। মাথা নিচু করে মুহ্যমানের মত বসে রইলেন তিনি।

'এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ,' বললো তুয়া, 'দায়িত্ব আমার কাঁধে এসে পড়লো, এবং আমার কাছে যেটা সবচেয়ে ভাল মনে হয়েছে তা-ই আমি করেছি। ঐ সময় রামেসকে হত্যা করা সম্ভব ছিল না, কারণ সবার হৃদয় ছিল ওর পক্ষে।'

'কিন্তু, মা, তুমি তো ওকে নির্বাসনে পাঠাতে পারতে।'

'বাবা, তা-ই কি আমি করিনি? নাপাতায় পাঠানো আর নির্বাসনে পাঠানো একই কথা না? আমাকে বলা হয়েছে, বহু মাস লাগে ওখানে যেতে।'

'এরপর কী হবে, তুয়া? হয় কেশ-এর রাজা ওকে, এবং সেই সাথে আমার দু'হাজার সৈন্যকে হত্যা করবে, অথবা হয়তো ও-ই কেশ-এর রাজাকে হত্যা করবে, যেমন করেছে তাঁর ছেলেকে এবং দখল করে নেবে সিংহাসন। এই সম্ভাবনার কথা তুমি ভেবেছ?'

'ভেবেছি, বাবা। পরেরটা যদি ঘটে তাহলে কি মিশর খুব দুঃখ পাবে? তোমার কী মনে হয়?'

পূর্ণ চোখে তাকালেন ফারাও তুয়ার দিকে। মৃদু হাসি মুখে নিয়ে তুয়াও তাকিয়ে আছে বাবার দিকে।

'এতক্ষণে বুঝতে পারছি, মা,' ধীর কণ্ঠে বললেন ফারাও, 'একদিন তুমি মস্তবড় রানী হবে। নারীর নির্বুদ্ধিতার খাপের মধ্যে আমি দুর্দান্ত রাষ্ট্রনায়কের তরবারি দেখতে পাচ্ছি। কেবল একটা কথা, মা, এই তরবারি নিয়ে বেশি জোরে ছুটো না, নইলে এর ওপরে পড়েই নিজেকে টুকরো করে ফেলবে তুমি।'

এধরনের কথা আগে আসতির কাছেও শুনেছে তুয়া। বাবার কথার জবাব না দিয়ে মৃদু হাসলো কেবল ও।

'রাশ টেনে রাখার জন্যে একজন স্বামী দরকার তোমার,' বলে চললেন ফারাও, 'এমন একজন বড় মাপের মানুষ যাকে তুমি ভালবাসতে এবং শ্রদ্ধা করতে পারবে।'

'তেমন একটা মানুষ খুঁজে আনো, বাবা, খুশি মনেই আমি বিয়ে করব,' মধুরস্বরে বললো তুয়া।

সুতরাং আরেকটু শক্তি ফিরে পেয়ে ফারাও আবার মিশরের রানীর জন্যে যোগ্য একজন বর খোঁজা শুরু করলেন। আগের মতই পাণিপ্রার্থীরা নিজে অথবা দূত মারফত প্রস্তাব পাঠাতে লাগলো। আগের মতই প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছু খুঁত আবিষ্কার করলো তুয়া। শেষে লোকজন বলাবলি করতে লাগলো, কোন মানুষকে যখন পছন্দ নয়, নিশ্চয়ই কোন দেবতার সাথেই তার বিয়ে নির্ধারিত হয়ে আছে। এই কথা যখন তুয়ার কানে গেল সে মৃদু হেসে বললো, ওর জন্যে নির্ধারিত আছে এক রাজকীয় প্রেমিক, যার কথা আমেন স্বপ্নে তার মাকে বলে গেছেন। কোন দেবতা নয়, দেবতার পছন্দ করা প্রেমিক, যাকে দেখামাত্র সে চিনতে পারবে।

কয়েক মাস চলে গেল। তুয়ার এই খেলায় ক্লান্ত হয়ে ফারাও তাঁর পারিষদগণের পরামর্শ চাইলেন। তাঁরা বুদ্ধি দিলেন, তিনি মেয়েকে নিয়ে মিশরের বড় বড় সব নগরী ভ্রমণ করতে পারেন। এতে তাঁর স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হতে পারে, আর ভাগ্য ভাল হলে রানী নেতের-তুয়া রাজরক্ত শরীরে আছে এমন কারো দেখা পেয়ে তার প্রেমে পড়তে পারে। এর মধ্যে তাঁদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে প্রেমে না পড়লে সে বিয়ে করবে না।

সে-রাতেই ফারাও তাঁর মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন এই ধরনের ভ্রমণে যেতে তার আপত্তি আছে কিনা। তুয়া বললো, আপত্তির তো প্রশ্নই আসে না, বরং সে খুবই খুশি হবে ভ্রমণে যেতে পারলে। কারণ সে থিবিতে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয়ত এরকম ভ্রমণে মিশরের অন্য বড় নগরগুলো এবং সেসব জায়গার মানুষ এবং তাদের জীবন-পদ্ধতি নিজ চোখে দেখার সুযোগও পাওয়া যাবে। তাছাড়া সমুদ্র দেখার শখ তার বহুদিনের। সাগর বিশাল, নীলনদের সব পানি গিয়ে পড়ে সাগরে; এসব কথা সেই ছেটবেলা থেকে শুনে আসছে, দেখা হয়নি কখনও।

নির্ধারিত দিনে শুরু হলো পিতা-কন্যার তীর্থযাত্রা। যার কথা পরে

লেখা হয় নেতের-তুয়ার শাসনামলের ইতিহাসের অংশ হিসেবে তারই তৈরি করানো মন্দিরের দেয়ালে। ব্যক্তিগতভাবে তুয়ার ইচ্ছা ছিল প্রথমেই দক্ষিণের সীমান্ত অঞ্চলের দিকে যাবে। সে-ক্ষেত্রে রামেস ও তার অভিযান সম্পর্কে কোন সংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। অনেকদিন হলো তাদের কোন খবর রাজপ্রাসাদে আসেনি। কিন্তু এই প্রস্তাব শুরুতেই নাকচ হয়ে গেল। কারণ, দক্ষিণে কোন বড় শহর নেই। তাছাড়া, সীমান্ত এলাকার মরুচর অধিবাসীরা খুবই বেপরোয়া। ফারাও ও রানীর সফরের সময়টাকে তারা আক্রমণের সময় হিসেবে বেছে নিতে পারে।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো ওরা নীলনদের উজানে না গিয়ে ভাটির দিকে যাবে। তাতে করে প্রতিটি বড় শহর ও নগরভ্রমণ সম্ভব হবে। প্রথমেই পড়লো পবিত্র নগরী আটবু। ওসিরিসের মুণ্ড কবর দেয়া হয়েছে এই পবিত্র স্থানে। এছাড়াও মিশরের হাজার হাজার বীরপুরুষের সমাধিমন্দির রয়েছে এখানে। আটবুতে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে ওসিরিসের মন্দিরে তুয়াকে নতুন করে রানী পদে অভিষিক্ত করা হলো।

এরপর ওরা গেল অন-এ। সূর্যনগরী নামে পরিচিত এই শহরে রয়েছে মিশরের প্রাচীন রাজাদের আমলে তৈরি বিশাল কয়েকটি পিরামিড। এইসব পিরামিডে অর্ঘ্য দিলো তুয়া।

হাজার হাজার বছর আগে যে ফারাওরা মারা গেছেন, যাদের কীর্তির কথা এযুগের মানুষ ভুলে গেছে তাদের মমি করা দেহ দেখবার জন্য প্রতিটা পিরামিডে ঢুকলো নেতের-তুয়া। ফারাও অবশ্য ঢুকলেন না। কারণ, পিরামিডের ভেতরে পথ এত তির্যক ঢালে নেমে গেছে যে ঐ পথে হাঁটা তার দুর্বল শরীরে সম্ভব নয়। পরে তুয়া আসতিকে নিয়ে মরু অঞ্চলের আরব সর্দারদের সঙ্গে উটে চড়ে রাতে চাঁদের আলোয় সেগুলোর চারপাশে চক্কর দিয়ে দেখলো। আশা করছিল এসময় কোন মৃত রাজার প্রেতাত্মার সাক্ষাৎ পাবে। কিন্তু কোন প্রেতাত্মার দেখা সে পেলো না। আসতিকে অনুরোধ করলো তার ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে যেন ডাকেন কোন প্রেতাত্মাকে। রাজি হলেন না আসতি। বললেন, 'যেমন আছে তেমন থাকতে দাও ওদের। খামোকা ঘুম ভাঙালে আমেন যেমন রেগে গিয়েছিলেন তেমনি ওঁরাও রেগে যেতে পারেন। তাছাড়া ওঁরা এমন কিছু বলে বসতে পারেন যা মহামান্য রানীর পছন্দ হবে না। ওঁরা যে বিশাল কীর্তি গড়ে রেখে গেছেন দুচোখ ভরে শুধু দেখ তা।'

'এগুলোকে তুমি বিশাল কীর্তি বলছ?' গলায় ব্যঙ্গের সুর ফুটিয়ে তুলে প্রশ্ন করলো তুয়া। আসতি অনুরোধ না রাখায় ও যে রেগে গেছে

তা ওর কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল। 'পাথরের স্তূপ ছাড়া আর কী এগুলো? হাজার হাজার মানুষকে খাটিয়ে নিজেদের দম্ভ প্রকাশের চেষ্টা। যারা এগুলো তৈরি করিয়েছে তাদের কাহিনী কতটুকু টিকে আছে? কিছু কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছুই নেই। আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে দেখো এর চেয়ে বড় সৌধ আমি তৈরি করাব। মহাকালের মৃত্যুদিন পর্যন্ত ইতিহাস আমার কথা বলবে।'

'দেবতারা চাইলে তা হয়তো তুমি করাবে, নেতের-তুয়া; তবে আমি মনে করি প্রাচীন পাথরের এই স্তূপগুলোও ইতিহাসে টিকে থাকবে।'

পরদিন ফারাও এবং তার কন্যা আনুষ্ঠানিকভাবে শ্বেত-প্রাচীরে ঘেরা মেম্ফিস নগরীতে প্রবেশ করলেন। ফারাওয়ের সৎভাই নগরীর শাসক কুমার আবি রাজকীয় আনুষ্ঠানিকতায় তাঁদের স্বাগত জানালো। সেই যে তুয়ার জন্মের আগে আবি থিবিতে গিয়ে তাকে মিশরের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ঘোষণার দাবি জানিয়েছিল তার পর এই প্রথম দেখা দুই ভাইয়ের।

অন্য সব অভিজাত জমিদার ও রাজপুরুষের সঙ্গে আবিকেও নেতের-তুয়ার অভিষেক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আবি বার্তা পাঠিয়ে জানায়, সে অসুস্থ, তাই অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারবে না। আবির এই অসুস্থতা সত্যি না ভান তা বলা মুশকিল। তবে গুপ্তচর মারফৎ ফারাও খবর পেয়েছিলেন যে, কুমার তার শয়নকক্ষ ছেড়ে বেরোতে পারছে না। সে-সময় ফারাও ও তাঁর পারিষদরা একটু অবাক হয়েছিলেন আবি তার কোন ছেলের সঙ্গে তুয়ার বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়নি দেখে। আবির চার ছেলে। সম্ভবত প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই আবি কোন প্রস্তাব পাঠায়নি।

এমনিতে ফারাওয়ের সঙ্গে সেই সাক্ষাতের পর থেকে আবি ভালই তার অঞ্চল শাসন করে গেছে। নিয়মমত যথাসময়ে থিবিতে খাজনা পাঠিয়ে দিয়েছে, সঙ্গে থেকেছে আনুগত্যসূচক পত্র। শেষ দিকে এমনকি খাজনার পরিমাণ বাড়িয়েও দিয়েছিল আবি। ফলে অনেক আগেই সৎভাই সম্পর্কে সব রকমের সন্দেহ-অবিশ্বাস দূর হয়ে গিয়েছিল কোমলহৃদয় ফারাওয়ের। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন, তুয়ার জন্মের খবর পাওয়ার পর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আবি ত্যাগ করেছে।

ফারাওয়ের সঙ্গে রয়েছে মাত্র পাঁচশো সৈন্য। শান্তিকালীন সফরে এর চেয়ে বেশি সৈন্য সঙ্গে আনার প্রয়োজন বোধ করেননি। কিন্তু

নগরীতে ঢোকার সময় খেয়াল করলেন কেমন সুরক্ষিত এর প্রাচীর, কেমন মজবুত প্রাচীরের ফটকগুলো। নগরীতে প্রবেশ করার পর দেখলেন সুসজ্জিত সৈনিকরা সম্পূর্ণ সশস্ত্র অবস্থায় রাজপথে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে। বহুদিন আগে যে সন্দেহ দূর হয়ে গিয়েছিল তা আবার ফারাওয়ের মনে উঁকি দিতে শুরু করলো। তিনি এ-নিয়ে কিছু না বললেও রথের ওপর তাঁর পাশে বসা তুয়া চুপ রইলো না। রাজপথে জনতার স্বাগতধ্বনি ছাপিয়ে ফারাওয়ের কানে পৌঁছুলো তার কণ্ঠস্বর।

'বাবা, আমার এই কাকা দেখি রীতিমত রাষ্ট্র চালায় এই মেম্ফিসে!'

কোন সারথী নেই রথে। তবু ফারাও একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে নিলেন। 'না চালাবে কেন?' বললেন তিনি। 'ও যে এখানকার প্রশাসক, রাজপ্রতিনিধি।'

'নতুন আসা কেউ, যে সত্যি কথাটা জানে না, সে তো মনে করবে উনিই এখানকার রাজা। সোজাসুজি বলি, বাবা, আমি যদি ফারাও হতাম আর এখানে আসার কথা ভাবতাম তাহলে আরও বড় বাহিনী সঙ্গে রাখতাম।'

'যখন ইচ্ছে আমরা চলে যেতে পারব, তুয়া,' অস্বস্তির সঙ্গে বললেন ফারাও।

'উঁহু, বাবা, তোমার ভাইয়ের যখন ঐ বিশাল ব্রোঞ্জের ফটক খুলে দেয়ার ইচ্ছে হবে তখনই আমরা যেতে পারব, তার আগে নয়। আমরা ঢোকার পরপরই ফটক বন্ধ করে দেয়ার আওয়াজ আমি শুনেছি।'

এ-পর্যায়ে আলাপ শেষ করতে হলো পিতা-পুত্রীকে। বিশাল এক মিলনায়তনের সিঁড়ির কাছে পৌঁছেছে রথ। এখানেই আবি রাজকীয় অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাবে। সিঁড়ির উপরের ধাপে দাঁড়িয়ে আছে সে। প্রায় ষাট বছর বয়স তার এখন। আগের মতই বিশালদেহী, কর্কশ চেহারা। তবে মুখটা আগের চেয়ে থলথলে হয়েছে। আশ্চর্য হলেও সত্য, ফারাওয়ের পরিশীলিত চেহারার সঙ্গে সামান্য হলেও মিল পাওয়া যায় সেই মুখের।

এক পলক দেখেই লোকটার সম্পর্কে ধারণা করে ফেললো তুয়া, এবং সেই মুহূর্ত থেকে তাকে এমন ঘৃণা করতে শুরু করলো, কেশ-এর যুবরাজ আমাথেলকেও অতটা ঘৃণা সে করেনি। তার চাইতেও বড় যেটা, মাথামোটা মাতাল আমাথেলকে বিন্দুমাত্র ভয় পায়নি, কিন্তু এই মানুষটাকে দেখার পর থেকেই অদ্ভুত এক আতঙ্ক তার মনে ভর করতে শুরু করেছে। শুধু শক্তিশালী নয়, চোখের দৃষ্টিই বলে দেয় লোকটা

অসম্ভব ধূর্ত, আর লোভী। তার লোভী চোখের দৃষ্টি তুয়ার সৌন্দর্যের ওপর এমনভাবে সেঁটে আছে, যেন ছিঁড়ে খুঁড়ে দেখতে চায় সেই রূপের উৎস।

রথ থেকে নেমে সিঁড়ির ধাপ টপকে উঠতে শুরু করলেন ফারাও ও তুয়া। কুমার আবি তাঁদের রাজকীয় নাম ও উপাধি আউড়ে তাঁদেরকে তার দীন-গৃহে স্বাগত জানাতে গিয়ে বলে চলেছে সে কেমন খুশি হয়েছে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মহামহিম ফারাওকে মেম্ফিসের দেয়ালের ভেতরে পেয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। বেশিরভাগ কথার লক্ষ্য ফারাও হলেও পুরোটা সময় আবির চোখ ঘুরে বেড়ালো তুয়ার শরীরের ওপর দিয়ে।

যাত্রার ধকলে ক্লান্ত ফারাও আবির কথার জবাবে কিছু বললেন না, তবে তুয়া তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে বললো, 'আপনার অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনের জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু, কাকা আবি, মেম্ফিসের ফটকের বাইরে কেন আপনি আমাদের সাথে দেখা করেননি? আমরা আশা করছিলাম প্রদেশপাল নগরীর বাইরেই তার ফারাওয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে ফারাওয়ের কর্মকর্তাদের হাতে নগরীর চাবি তুলে দেবেন।'

আবি ভেবেছিল রানীর পোশাকের আড়ালে কোন লাজুক-লতা কিশোরীকে দেখবে। তার বদলে দীর্ঘাঙ্গিনী রাজকীয় তরুণীকে দেখে আর তার তীক্ষ্ণধার বাক্য শুনে জবাব খুঁজে পেলো না সে। তুয়া তার পাশ কাটিয়ে গিয়ে যেখানে তার-থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে নিয়ে যাওয়ার আদেশ করলো।

নগরীর সবচেয়ে বড় এবং সুন্দর প্রাসাদটিই প্রস্তুত করা হয়েছিল ফারাও ও রানীর থাকবার জন্য। নগরীর মাঝখানে খেজুরকুঞ্জে ঘেরা প্রাসাদ। কিন্তু দ্রুত একবার চোখ বুলিয়েই তুয়া বললো, থাকার জায়গা পছন্দ হয়নি তার। তক্ষুনি নতুন জায়গা খোঁজা শুরু হলো। শেষে আরও ছোট একটা প্রাসাদ পছন্দ করলো তুয়া। এক সময় ওটা প্রতিশোধ ও সতীত্বের দেবী ব্যঘ্রমুখী সেখেতের মন্দির ছিল। নীলনদের দিকে মুখ করা এই প্রাসাদের সিংহদরজার মিনারগুলো উঠে এসেছে একবারে নদ থেকে। বন্যার সময় নীলের জলরাশি মিনারগুলোর গোড়া ধুয়ে বয়ে চলে। এখন অবশ্য প্রাসাদের ঐ দিকটা মেম্ফিসের নগর-প্রাচীরের অংশ।

প্রাসাদ ও এর প্রাঙ্গণের বাইরে মন্দিরের পুরনো বাগান। চূনাপাথরের উঁচু দেয়াল ঘেরা এই বাগানে একসময় সেখেতের পুরোহিত-পূজারিণীরা ঘুরে বেড়াত। নদীর মুক্ত বাতাসে স্বাস্থ্য ভাল

থাকবে এই যুক্তি দিয়ে তুয়া ফারাওকে এই প্রাসাদে থাকতে শুধু নয়, তাঁর রাজদরবার প্রতিষ্ঠা করতেও অনুরোধ করলো। তুয়ারই ইচ্ছায় সঙ্গী রাজকীয় সৈন্যদের ফারাওয়ের বন্ধু মার্মিসের নেতৃত্বে বাগানের বাইরে মোতায়েন করা হলো।

রাজার থাকার জায়গার ব্যবস্থা করার পর তুয়াকে যখন জানানো হলো তার থাকার জন্য আর কোন ভাল কামরা নেই, ও বললো, তাতে কোন সমস্যা হবে না, প্রাচীন মিনারের ভেতর দুটো ছোট কক্ষ আছে, ঐ দু-কামরাতেই তার চলে যাবে। ওখান থেকে চোখ মেললেই দেখতে পাবে নীলের অপূর্ব দৃশ্য।

কয়েক যুগ ধরে যেখানে কেউ থাকেনি খোদ রানী সেখানে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তড়িঘড়ি কামরা দুটো সাফ-সুতরো করে আসবাবপত্র দিয়ে সাজিয়ে দেয়া হলো। তুয়া এবং তার পালক-মা আসতি থাকতে লাগলেন সেখানে।

৮
জাদুর মূর্তি

ফারাও আর তুয়া তাদের পারিষদদের নিয়ে নির্বিঘ্নেই কাটিয়ে দিলেন রাতটা। পরদিন শুরু হলো উৎসব–এমন উৎসবের কথা মিশরের ইতিহাসে আর লেখা হয়নি বললেই চলে। সকালে যে ভোজের মাধ্যমে উৎসবের শুরু অমন ভোজ তুয়া থিবিতে তার অভিষেকের সময় বা সেই রক্তঝরা সন্ধ্যায় যেদিন যুবরাজ আমাথেল রামেসের হাতে নিহত হয় সেদিনও দেখেনি। মেফিসের সেই ভোজসভায় সোনার আসনে বসতে দেয়া হলো ফারাও আর তরুণী রানীকে। ভোজসভার আমন্ত্রক ও প্রজা হিসেবে কুমার আবির আসন পাতা উচিৎ ছিল ফারাওয়ের ডানপাশে, কিন্তু তার আসন পাতা হলো তুয়ার ডানপাশে।

'আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি, কাকা,' আড়চোখে আবির দিকে তাকিয়ে বললো তুয়া। 'আপনার তো ফারাওয়ের পাশেই বসা উচিৎ ছিল।'

'আমার রাজা এবং রানী যখন আমার বাড়িতে এসেছেন তখন আমি কী করে সম্মানের আসনখানি দখল করি?' বিশাল মাথাটা সামান্য নুইয়ে বললো আবি। 'আমরা এখানে ওসিরিসকে অন্যসব দেবতার উপরে স্থান দিয়ে পূজা করি। মৃত্যুর দেবতা সেই ওসিরিসের প্রধান

পুরোহিতের জন্য সংরক্ষিত ঐ আসন।'

'মৃত্যু দেবতার পুরোহিত!' তুয়া বললো, 'সেজন্যেই কি তাঁকে আমার বাবার পাশে বসানোর ব্যবস্থা করেছেন?'

'না, না, তা কেন? ওসিরিসের পূজারী আমাদের কাছে কেমন সম্মানিত তা তো বলেছি। তাঁকে তাঁর যোগ্য কোন জায়গায় বসানো উচিৎ। ভাবলাম নবীনা রানী, আমেন স্বয়ং যাকে দীর্ঘজীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার বদলে যিনি ওসিরিসের দিকে বেশি এগিয়ে গেছেন, এবং শিগ্‌গিরই হয়তো *চিরজীবী*দের তালিকায় নাম লেখাবেন তাঁর পাশেই তাঁকে বসাই।'

'তারমানে আপনি মনে করেন ফারাও শিগগিরই মারা যাবেন? না, কুমার আবি, অস্বীকার করবেন না, আপনার চিন্তা আমি পড়তে পারছি, অশুভ সঙ্কেত রয়েছে তাতে,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে তুয়া অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো।

একটু পরেই সে খেয়াল করলো, আবির পিছনে তার ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের মধ্যে পলিতকেশ এক প্রৌঢ়। পরনে তার ঢোলা আলখাল্লা, মাথায় জ্যোতিষীর টুপি। তাকানোর ভঙ্গি দেখেই তুয়া বুঝতে পারলো, প্রতিটা জিনিসি–বিশেষ করে ফারাও আর তাকে সে তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করছে। যতবারই লোকটার দিকে চোখ গেল তুয়া দেখলো তারই দিকে সে তাকিয়ে আছে।

'কে লোকটা?' আসতিকে জিজ্ঞেস করলো তুয়া।

'বিখ্যাত জ্যোতিষী কাকু। মহামান্য রানী, আপনার জন্মের আগে আবি যখন থিবিতে গিয়েছিল সে-সময় প্রথম ওকে আমি দেখি। পরে ওর সম্পর্কে বলবো। এখন শুধু দেখে রাখুন।'

সুতরাং তুয়াও পর্যবেক্ষণে রাখলো কাকুকে। শিগ্‌গিরই সে আবিষ্কার করলো, সে আর ফারাও যা যা করছেন–কী খাচ্ছেন, কাদের সঙ্গে কথা বলছেন সব দেখছে কাকু। শোনার চেষ্টা করছে প্রতিটা কথা–বিশেষ করে তাঁদের মুখ থেকে ওসিরিস সম্পর্কে কোন কথা বের হওয়া মাত্র তা লিখে নিচ্ছে। নিঃসন্দেহে পরে হিসাব নিকাশ করে এসব কথার ভেতর থেকে ভবিষ্যতের সঙ্কেত খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে সে।

ফারাওয়ের সফরসঙ্গী হিসেবে যে রমণীরা এসেছে তাদের একজনের নাম মেরিত্রা, বহু বছর আগে যে থিবিতে আবির জাহাজ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। এখন মাঝবয়েসী নারী, তবে দেখতে আগের মতই সুন্দর। ফারাওয়ের ব্যক্তিগত দাসীদের একজন। তুয়া তাকে

পছন্দ করে না। তবে ফারাও তার বুদ্ধিমত্তা ও মজার মজার কথাবার্তার জন্য তাকে বিশেষ স্নেহ করেন। তার জন্যে সম্পদ ও সম্মানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তিনি। এ-মুহূর্তে ফারাওয়ের পেছনে দাঁড়িয়ে চামর দোলাচ্ছে মেরিত্রা। হঠাৎ করেই তার আচরণ নজর কাড়লো তুয়ার। মেরিত্রা বারবার জ্যোতিষী কাকুর দিকে তাকাচ্ছে। একটু পরেই কাকু খেয়াল করলো মেরিত্রাকে। পুরনো বন্ধুর সাথে দেখা হয়ে যাওয়ার মত হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তার মুখ। কিছুক্ষণ পর অন্য এক দাসীর চামর দোলানোর পালা আসতেই মেরিত্রা আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়ালো কাকুর পাশে। বিরাট চামরের আড়ালে থেকে দ্রুত কিছু একটা বললো সে জ্যোতিষীকে। সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো কাকু। এরপরই দুজন আবার আলাদা হয়ে গেল।

ঢিমে তেতালা ছন্দে এগিয়ে চললো ভোজসভা। অবশেষে দরজাগুলো খুলে গেল। দাসরা একটা মমি নিয়ে এসে মিলনায়তনের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিলো। সেই মমির পাশ থেকে চিৎকার শোনা গেল একজনের:

'ধরণীর মাটিতে যাঁরা উঁচু আসনে আসীন তাঁরা পান করুন এবং প্রফুল্ল হোন; কেউ তো জানেন না কে কখন এমন অবস্থায় পৌঁছুবেন।'

উৎসবের মাঝে এরকম মমি নিয়ে এসে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া খুবই প্রাচীন রীতি, তবে সাধারণ মানুষের অব্যবহারে বিষয়টা বেশির ভাগ মানুষ ভুলে গেছে। তুয়াও আগে কখনও এমন কিছু দেখেনি। মমির গায়ে রাজকীয় পোশাক ও প্রতীক দেখে কৌতূহলী হয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, 'মৃত এক রাজাকে কেন তার সমাধিগৃহ থেকে তুলে আনা হয়েছে?'

'ওটা কোন রাজা নয়, মহামান্য রানী,' আবি জবাব দিলো। 'সাধারণ কোন মানুষের কঙ্কাল, কাঠও হতে পারে, আমি ঠিক জানি না–তার ওপর কাপড় পেঁচিয়ে রাজকীয় পোশাক পরিয়ে আনা হয়েছে, হাতে ধরিয়ে দেয়া হয়েছে রাজদণ্ড। আমাদের প্রধান অতিথি মহানুভব ফারাওয়ের সম্মানে এটা করা হয়েছে।'

ভ্রূ কুঁচকে উঠলো তুয়ার। আবির ব্যাখ্যা কানে গেছে ফারাওয়েরও। বিষণ্ন একটু হেসে তিনি বললেন, 'আমার মত বুড়ো অসুস্থ মানুষকে সম্মান জানানোর এ বড় রুক্ষ উপায়, আবি। সবার মত আমিও জানি আমি ঐ দিনটিরই অপেক্ষায় আছি। নতুন করে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া আমাকে কষ্ট দেয়ার সামিল।'

সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চেয়ারে হেলান দিলেন ফারাও। তুয়া উদ্বিগ্ন

চোখে তাকালো তাঁর দিকে।

শতকণ্ঠে আবি মাফ চেয়ে তক্ষুনি মমিটা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলো। বললো, গুরুত্বপূর্ণ অতিথিকে সম্মান জানানোর সুপ্রাচীন এই রীতি থিবিতে ভুলে যাওয়া হলেও মেম্ফিসে এখনও চালু আছে। সে শুধু রীতি রক্ষা করেছে। আবি আরও বললো, ঐ একই মূর্তি এর আগে অন্তত ত্রিশজন ফারাওয়ের সম্মানে আয়োজিত ভোজসভায় ঐ একইভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। মিশরের রাজধানী থিবিতে সরিয়ে নেয়ার আগের ঘটনা সেসব।

'তা-ই যদি হয় সময় হয়েছে ওটাকে কবর দিয়ে ফেলার–যদি কাঠ হয় তো পুড়িয়ে ফেলার,' ঝাঁঝের সঙ্গে বললো তুয়া। 'ফারাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আমরা এখন যাব।'

উঠে দাঁড়ালো আবি। তুয়া ভাবলো ভোজসভার সমাপ্তি ঘোষণা করবে সে। কিন্তু না, বিরাট একটা মদ ভর্তি সোনার পানপাত্র তুলে নিয়ে বললো, 'সম্মানিত অতিথিবর্গ, বিদায় নেয়ার আগে মেম্ফিস দুই ভূখণ্ডের মহান প্রভুর সম্মানে পান করতে চায়। দীর্ঘ শাসনকালে এই প্রথম তিনি তাঁর পদধূলি দিয়ে সম্মানিত করেছেন মেম্ফিসকে। একটু আগেই তিনি, আমার রাজকীয় ভাই, আমাকে বলছিলেন, তাঁর বয়স হয়েছে, তার ওপর অসুস্থ এবং দুর্বল। এর পর আর কখনও তাঁর পক্ষে এই শ্বেতপ্রাচীর ঘেরা নগরে আসা সম্ভব হবে বলে আমরা আশা করতে পারি না। দীর্ঘদিন নিঃসন্তান থাকার পর ভাগ্যক্রমে দেবতারা তাঁকে পরমা সুন্দরী একটি কন্যা সন্তান দিয়েছেন, যিনি এখন তাঁর সিংহাসনের অংশীদার। আমরা বিশ্বাস করি এবং প্রার্থনা করি মহান ফারাও ওসিরিসের রাজ্যে চলে যাওয়ার পর তাঁর কন্যা মিশরের পূর্ণ শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করবেন। আর সেজন্যেই, বন্ধুগণ, একটা কথা বলা প্রয়োজন, সামনের সেই দিনগুলোতে মিশরের নিরাপত্তা পুরোপুরি নির্ভর করবে দুর্বল এক নারীর ওপর। আর তাই এখানে আমি পান করতে চাই এই আশায় যে, আমেনের ভোরের তারা, সৌন্দর্যে দেবী হাথোরের মত রানী নেতের-তুয়া, যিনি এপর্যন্ত বহু পাণিপ্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নেয়ার আগে মিশরকে শক্তিশালী করার জন্য রাজরক্তধারী, শাসনকাজে দক্ষ কাউকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করবেন।'

এই ভাষণের অর্থ বুঝতে অসুবিধা হলো না শ্রোতাদের। তাদের আগেই শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছিল আবি। উচ্ছ্বাসের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে উৎফুল্ল কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো তারা 'হ্যাঁ! হ্যাঁ! সেরকম

একজনকে আমরা চিনি। ও মহামহিম রানী, আমেনের কন্যা, তাঁকে গ্রহণ করুন এবং চিরদিন শাসন করুন।'

'কী বলতে চাইছে এরা?' তুয়াকে জিজ্ঞেস করলেন ফারাও। 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি জোরে কথা বলতে পারব না, আমার পক্ষ থেকে তুমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাও, তারপর চলো এখান থেকে।'

অনেকক্ষণ পরে অভ্যাগতদের কোলাহল যখন থামলো উঠে দাঁড়ালো তুয়া। তীক্ষ্ণ চোখে সবার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কথা বললো পরিষ্কার গলায়, মিলনায়তনের শেষ প্রান্তেও সে-গলা শোনা গেল স্পষ্ট।

'উপস্থিত অভিজাত অভ্যাগতবর্গ এবং এই নগরীর জনগণ, আপনারা যে আনুগত্য দেখিয়েছেন এবং সংবর্ধনা জানিয়েছেন তার জন্য আমার পিতা ফারাও এবং আমি উচ্চ ও নিম্নভূমির রানী আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে প্রদেশপাল কুমার আবি যে কথা বললেন তার কোন অর্থ আমরা বুঝিনি। আমার প্রার্থনা, মহামহিম ফারাও আরও অনেক বছর গৌরবের সঙ্গে দেশ শাসন করুন। যদি তিনি মারা যান আমি থাকব। আমার প্রজাগণ, আপনাদের আমি আশ্বাস দিচ্ছি, আপনাদের রানীকে দুর্বল এবং অনভিজ্ঞ মনে করবেন না। আর জেনে রাখুন, তিনি স্বামী খুঁজছেন না। যখন খুঁজবেন তখনও এই মেফিসে তাকে খুঁজে পাবেন বলে মনে করেন না। প্রজাগণ, এবং পিতৃব্য কুমার আবি, শান্তিতে থাকুন। আপাতত বিদায়।'

বাবার হাত ধরে বেরিয়ে গেল তুয়া। সাবেক সেখেত মন্দিরের মিনারে নিজের কামরায় পৌঁছে পোশাক ছাড়লো সে। তারপর পাশের কামরা থেকে ডেকে পাঠালো আসতিকে।

'তুমি তো অনেক জ্ঞানী, মা, বলো, আবি কী বোঝাতে চাইল?'

'মহামান্য রানী, যদি না বুঝে থাক তাহলে বলবো আমি যা ভেবেছি তার চেয়ে বোকা তুমি,' জবাব দিলেন আসতি। 'তবু আমি বলছি, তোমার কাকা কুমার আবি বোঝাতে চেয়েছে সে তোমাকে ফাঁদের মধ্যে পেয়েছে, তার স্ত্রী হিসেবে ছাড়া আর কোনভাবে এই দেয়ালের বাইরে তুমি যেতে পারবে না।'

প্রচণ্ড ক্রোধে মুখ চোখ লাল হয়ে উঠলো তুয়ার। 'এত বড় সাহস! এই কথা বোঝাতে চেয়েছে! আমি হবো ঐ বুড়ো হাবড়ার স্ত্রী! আমার বাবার ভাই, দাদাও হতে পারত ঐ কদাকার পেজোমির পোঁটলা, যে কিনা বড়াই করে বলে বেড়ায় তার শ'খানেক ছেলে-মেয়ে আছে, সে

বিয়ে করতে চায় আমাকে! আমি মিশরের রানী, যার জন্ম হয়েছে আমেনের ইচ্ছায়–এত বড় সাহস তোমার!' প্রচণ্ড ক্রোধে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো তুয়ার।

'রানী, সাহস আমার নয়, তার। হ্যাঁ, এই ষড়যন্ত্রই সে পাকিয়েছে, এবং সাধ্যমত চেষ্টা করবে তা বাস্তবায়নের। আমি শুরু থেকেই এটা সন্দেহ করেছিলাম, এবং সেজন্যই বারবার মেম্ফিসে আসার বিরোধিতা করছিলাম। কিন্তু, নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার, তুমি প্রতিবারই আমাকে চুপ থাকতে বলে বলেছ মিশরের সবচেয়ে প্রাচীন নগরী তুমি দেখবেই।'

'তবু তোমার চুপ করে যাওয়া উচিৎ হয়নি, তোমার আশঙ্কা আমাকে বলা উচিৎ ছিল। অন্যরা যখন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে তখন আবি বা তার ছেলেদের কেউ প্রস্তাব করেনি। তাই আমার কোন সন্দেহ হয়নি–'

'রানী আমার, সাপ কখনও সিংহের মত গর্জন করে কিছু করে না, সেজন্যেই তাকে ভয় বেশি।'

এই জায়গা থেকে একবার বেরিয়ে নেই, তখন সাপ টের পাবে ভয় কাকে বলে। দাইমা, যেভাবেই হোক এই মেম্ফিস থেকে আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে।'

'সেটা সহজ হবে না, রানী, সিংহাসনে আরোহণের পর ফারাওয়ের এটা প্রথম উত্তর ভূ-খণ্ড সফর। আগামী আটদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর অংশ নেয়ার কথা। নির্ধারিত এসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত না হয়ে ফারাও যদি চলে যান এখানকার মানুষ তাতে অসন্তুষ্ট হতে পারে।'

'হোক অসন্তুষ্ট, ফারাও তাঁর কোন কাজের ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য নন।'

'তেমনই বলা হয় বটে, কিন্তু, রানী. তুমি কি মনে কর ফারাও তাঁর এবং তোমার মুকুটের ঝুঁকি নিয়ে দেশে গৃহযুদ্ধ ডেকে আনবেন? আবি খুবই শক্তিশালী। তার অধীনে যে সৈন্য আছে তা এই শান্তির সময়ে ফারাও যা সংগ্রহ করতে পারবেন তার চাইতে বেশি–শুধু তো স্থায়ী সৈন্য নয়, তার পক্ষে আছে মরুভূমির বেদুঈন গোত্রগুলো। সুযোগ পেলে তারা ক্ষুধার্ত শকুনীর মত মিশরের সম্পদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এখানে তোমার সঙ্গে আছে মাত্র পাঁচশো সৈন্য, ওদিকে তোমাদের সম্মান দেখানোর নামে আবি যে সৈন্য সমাবেশ করেছে তারা দক্ষিণের সড়ক এবং নৌ-পথ অবরোধ করে রেখেছে। এই অবস্থায় তার সম্মতি ছাড়া কী করে তুমি মেম্ফিস ছেড়ে যাবে? সাহায্য

চেয়ে লোক পাঠাতেও তো পারবে না। যদি পারোও, পঞ্চাশ দিনের আগে তা এখানে পৌঁছাবে না।'

বিপদের গভীরতা বুঝতে পেরে শান্ত হয়ে গেল তুয়া। 'বড় ভুল করেছ তুমি, দাই মা, এতসব যখন অনুমান করতে পেরেছিলে, ফারাও আর তাঁর পরিষদকে তোমার জানানো উচিত ছিল।'

'আমি সতর্ক করেছিলাম, রানী। মার্মিসও বলেছিল। কিন্তু তাঁরা কেউ শুনতে চাননি। বলেছেন, এসব অলস মস্তিষ্কের কল্পনা। ফারাও নিজে মার্মিস ও আমাকে ডেকে পাঠিয়ে সতর্ক করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, তিনি খোঁজ-খবর নিয়ে দেখেছেন, আবি বা তার সেনাপতিদের কাউকে অবিশ্বাস করার মত কিছু পাননি। তাছাড়া ফারাও আমাকে বলে দিয়েছিলেন, এসব কথা যেন তোমাকে না জানাই। তাঁর ধারণা, এসব শুনে ভয় পেয়ে তোমার বেড়ানোর আনন্দ মাটি হবে।'

'এ-ব্যাপারে ফারাওয়ের পরামর্শদাতা কে ছিল?'

'খুবই অদ্ভুত একজন, রানী। ফারাওয়ের ব্যক্তিগত পরিচারিকা মেরিত্রাকে চেনো তো–ফারাও যাকে খুব পছন্দ করেন? সেই রাতে সে চামর নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর পিছনে।'

'হ্যাঁ, চিনি ওকে,' বললো তুয়া। 'সকালে ভোজের সময় লম্বা জ্যোতিষীটার সঙ্গে ফিসফাস করছিল। কিন্তু ফারাও কি আজকাল তার ব্যক্তিগত দাসীদের কাছ থেকেও পরামর্শ নিচ্ছেন?'

'সবার কাছ থেকে না হলেও এই একজনের কাছ থেকে যে নিচ্ছেন তাতে সন্দেহ নেই। তুমি বোধহয় ওর সব কাহিনী জান না। তোমার জন্মের আগের বছর আবি থিবিতে গিয়েছিল। তার সঙ্গে তার খাস দাসী হিসেবে গিয়েছিল মেরিত্রা। কোন কারণে রেগে গিয়ে আবি তাকে চড় মেরেছিল। চড় খেয়ে সে আবির ওপর প্রতিশোধ নিতে মরীয়া হয়ে ওঠে। সেদিনই সুযোগ এসে যায়। আবি তার জ্যোতিষী–ঐ কাকুর সাথে ফারাওকে হত্যা করে সিংহাসন দখলের বিষয়ে আলাপ করছিল। কাকু বারণ করায় আবি আর এগোয়নি। তবে তাদের আলাপ আড়াল থেকে শুনে ফেলেছিল মেরিত্রা। সে আবির জাহাজ থেকে পালিয়ে গিয়ে ফারাওকে বলে দেয় সব কথা। যাহোক, সব জেনেও শেষ পর্যন্ত ফারাও আবিকে সসম্মানে মেম্ফিসে ফিরে আসতে দিয়েছিলেন। মেরিত্রা রয়ে গিয়েছিল রাজপ্রাসাদে। সেই থেকে ফারাও ওকে বিশ্বাস করেন, বুদ্ধি আর রূপের জন্য পছন্দও করেন। মেম্ফিসের কোন খবর দরকার হলে ওকেই ডেকে পাঠান তিনি–কেমন করে যেন

মেম্ফিসের সব গোপন খবরই মেরিত্রা থিবিতে বসেই জেনে যেত। সবচেয়ে বড় কথা ওর সেসব খবরের বেশির ভাগই সত্য প্রমাণিত হয়েছে।'

'তাতে আশ্চর্যের কি আছে, দাই মা? আবির জ্যোতিষী কাকুর সঙ্গে ওর যেরকম খাতির দেখলাম!'

'না, রানী, বিষয়টাকে এত সরল করে দেখলে হবে না। গোপন তথ্যের বিনিময়ে ও-ও গোপন তথ্য সরবরাহ করত। আমার বিশ্বাস, আমি যা জেনেছি–কেমন করে জেনেছি তা জিজ্ঞেস কোরো না– তা জানানোর পর ফারাও মেরিত্রাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। মেরিত্রা আমার আশঙ্কাকে হাস্যকর বলে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল কুমার আবি অনেকদিন আগেই তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করেছে, যে সম্পদ ও ক্ষমতা আছে তা নিয়েই সে সন্তুষ্ট। মেরিত্রা এ-ও বলেছিল, আবি এত সৈন্য সমাবেশ করছে ফারাও আর তোমাকে সর্বোচ্চ সম্মান দেখানোর জন্যে, তোমাদের প্রতি তার আনুগত্যের প্রমাণ তুলে ধরার জন্যে। বলেছিল, যদি কোন বিপদের আশঙ্কা থাকতো তাহলে সে কি একদিন যার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল সেই আবির হাতের মুঠোর মধ্যে পড়ার জন্যে সঙ্গে আসত? এরপর ফারাও আর তার কথা না বিশ্বাস করে পারেননি। আমিও ফারাওয়ের কোপানলে পড়ার ভয়ে আর কিছু বলিনি। ফারাও হয়তো তোমার কাছ থেকে আমাকে আলাদা করে ফেলতেন। রানী আমার, আমার রামেস আমার কাছে নেই; আমাকে যদি তোমার কাছ থেকেও সরিয়ে নেয়া হয়, আমি কী নিয়ে থাকব? এর চেয়ে তো মৃত্যুও আমার ভাল। তবে, হ্যাঁ, মনে হয় তোমাকে বিষয়টা না জানানো ভুলই হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, মারাত্মক ভুল, দাই মা। তবে ভালবাসার জন্যে যে ভুল তা ক্ষমার অযোগ্য নয়।' আসতিকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো তুয়া। 'ওহ্, ফারাও, আমার পিতা! দেবতারা কেমন নরম করে তোমাকে তৈরি করেছেন যে নারীর রূপ ধরে এক ডাইনী তোমার রাষ্ট্রীয় নীতির হাল ঘুরায়! এখন যাও, দাইমা, আমি ঘুমাব, আর আমেনকে ডাকব তাঁর মেয়েকে সাহায্য করার জন্য। যে ফাঁদ পাতা হয়েছে তা যত শক্ত আর কৌশলীই হোক তিনি স্বপ্নে তা কেটে বেরিয়ে আসার পথ দেখাতেও পারেন।'

*

সেদিন রাতের ভোজ শেষে ফারাওয়ের প্রিয় দাসী মেরিত্রা ফারাওয়ের নিবাস সেখেত মন্দিরে ফিরলো না। সবাই যখন ভোজসভা থেকে

বেরিয়ে যাচ্ছে সে প্রধান পরিচারকের কানে কানে কী যেন বললো। পরিচারক এর মধ্যেই জেনে গেছে এই মহিলার যখন খুশি প্রাসাদে ঢোকার বেরোনোর রাজকীয় ছাড়পত্র আছে। সে-ও নিচুস্বরে জানালো দরজা খোলাই থাকবে।

কালো একটা আলখাল্লা দিয়ে মাথা ঢেকে নির্দিষ্ট একটা মূর্তির পেছনে অপেক্ষা করতে লাগলো মেরিত্রা। একটু পরে একই রকম আলখাল্লা মোড়া দীর্ঘ এক মূর্তি এগিয়ে এসে তাকে ইশারায় ডাকলো। দীর্ঘদেহীর পেছন পেছন এগিয়ে গেল মেরিত্রা। জনশূন্য অলিপথ আর বহু ধাপ সরু সিঁড়ি টপকে তারা পৌঁছুলো এক বন্ধ দরজার সামনে। দীর্ঘদেহী তালা খুললো দরজার। দুজন ভেতরে ঢুকে তালা বন্ধ করে দিলো আবার।

দামী আসবাবপত্রে সাজানো এক কামরায় নিজেকে আবিষ্কার করলো মেরিত্রা। ছাদে ঝোলানো লণ্ঠনে আলোকিত কামরাটা। ঘরের বিভিন্ন জায়গায় পিতলের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, মেলে রাখা প্যাপিরাসে নানা রকম চিহ্ন, আর অন্য জিনিসপত্র দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না, এঘরে যে থাকে সে নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ এবং যাদুবিদ্যার চর্চা করে। কাল আলখাল্লা খুলে একপাশে ছুঁড়ে দিয়ে একটা আসনে বসে পড়লো মেরিত্রা। দীর্ঘ সিঁড়ি ভেঙে এসে হাঁপাচ্ছে সে।

'বন্ধু কাকু, আপনি তো দেখি দেবতাদের কাছাকাছি থাকেন!' শ্বাস-প্রশ্বাস একটু স্বাভাবিক হতে বললো মেরিত্রা।

'হ্যাঁ, প্রিয় মেরিত্রা, স্বর্গের দিকে অর্ধেক উঠে এসে ঘর আমার। এখানে অপার নিরিবিলিতে আমি ওপরে যা ঘটছে সব দেখি এবং লিখে রাখি,' আকাশের দিকে ইশারা করলো কাকু, 'এবং যে তথ্য পাই তা নিচে যারা থাকে তাদের কাছে অবস্থা বুঝে বিক্রি করি।'

'নিশ্চয়ই তার জন্যে মূল্য নেন?'

'অবশ্যই। ভাল মূল্য নেই। যে চিকিৎসক অল্প পারিশ্রমিক নেয় তার কাছে রোগী যেতে চায় না। যাকগে এসব। তুমি অবশেষে এখানে এসেছ, তোমাকে দেখে কী যে খুশি হয়েছি। প্রিয় মেরিত্রা, তুমি আগের মতই সুন্দর আছ, যৌবনও ধরে রেখেছ ঠিক ঠিক।'

তোষামোদে খুশি হলো মেরিত্রা। এই তোষামোদ তার প্রাপ্যও। যে বয়েসে বেশির ভাগ মিশরীয় মহিলা বুড়িয়ে যায় সে-বয়েসেও সে রয়েছে তরতাজা তরুণীর মত।

'পরিষ্কার বিবেক, ভাল ক্ষুধা আর সততাপূর্ণ শান্ত জীবন—এই হচ্ছে আমার যৌবন অক্ষয় থাকার গোপন রহস্য,' রহস্য করে বললো

মেরিত্রা। 'আপনি অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন সেজন্যেই আপনার এমন শীর্ণ শাদা ধবধবে অবস্থা। তবে এই দীর্ঘ আলখাল্লায় আপনাকে যথেষ্ট সুপুরুষ দেখাচ্ছে।'

'যে পরিশ্রম আমাকে করতে হয়,' মুখে হতাশ একটা ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলে বললো কাকু, 'অন্যের জন্য পরিশ্রম–তার ওপর আছে হজমের সমস্যা আর এই অভিশপ্ত মিনারের গুমোট ভাব। এই সব মিলিয়ে বাতের যন্ত্রণা আমার নিত্যসঙ্গী। ওহ-হো, আমার তো ওষুধ খেতে হবে–।' একটা পাত্র থেকে দুটো পানপাত্রে তরল পদার্থ ঢেলে একটা এগিয়ে দিলো মেরিত্রার দিকে। বললো, 'পান করে দেখ, থিবিতে এরকম মদ পাওয়া যায় না।'

'হ্যাঁ, খুব ভাল, তবে একটু ভারি,' পানপাত্রে চুমুক দিয়ে বললো মেরিত্রা। 'বেশি খেলে মনে হয় আমারও বাত দেখা দেবে। বন্ধু, এখন বলুন, এই জায়গায় আমি নিরাপদ তো? না, ফারাওয়ের কথা বলছি না, উনি আমাকে পছন্দ করেন, আমি বলছি তাঁর রাজকীয় ভাইয়ের কথা। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে একজনের গালে চড় মারার পর আমি কীভাবে তার দাম শোধ করেছিলাম। মনে হয় না তার মেজাজ সে-সময়ের চেয়ে ভাল হয়েছে।'

'ওটা যে তোমার কাজ ছিল তা ও কখনও টের পায়নি। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী লোক তো–ভেবেছিল আমার হাতে তুলে দেয়ার কারণে ক্ষোভে দুঃখে তুমি পালিয়ে গেছ।'

'সত্যিই তাই ভেবেছিল! ওহ, কী গর্দভ!'

'তুমি কিন্তু, মেরিত্রা, আমার বুকে বড় ব্যথা দিয়েছিলে।' মদের প্রতিক্রিয়ায় পুরোনো ক্ষত কাঁচা হয়ে উঠেছে কাকুর। 'তুমি জান আমি তোমাকে কেমন পছন্দ করতাম–এখনও করি।'

'আমার মনে হয়েছিল আমি আপনার মত জ্ঞানী বিশিষ্ট ব্যক্তির যোগ্য নই। মনে হয়েছিল, আমি আপনার জীবন যাপনে ব্যাঘাতই শুধু ঘটাব। প্রিয় কাকু, তাই আমি ঐ হতভাগাটা–মানে ফারাওয়ের ঘরে চলে গিয়েছিলাম– ঘর তো না আমরা আড়ালে বলি নারী-মঠ। যাহোক, আপনি আবিকে সব সত্যি কথা বলে দেবেন না আশাকরি।'

'না, মেরিত্রা, আমাদের এখনকার সুসম্পর্ক যদি বজায় থাকে তাহলে ওসব কথা বলার কোন প্রয়োজন হবে না। একটু তো বিশ্রাম হয়েছে, এবার কাজের কথায় আসি। তোমার দেরি দেখে ফারাও আবার খেপে যেতে পারেন।'

'ওহ, সেৎ গিলে খাক ফারাওকে! ঠিক আছে, প্রিয় কাকু, বলুন

আপনার কাজের কথাটা।'

বৃদ্ধ জ্যোতিষীর মুখের ভাঁজগুলো শক্ত হয়ে উঠলো। চোখে চালাকির ঝিলিক। দরজার কাছে গিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিলো সত্যিই তালা মারা আছে। তারপর সেটার ওপর একটা পর্দা টেনে দিয়ে এসে তেপায়া টেনে বসলো এমন জায়গায় যেখান থেকে মেরিত্রার মুখ সে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু তার মুখ রইল ছায়াতে।

'বড় কাজ, মেরিত্রা,' বললো কাকু, 'এবং দেবতাদের কসম, আমি জানি না এই কাজে তোমাকে বিশ্বাস করা ঠিক হবে কিনা।' তুমি একবার আমাকে ফাঁকি দিয়েছিলে, বছরের পর বছর ধরে ফাঁকি দিয়ে চলেছ ফারাওকে। কী করে বিশ্বাস করি আবারও তুমি একই খেলা খেলে আমার প্রাণ এবং আত্মা দুটোরই সর্বনাশ করবে না?'

'যদি এমনই মনে করেন তাহলে তো আর কথার দরকার নেই। দরজা খুলে একজন লোক সঙ্গে দিয়ে দিন, আমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসবে। খামোকা সময় নষ্ট করার কোন অর্থ নেই।'

'বুঝতে পারছি না কী করব। তুমি যেমন সুন্দর তেমনি ধূর্ত। শোন, মেরিত্রা,' এখানে এসে হিসহিসে হয়ে উঠলো কাকুর কণ্ঠস্বর। খপ করে মেরিত্রার কব্জি ধরে সে বলে যেতে লাগলো, 'যদি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা কর, আমি বলছি, ভয়ঙ্কর মৃত্যু অপেক্ষা করবে তোমার জন্যে। ছোরা বা বিষ যদি ব্যর্থ হয়, জেনে রেখো, আমি হাতুড়ে পণ্ডিত নই, আমি সত্যিই কিছু কলা-কৌশল জানি। আমি দূর থেকেই এমনভাবে তোমার চেহারা বিকৃত করে দেব, এমনভাবে তোমার ওপর মায়াজাল বিস্তার করব, তুমি রাতে মুহূর্তের জন্যেও দুচোখের পাতা এক করতে পারবে না। আরও অনেক কিছুই আমি করতে পারব। আমি যদি মরি, মেরিত্রা, তোমাকে নিয়ে মরব। এখন তুমি শপথ করে বলবে আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে?'

সন্ত্রস্ত চেহারা হলো মেরিত্রার। সে জানে, কাকু যা বলেছে, সত্যি। মিশরের সেরা যাদুকরদের একজন সে।

'মনে হচ্ছে কাজটা বিপজ্জনক,' অস্বস্তির সঙ্গে বললো মেরিত্রা, 'কী আপনি করতে চাইছেন তা বোধহয় অনুমান করতে পারছি। এখন বলুন, আপনার কথামত কাজ করলে কী আমি পাব?'

'আমাকে,' জবাব দিলো কাকু।

'শুনে ধন্য হলাম। আর কী?'

'ফারাওয়ের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী হিসেবে ফারাওয়ের পরেই মিশরের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও সম্মান।'

'প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী? তোমার সম্পর্কে যা শুনেছি, কাকু, তাতে সন্দেহ নেই সেই ক্ষমতা ও সম্মানের ভাগ নেয়ার জন্য আরও স্ত্রী থাকবে।'

'আর কোন স্ত্রী থাকবে না– আমি শপথ করে বলছি, মেরিত্রা।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করলো মেরিত্রা। তারপর জ্যোতিষীর চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি শপথ করছি। তবে এটাও বলি, তুমি তোমার শপথ রেখো, নইলে আরও খারাপ পরিণতি হবে তোমার। জেনে রেখো, নারীর নিজস্ব কিছু অশুভ ক্ষমতা থাকে।'

'তা আমি জানি, মেরিত্রা। এখন এদিকে এসো।'

উঠে দাঁড়ালো মেরিত্রা। কাকু দেয়ালের কাছে গিয়ে একটা গোপন জায়গা থেকে লোহার একটা বাক্স বের করে তার ভেতর থেকে বের করে আনলো একটা বই–বা বলা যেতে পারে রহস্যময় লেখাপূর্ণ প্যাপিরাসের তাড়া।

'এই বইয়ের মত আর কোন বই এই মিশরে নেই,' বললো কাকু। 'মেনার রাজত্বকালের আগে যখন দেব-রাজারা মিশর শাসন করতেন সে-সময় বিশ্বের সেরা জাদুকর এই বই লেখেন। তাঁর সমাধিমন্দিরে তাঁর হাড়গোড়ের ভেতর থেকে বহু কষ্টে এটা আমি উদ্ধার করেছি। তাঁর কা সমাধি থেকে উঠে এসে আমাকে ভয় দেখিয়েছিল। এ-বই যে পড়তে পারে তার শক্তির সীমা থাকে না। আর এ-বই ছুঁয়ে শপথ নিয়ে তা ভঙ্গ করার পরিণতি ভয়াবহ। আমি পড়তে পারি এ-বই। বুকের সঙ্গে বইটা চেপে ধর, মেরিত্রা, এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে বল–।'

শপথ বাক্য আউড়ে গেল কাকু, যাতে সূর্যের ওপাশে অন্ধকারের রাজ্যে বাস করা ভয়ানক সব দানবদের সাক্ষী মেনে বলা হলো শপথ ভঙ্গ করলে কেমন ভয়ানক লজ্জা, রোগ, দুর্ভাগ্য আর অনন্ত যন্ত্রণা শপথকারীর জীবনে নেমে আসবে।

চুপ করে শুনলো মেরিত্রা। তারপর বললো, 'শপথে তোমার অংশটা তো চেপে গেলে, বন্ধু। তুমি ফারাওয়ের প্রধানমন্ত্রী হলে আমি তোমার একমাত্র স্ত্রী হিসেবে তোমার সমান ক্ষমতা ভোগ করব এই কথা তো বললে না।'

'ও, হ্যাঁ, ভুলে গেছিলাম,' বলে কাকু কথাগুলো যোগ করে দিলো। তারপর দুজনেই শপথ করলো।

শপথের পর হঠাৎই মেরিত্রার চোখ গেল ছাদের দিকে। সেখানে ঝোলানো একটি স্ফটিক গোলকের ভেতর আগুনের শিখার মত একটা আভা ফুটে উঠেছে। একটু পরেই লাল রক্তের মত রং ধরলো সেই আভা। আস্তে আস্তে লাল রংটা একটু বিবর্ণ হয়ে লাল হয়ে ওঠা একটা

চোখের চেহারা নিলো। চোখটা তাকিয়ে আছে মেরিত্রার দিকে। একটু পরেই চোখ এবং রক্ত মিলিয়ে গেল, তার জায়গায় ফুটে উঠলো রানী নেতের-তুয়ার অবয়ব, সিংহাসনে বসা। বিভিন্ন দেশের মানুষ তাকে পূজা করছে। তার পাশে বসা রাজকীয় পোশাক পরা এক পুরুষ, যার মুখ ঢাকা রয়েছে মেঘে।

মেরিত্রার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালো কাকু। 'কী দেখলে?'

বললো মেরিত্রা যা দেখেছে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলো কাকু। তারপর যখন কথা বললো তার গলায় সন্দেহের সুর। 'আমার মনে হয় এটা একটা শুভসঙ্কেত–রানীর পাশে বসে আছে তার জীবনসঙ্গী। কিন্তু তার মুখটা ঢাকা কেন?'

'তা তো বলতে পারব না,' জবাব দিলো মেরিত্রা। 'তোমার ঐ লাল মদে কিছু একটা মেশানো ছিল মনে হচ্ছে–আমার মাথায় ধরেছে একেবারে। যাহোক, আমরা শপথে আবদ্ধ হয়েছি এটাই বড় কথা। আমার মনে হয় আমরা যা ভাবছি তার চেয়েও সুদূরপ্রসারী হবে এই শপথের প্রতিক্রিয়া, কারণ এধরনের অভিশপ্ত তলোয়ার দু-ধারে কাটে। এখন ঐ স্ফটিকের ওপর কিছু একটা চাপা দাও তো, এসব ছবি দেখতে আর ভাল লাগছে না।'

'কী বল! এসব জিনিস দেখার ক্ষমতা তোমার এত ভাল!' বললো বটে কাকু, তবে মেরিত্রার কথা মত স্ফটিক গোলকটা ঢেকেও দিল কাপড় দিয়ে। তারপর বললো, 'এবার সোজাসুজি সংক্ষেপে বলি–আমার হোঁৎকা মালিক আবি ফারাও হতে চায়। সবকিছু বিবেচনা করে মনে হচ্ছে এর সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে তার ভাস্তির সিংহাসনে উঠে পড়া।'

'মানে, রানীকে বিয়ে করা?'

'তা ছাড়া আর কী? রানীকে যে বিয়ে করে রানীর অধিকারে সে-ই শাসন করে।'

'হুঁ। নেতের-তুয়া সম্পর্কে কিছু জান তুমি?'

'আর দশজন যতটা জানে তার চেয়ে বেশি নয়। কিন্তু কী বলতে চাচ্ছ তুমি?'

'বলতে চাচ্ছি, তার অমতে যে তাকে বিয়ে করবে তার কপালে দুঃখ আছে। মেয়েমানুষ তো নয়, আগুন। মিশরের সব যাদুকরের চাইতেও–তুমি সহ–বেশি ক্ষমতা আছে ওর ভেতরে। সবাই বলে ও আমেনের মেয়ে। আমি বিশ্বাস করি কথাটা। আমার মনে হয় ওর ভেতরে দেবতা বাস করে। আর তাই যাকে ও অপছন্দ করবে তার

সর্বনাশ অনিবার্য।'

'সেটা আবির ভাবনার বিষয়। আমাদের ভাবনা হল তাকে ঐ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া। আর তোমার কথায় মনে হচ্ছে এতে রানীর সায় থাকবে না।'

'প্রশ্নই আসে না, কাকু। কানাঘুষা আছে যে রামেস নামে এক তরুণ সেনা কর্মকর্তাকে ও ভালবাসে। এই রামেস তার সামনে তার পাণিপ্রার্থী কেশ-এর যুবরাজকে হত্যা করা সত্ত্বেও তাকেই সে এক সেনাবাহিনীর প্রধান করে পাঠিয়েছে যুবরাজের মৃতদেহ তার বাবার কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য।'

'তা হতেই পারে। সবাই জানে রামেস তার দুধ-ভাই এবং তার দেহে রাজরক্ত আছে। তার ওপর সে দুর্দান্ত সাহসী এবং সুপুরুষ। যা-ই হোক, মেরিত্রা, রানীদের প্রেমে পড়ার অধিকার নেই। তোমার আমার মত সাধারণ মানুষেরই কেবল সে অধিকার আছে। আচ্ছা বলো তো, কুমার আবির ব্যাপারে ও কোন সন্দেহ করছে?'

'আমি ঠিক জানি না। তবে ওর পালক মা, মার্মিসের স্ত্রী এবং রামেসের মা আসতি সন্দেহ করে। এই মহিলা তোমার চাইতেও বড় যাদুকর–ফারাও যাতে মেফিসে না আসে সেজন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছিল। তবে তোমার চিঠি পাওয়ার পর আমিও প্রাণপণ চেষ্টা করে ফারাওকে রাজি করাই এখানে আসতে। বেচারি ফারাও–আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে। আর করে বলেই তথ্য সংগ্রহের কথা বলে এই রাতে তোমার এখানে আসতে পেরেছি।'

'তার মানে আসতি যা জানে রানীও তা জানবে। আর সে ফারাওয়ের চেয়ে শক্ত। আবির সব যুদ্ধজাহাজ আর সৈন্য-সামন্ত সত্ত্বেও সে মেফিস ছেড়ে পালিয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই–ফারাওকে এখানে থাকতে হবে। বাবাকে ছেড়ে মেয়ে থাকতে পারবে না।'

'ফারাওকে এখানে থাকতে বাধ্য করবে কীভাবে তুমি? নিশ্চয়ই–' কথা শেষ না করে ছাদের কাপড় ঢাকা স্ফটিক গোলকটার দিকে তাকালো মেরিত্রা।

'না, যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে যাতে কোন রক্তপাত না ঘটে। ফারাও বন্দী, এমনও যেন মনে না হয়। দুটোই ভয়ানক বিপদ ডেকে আনতে পারে। অন্য উপায় আছে।'

'বিষ?'

'সে-ও ভয়ানক বিপজ্জনক। কিন্তু ফারাও যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে?

যদি নড়াচড়া করতে না পারে? সেক্ষেত্রে আমরা বিয়েটা ঘটিয়ে দেয়ার জন্য কিছু একটা উপায় বের করে ফেলতে পারব না? আমি জানি ফারাও এখন সুস্থ। তবে···তোমাকে একটা জিনিস দেখাই, মেরিত্রা।'

ঘরের একপাশে একটা সিন্দুকের কাছে গিয়ে তার ভেতর থেকে মমির বাক্সের মত দেখতে একটা সিডার কাঠের বাক্স বের করলো। ওটার ঢাকনা খুলে হাতখানেক লম্বা একটা মোমের মূর্তি বের করে আনলো কাকু। হুবহু ফারাওয়ের মত দেখতে মূর্তিটার মুখ। মাথায় পরানো জোড়-মুকুট।

'কী ওটা?' ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে বললো মেরিত্রা।

'মন্ত্র দেয়া কা,' বললো কাকু। 'প্রাচীন ঐ জাদুর বইয়ে বলা কৌশলে তৈরি করে মন্ত্র দিয়ে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। ফারাওকে এটা সমাধিগৃহে নিয়ে যেতে পারে, যদি ঠিকমত কাজে লাগানো যায়। আশা করি তুমি পারবে কাজে লাগাতে।'

'আমি!' চমকে উঠে বললো মেরিত্রা। 'কেমন করে?'

'ফারাওয়ের বিশ্বস্ত এবং প্রিয় দাসী হিসেবে তার শোয়ার ঘরে ঢুকতে পার তুমি। তোমাকে যা করতে হবে, একা ঢুকে তার বিছানায় এটা এমনভাবে রাখবে যাতে ফারাওয়ের নিশ্বাস এর ভেতর ঢুকতে পারে। তারপর এটা বিছানা থেকে সরিয়ে এনে এই কথাগুলো আওড়াবে–

' "মোমের মূর্তি, মোমের মূর্তি, প্রভু ইফ ইলের নামে, তোমার ভেতরে যে ক্ষমতা লুকিয়ে আছে তার কসম খেয়ে তোমাকে আদেশ করছি, তোমার কোন অঙ্গহানি হলে যার আদলে তোমাকে তৈরি করা হয়েছে তারও যেন সেই অঙ্গহানি হয়।" এই কথা বলার পর মুর্তির পা দুটো প্রদীপের ওপর ধরবে। পা দুটো আধা গলা হয়ে উঠলে আগুনের ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে মূর্তিটা তোমার শোয়ার জায়গায় লুকিয়ে রেখে দেবে। মূর্তির পা দুটোর মত ফারাওয়ের দু'পা-ও অবশ হয়ে অকেজো হয়ে যাবে। তার পরে যদি আরও কিছু করতে হয়, সময় মত তোমাকে বলবো।'

যতই সাহসী আর ছলা-কলায় পটু হোক না কেন, মেরিত্রা ভয় পেয়ে গেল। 'আমি পারব না একাজ,' বললো সে। 'দেবতার বিরুদ্ধে তুকতাক যাদু খাটানো–আমার আত্মা নরকে যাবে এ-কাজ করলে। আর কোন উপায় বের করো, কাকু, নয়তো নিজেই তুমি ওটা ফারাওয়ের বিছানায় রাখো।'

মুখে হিংস্র অভিব্যক্তি আর চোখে ক্রুর দৃষ্টি ফুটে উঠলো

জ্যোতিষীর। 'এসো আমার সাথে, মেরিত্রা,' বলে সে হাত ধরে একটা খোলা জানালার কাছে নিয়ে গেল ফারাওয়ের একান্ত দাসীকে।

উঁচু মিনারের ওপর দিকের জানালা থেকে নিচে শহরের বাড়ি-ঘর সব ছোট ছোট দেখাচ্ছে, আর আকাশ মনে হচ্ছে খুব কাছে। 'দেখ, মেম্ফিস! আর ঐ যে নীলনদ আর মিশরের প্রশস্ত ভূমি চাঁদের আলোয় জ্বল জ্বল করছে। ঐ দিকে দেখ মিশরের প্রাচীন রাজাদের পিরামিড। এ-সবের ওপর কর্তৃত্ব করতে চাও আমার মত? চাও না, মেরিত্রা? আমার কথা মত কাজ করলে তা তুমি পারবে।'

'যদি না করি?'

'তোমার ওপর আমি এমন যাদুর ক্ষমতা প্রয়োগ করব, তোমার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাবে, মুখ থুবড়ে পড়বে ঐ শাদা দাগের ওপর। দাগের মত ওটা কী বুঝতে পারছ তো? রাস্তা। ওখানে পড়ে থাকবে তোমার দেহ, কুকুরে খুবলে খাবে। কাল সকালে হাড়গুলো ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। তুমি অনেক বেশি জেনে গেছ। এখন হয় তোমাকে আমার কথা মত কাজ করতে হবে নাহলে মরতে হবে। না, না! এখন করব বলে পরে ফাঁকি দেয়ার কথা ভুলেও ভেবো না। ঐ মোমের মূর্তি—ওটা আমার দাস। ও নজর রাখবে তোমার ওপর—আমার কথামত কাজ করছ কিনা। না করলে আমাকে এবং এর প্রভু দেবতাকে জানাবে। এখন বেছে নাও।'

'করব,' দুর্বল কণ্ঠে বললো মেরিত্রা। ঠিক সেই সময় তার মনে হল, জানালার বাইরে বাতাসে হালকা একটা হাসির শব্দ যেন শুনতে পেল সে।

'বেশ। তাহলে বাক্সটা লুকিয়ে নাও তোমার পোশাকের নিচে। ফেলে দিও না। দিলে ঐ মূর্তির ভেতর যা আছে তা চিৎকার করে উঠে তাড়া করবে তোমাকে। আমি যদি অন্য কোন খবর না পাঠাই, আগামীকাল রাতে তুমি মূর্তিটা ফারাওয়ের বিছানায় রাখবে, আর ভোরে সূর্যোদয়ের সময় ওটার পা আগুনের ওপর ধরার পর লুকিয়ে ফেলবে। পরে সুযোগ মত আমার কাছে দিয়ে যেও, যাতে প্রয়োজন হলে আমি আবার ওটাতে মন্ত্র দিতে পারি। এখন চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

৯
ফারাওয়ের ভাগ্য নির্ধারণ

পরদিন সকালে রানীকে কাপড় পরাতে পরাতে আসতি জিজ্ঞেস করলেন, যে জ্ঞান সে চাইছিল আমেন তা দিয়েছেন কিনা।

'তেমন কিছু না,' বললো তুয়া। 'অনেকগুলো দুঃস্বপ্ন দেখিয়েছেন, এবং প্রত্যেকটাতেই ছিল বাবার প্রিয় দাসী মেরিত্রা, কাল যার কথা তুমি বলছিলে। আমার মন বলছে ও ভয়ানক অশুভ কিছু টেনে আনছে আমাদের ওপর।'

'আমারও তাই মনে হয়, রানী,' আসতি জবাব দিলেন। 'আর সেজন্য ওকে সব সময় কাজে ব্যস্ত রাখা দরকার। কাল মাঝরাতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম। চাঁদের আলোয় হঠাৎ দেখি মন্দিরের উঠান পেরিয়ে সে আসছে। মনে হলো তার কাপড়ের নিচে কিছু একটা রয়েছে।'

'অত রাতে কোথা থেকে আসছিল?'

'মনেহয় শহর থেকে। ফারাওয়ের অনুমতিপত্র আছে ওর কাছে– যখন খুশি যেখানে খুশি যেতে-আসতে পারে। আমি মার্মিসকে বলেছিলাম রক্ষীদলের কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করতে। সে বলেছে, কালো আলখাল্লা পরা লম্বা এক লোক মেরিত্রাকে ফটক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে চলে যায়। দুজন নিবিষ্ট মনে কথা বলছিল। রক্ষীপ্রধানের বর্ণনা শুনে মনে হল, লোকটা জ্যোতিষী কাকু ছাড়া আর কেউ নয়।'

'এ তো ভাল খবর নয়, দাইমা। আর কী জানতে পেরেছ তুমি?'

'তেমন কিছু না। ফটকগুলোতে পাহারা যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে কড়া। সকালে আমার বিশেষ এক কাজে একজনকে থিবিতে পাঠানোর চেষ্টা করেছিলাম, পাহারাদাররা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে।'

'দেবতাদের কসম!' তুয়া বললো, 'আমার শাসনকাল এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই মেম্ফিসের সব ফটক গলিয়ে রান্নার পাত্র বানানো হবে, আর ফটক রক্ষীদের পাঠানো হবে মরুভূমির খনিতে কাজ করতে।...না, এধরনের হুমকি দেয়া বোকামি। আমি হুমকি দেব না। বরং আঘাত করব, যখন সময় হবে। এখন কি ফারাওয়ের সাথে কথা বলা যাবে?'

'না, রানী। উনি এর মধ্যেই উঠে পড়েছেন। এখন মেম্ফিসের

অভিজাতবর্গকে সাক্ষাৎ দিচ্ছেন। মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে যাবার আগ পর্যন্ত এ-নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন ফারাও–তুমিও তো যাবে ঐ অনুষ্ঠানে। এসো তোমার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেই।'

মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানটা বেশ ক্লান্তিকর মনে হলো তুয়ার। প্রথমে দীর্ঘ রথ শোভাযাত্রা। একেবারে সামনের রথে ফারাও আর আবি। দ্বিতীয়টিতে তুয়া আর আবির প্রথমা কন্যা। বয়সে সে তুয়ার চাইতে বেশ বড়, চোখ দুটো গোল গোল। তারপরে পর পর কয়েকটি রথে আমেনের পুরোহিতরা। আমেনের কন্যা এবং প্রধান পূজারিণী হিসেবে নেতের-তুয়া ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে এই পুরোহিতদের সমাবেশে পৌরোহিত্য করবে। রথে চেপে আরও এলো ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের প্রয়োজনীয় সব উপকরণ, মিস্ত্রি-কারিগরদের যন্ত্রপাতি এবং দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত অর্ঘ্য। আগে থাকতেই কেটে রাখা গর্তে বিরাট্যায়তন দুটি শিলাখণ্ড নামিয়ে দেয়া হলো। ফারাও এবং আমেনের ভোরের তারা নেতের-তুয়া যৌথভাবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা উচ্চারণ করলেন। অর্ঘ্য হিসেবে আনা উপকরণে চিরতরে ঢেকে দেয়া হলো গর্তের পাথর দুটি।

এরপর স্থপতিরা মন্দিরের নকশা প্রদর্শন করলেন। ফারাও তাদের উপহার দিলেন। সব যখন শেষ হলো তখন মধ্যাহ্ন ভোজের সময় হয়ে গেছে। ভোজের আগে আনুষ্ঠানিক ভাষণের পর খাওয়া-দাওয়ার মধ্য দিয়ে শেষ হলো ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান। ফারাওয়ের শোভাযাত্রা অন্য এক পথে ফিরে এলো তাঁর মেম্ফিসের আবাস সেখেত মন্দিরে।

সকাল থেকে যথেষ্ট ধকল গেলেও বিশ্রামের উপায় নেই। সেখেত মন্দিরের বাইরের দিকের এক মিলনায়তনে রাজকীয় আসন পেতে দেয়া হয়েছে। ফারাও এবং তুয়াকে বসতে হল জনগণ ও বিশিষ্ট জনদের আবেদন-নিবেদন শুনে ব্যবস্থা দেয়ার জন্যে। ক্লান্তিকর এই ব্যাপারটাও শেষ হলো এক সময়। আবি সেই সকাল থেকেই ফারাওয়ের সঙ্গে রয়েছে। সে জানালো তারও একটা একান্ত ব্যক্তিগত নিবেদন আছে। অতএব ভেতর দিকের আরেকটি কক্ষে এসে আবার বসলেন ফারাও। লিপিকররা ছাড়া সেখানে উপস্থিত কেবল তুয়া, কয়েকজন পারিষদ, রক্ষী-প্রধান মার্মিস এবং রাজ অন্তঃপুরের কয়েকজন নারী, যাদের মধ্যে আছেন আসতি আর মেরিত্রা। অন্যদিকে আবির সঙ্গে আছে তার জ্যোতিষী কাকু, তার বড় দুই ছেলে, তার প্রাদেশিক সরকারের কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, মেম্ফিসের প্রধান মন্দিরগুলোর পুরোহিতগণ এবং মরু-বেদুঈনদের ক্ষমতাশালী তিন

গোত্রপতি।

'কী তোমার নিবেদন, ভাই?' জিজ্ঞেস করলেন ফারাও।

'খুবই বড় এক প্রার্থনা আছে আমার, মহামহিম ফারাও,' মাটিতে শুয়ে পড়ে বললো আবি। 'আমার এই প্রার্থনা মিশরের ভালর জন্যে, আপনার নিজের ভালর জন্যে এবং আমি আপনার একান্ত অনুগত প্রজা, আমার ভালর জন্য। আমার প্রার্থনা আপনি আমার এই প্রার্থনা খুশি মনে মঞ্জুর করবেন।' উঠে দাঁড়িয়ে আবি ধীর কণ্ঠে বলে চললো, 'আমি বিয়ে করবার জন্য মহামহিম রানী, আমেনের কন্যা নেতের-তুয়ার পাণি প্রার্থনা করছি।'

বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইলেন ফারাও তাঁর ভাইয়ের দিকে। আর তুয়া, আগেই জানত কী আসছে, ঘাড় ফিরিয়ে কাছে দাঁড়ানো এক পারিষদকে প্রশ্ন করলো, মিশরের ইতিহাসে কোন রানীর তার চাচাকে বিয়ে করার নজির আছে কিনা। ইতিহাস বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন বলে খ্যাতি আছে এই পারিষদের। তিনি জানালেন, এমুহূর্তে তেমন কোন নজিরের কথা তাঁর মনে পড়ছে না।

'তাহলে এরকম একটা নজির তৈরি করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না,' সেই পারিষদকে উদ্দেশ্য করেই বললো তুয়া। 'এতে করে ভবিষ্যতে রাজপরিবারের কচি মেয়েদের বিপদে ফেলা হবে।'

তুয়া কথাগুলো বললো খুবই নিচুকণ্ঠে। আবি কিছুই শুনতে পেলো না। তবে সেই কথার কিছুটা ফারাওয়ের কানে গেল। শুনেই তিনি বলে উঠলেন, 'রানী নেতের-তুয়া সিংহাসনে আমার পাশে বসে এই রাজ্য শাসন করছে। তার চিন্তাই আমার চিন্তা, তার সিদ্ধান্ত আমার সিদ্ধান্ত। সুতরাং, আবি, অনুরোধটা তুমি তাকেই কর।'

অগত্যা আবি রানীর দিকে ফিরলো। হাত দুটো বুকের কাছে নিয়ে কুর্নিশ করে বললো, 'মহামান্য রানী, আপনার জন্য অদম্য এক ভালবাসায় আমার অন্তর প্লাবিত হচ্ছে–'

'উঁহু, কাকা,' বাধা দিয়ে বললো তুয়া, 'শুদ্ধ করে বলুন, "আপনার সিংহাসন আর ক্ষমতার জন্য এক অদম্য ভালবাসায়" ইত্যাদি ইত্যাদি।'

ফারাও আর জ্যোতিষী কাকু ছাড়া উপস্থিত ব্যক্তিদের সবাই হেসে ফেললেও ভ্রূ কুঁচকে উঠলো আবির। সে তার অসমাপ্ত বক্তব্য শেষ করার জন্য মুখ খুলতে গেল। কিন্তু তুয়া তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, 'আমি কালা নই, সম্মানিত কুমার, আমার কাকা। ফারাওকে উদ্দেশ্য করে বললেও আপনার কথা আমি শুনতে পেয়েছি। তার মর্ম ও গুরুত্ব বুঝতেও আমার অসুবিধা হয়নি। এর মধ্যে আমি বিষয়টি নিয়ে

উপস্থিত আমাদের একজন উপদেষ্টার সঙ্গে আলাপও করেছি। রাষ্ট্রীয় আইন এবং আপনার প্রস্তাবিত ধরনের সম্মিলনের বৈধতা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সেই উপদেষ্টা এর বিপক্ষে মত দিয়েছেন।'

আগুন ঝরা চোখে তাকালো আবি সেই পারিষদের দিকে। শীর্ণদেহ, পক্বকেশ বৃদ্ধ তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন প্যাপিরাস আর বইপত্রের ভেতর। আবির দৃষ্টির সামনে ভড়কে গিয়ে বলে উঠলেন, 'মাননীয় কুমার, আমি কেবল বলেছি এধরনের বিয়ের কোন নজিরের কথা আমার মনে পড়ছে না। তবে এক রানী তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে দত্তক নিয়ে বড় করে তুলেছিলেন, যিনি পরে ফারাও হয়েছিলেন।'

'একই কথা, বন্ধু,' মিষ্টি করে বললো তুয়া, 'মিশরের দীর্ঘ ইতিহাসে যার নজির নেই তা অবশ্যই অবৈধ। তবে আমার কাকা যদি আমাকে দত্তক নিয়ে আরও বড় করতে চান আমি তাকে ধন্যবাদ জানাব, যদিও তার বৈধ উত্তরাধিকারীরা তাতে খুশি হবে কিনা সন্দেহ।'

কৌশলে পরাজিত হয়েছে বুঝতে পেরে রেগে উঠলো আবি। বললো, 'আমি সরল সোজা একটা প্রস্তাব রেখেছি, মহামান্য রানী, সরল একটা উত্তর আমি পাওয়ার যোগ্য আশাকরি। সবাই জানে, মহামান্য রানী, আপনার বিয়ের এখনই যথার্থ সময়, এবং সরল মনে আমি আপনার স্বামী হওয়ার জন্য প্রস্তাব করেছি। সত্য বটে আমার বয়স আপনার চাইতে একটু বেশি–'

আবিকে শেষ করতে না দিয়ে সেই পারিষদকে তুয়া জিজ্ঞেস করলো, 'কুমার আবির জন্ম যেন কোন বছর? আপনার একই বছরে, তা-ই বলছিলেন না?'

'কিন্তু,' তুয়ার কথা শুনতেই পায়নি এমন ভঙ্গিতে বলে চললো আবি, 'আমার বয়স বেশি হলেও অন্য অনেক দিক থেকে আপনাকে পূর্ণতা দেয়ার সামর্থ্য আমার আছে। আমি এখানকার শাসক। আমার দেহে রয়েছে রাজরক্ত। তাছাড়া এই উত্তরাঞ্চলে কিছু অসন্তোষ আছে– বিশেষ করে মরুভূমির বেদুঈন উপজাতিগুলোর ভেতর। আমার প্রস্তাব মত সম্মিলন যদি ঘটে, এবং সেই সূত্রে রানীর স্বামী হিসেবে আমি মিশরের জোড় সিংহাসনে বসতে পারি তাহলে তাদের অসন্তোষ দূর হবে এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভূ-খণ্ডের মধ্যে যে ঐক্যের বন্ধন সূচিত হবে তা আগে কখনও দেখা যায়নি। তা যদি না হয়–' এখানে এসে কাকু মুখ থেকে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়তে গিয়ে আলতো করে

ছুঁয়ে গেল আবির পোশাক। এটা একটা সঙ্কেত। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল আবি।

'বলে যান, কাকা,' তুয়া বললো, 'তা যদি না হয় তাহলে কী হবে?'

'তাহলে, মহামান্য রানী, বিরাট ঝামেলা হতে পারে। না, জ্যোতিষী, আমাকে বাধা দিও না, আমি নির্ভয়ে সত্য বলব, তাতে যা-ই ঘটুক। ফারাও, আপনি অনেক বছর মিশর শাসন করেছেন। আমাদের স্বর্গীয় পিতাকে আমরা যখন সমাধিমন্দিরে রেখে আসি তারপর চল্লিশবার নীলনদের পানি তার পাড় প্লাবিত করেছে। এই এত বছরে একটা মাত্র সন্তান হয়েছে আপনার, তা-ও আমি থিবিতে গিয়ে আমাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করার আবেদন জানানোর পর। জেনে রাখুন, ফারাও, অনেকের কাছেই ব্যাপারটাকে অদ্ভুত মনে হয়েছে। তাঁরা এমনও ভাবছেন, এই অপরূপ সুন্দরী রানী, যাকে আমেনের কন্যা বলা হচ্ছে, যার সাথে আপনার চেহারা ও স্বভাবের কোন মিলই নেই, তাঁর মিশরের সিংহাসনে বসাটা বৈধ হয়েছে কিনা। আমি তাকে বিয়ে করলে এই সব প্রশ্ন চাপা পড়ে যাবে। নাহলে এই সব কানা-ঘুষা বাড়তে বাড়তে এমন ঝড় তুলবে, যা তার মাথা থেকে ঐ জোড়-মুকুট উড়িয়ে নিয়ে যাবে।'

আবির এই সোজা-সাপ্টা রাষ্ট্রদ্রোহমূলক বক্তব্য শুনে পাথরের মত জমে গেছে কামরার প্রতিটা লোক। আর তুয়ার চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে প্রচণ্ড ক্রোধে। জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুলতে গেল সে। কিন্তু তার আগেই আসন ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন ফারাও। সমস্ত ধৈর্য, ভদ্রতাবোধ বিদায় নিয়েছে। তাঁর চেহারাটা এমন হিংস্র আর রাজকীয় হয়ে উঠেছে যে উপস্থিত সবাই, এমনকি আবিও কুঁকড়ে গেল ভেতরে ভেতরে।

'এজন্যেই কি এতদিন আমি তোমাকে ভাই বলে স্বীকার করে এসেছি?' চিৎকার করে উঠলেন ফারাও। তাঁর মুখটা তাঁর পোশাকের মতই লাল হয়ে উঠেছে। 'এজন্যেই কি বহু বছর আগে থিবিতে যখন রাজহত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলে, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম? এজন্যেই কি আমি তোমাকে আমার মেম্ফিসের প্রশাসক করে রাজার মত শাসন করার সুযোগ ও সম্মান দিয়েছি? তুমি বুড়ো হাবড়া, আমার পিতার বর্বর দাসীর ছেলে, নিজেও একটা বর্বর স্বৈরাচারী! আমার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি মিশরের রানীকে, যে তোমার ভাইয়ের মেয়ে, বয়েসে তোমার নাতনীর সমান, তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করেছ, এটাই কি যথেষ্ট ছিল না? এর পরেও তোমার নোংরা মুখ থেকে তার

পবিত্র জন্মের ব্যাপারে এবং দেবতাদের পিতা আমেন সম্পর্কে কদর্য ইঙ্গিত শুনতে হবে? বেশ, আমেনকে অপমান করার বিচার আমেনই করবেন, যখন তুমি তাঁর অনন্তগৃহে যাবে। এখানে পৃথিবীতে তাঁর পুত্র ও সেবক হিশেবে বিচার করব আমি। মার্মিস, রক্ষীদের ডাক! গ্রেফতার কর এই রাজদ্রোহীকে। কালই আমরা রওনা হব থিবির পথে। সেখানেই আইন অনুযায়ী এর বিচার হবে।'

মার্মিস তাঁর গলায় ঝুলানো রুপোর একটা বাঁশি মুখে লাগিয়ে ফুঁ দিয়েই লাফ দিয়ে গিয়ে ধরে বসলেন আবির বাহু। আবিও ঝট করে তলোয়ার বের করলো মার্মিসকে কেটে ফেলার জন্য। আবির হাতে খোলা তলোয়ার দেখে তার সঙ্গে যারা ছিল সবাই দরজা দিয়ে ছুটে পালানোর চেষ্টা করলো। তাদের সঙ্গে গেল ফারাওয়ের 'বিশ্বস্ত' দাসী মেরিত্রা। কিন্তু তারা দরজা পেরোনোর আগেই মার্মিসের তীক্ষ্ণ বাঁশি শুনে বর্শা উঁচিয়ে এগিয়ে আসা রক্ষীরা তাদের আটক করলো। কয়েকজন রক্ষী এগিয়ে গিয়ে আবির হাত থেকে তলোয়ার কেড়ে নিয়ে তাকে মাটিতে পেড়ে ফেললো।

'এই বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহীকে বেঁধে রাখ!' বললেন ফারাও, 'কাল ও আমাদের সঙ্গে থিবিতে যাবে।'

'ওর ছেলেরা এবং যারা এখন ওর সাথে আছে তাদের কী হবে, মহানুভব?' জিজ্ঞেস করলো রক্ষীদের এক কর্মকর্তা।

'ছেড়ে দাও, ওরা কোন দোষ করেনি। আশাকরি প্রভুর পরিণতি দেখে ওরা শিক্ষা নেবে।'

এদিকে ধস্তাধস্তির ভেতর মেরিত্রা সরে কাকুর একবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। 'শোন,' মেরিত্রার কানে কানে বললো কাকু, 'কাল যা বলেছি সেই মত করবে আজ রাতেই। তাহলে বাঁচার একটা পথ পাওয়াও যেতে পারে। নইলে আমাদের মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না। বুঝেছ আমার কথা?'

'বুঝেছি। করব তোমার কথা মত,' একই রকম নিচু স্বরে বললো মেরিত্রা।

এর পরপরই রক্ষীর হ্যাঁচকা টানে আলাদা হয়ে গেল দুজন। রক্ষীরা আবির ছেলেদের সঙ্গে কাকুকে ধরে নিয়ে গিয়ে মন্দিরের বাইরে ছেড়ে দিল। মেরিত্রাকে তারা চেনে। ভুল করে ধরা হয়েছে মনে করে তাকেও কিছু না বলে ছেড়ে দেয়া হলো।

এক ঘণ্টা পর মার্মিস এবং আসতি দাঁড়িয়ে আছেন ফারাওয়ের সামনে।

তাঁরা দুজনই তাঁকে অনুনয় করে বলছেন যেন রাতেই মেম্ফিস্ ছেড়ে রওনা হন। তাঁরা জানালেন রানী এবং পারিষদবর্গেরও অভিমত তা-ই। কিন্তু সারাদিনের ধকল আর কিছুক্ষণ আগে যে ঝড় বয়ে গেছে মনের উপর দিয়ে তাতে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছেন ফারাও। কিছুতেই তিনি রাজি হলেন না।

'রাতে আমি ঘুমাব, রওনা হব কাল সকালে,' বললেন ফারাও। 'তারচেয়ে বড় কথা যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ হবার আগেই আমার নিজের নগর থেকে চোরের মত পালাব আমি? এমন কাপুরুষের কাজ করার জন্য আমাকে চাপ দিচ্ছ কেন তোমরা?'

জবাব দিলেন মার্মিস, 'কারণ, মহানুভব, আমরা নিশ্চিত, আপনাকে চিরতরে এখানে রেখে দেয়ার জন্য একটা ষড়যন্ত্র পাকানো হচ্ছে। বিকেলেও যদি আপনি চলে যাওয়ার চেষ্টা করতেন, পারতেন না। কিন্তু রাতে পারবেন। আবি বন্দী হওয়ায় তার লোকদের মধ্যে হতাশা আর বিশৃঙ্খলা চলছে। নেতৃত্বশূন্য রক্ষীরা রাতে ফটকের দরজা খুলে দিতে আপত্তি করবে না। কিন্তু সকাল হতে হতে একজন নেতা তারা পেয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনার পক্ষে ফটক পেরোনোও অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে।'

'কী! তুমি বলতে চাইছ আমিও বন্দী? না, বন্ধু, ফারাওয়ের নির্দেশে ফটক খুলবে। যদি না খোলে আমি ধুলোর সাথে মিশিয়ে দেব এই মেম্ফিসকে। এর মানুষদের ফেরত পাঠিয়ে দেব তাদের গুহা জীবনে। ওরা কি মনে করে আমি দয়াশীল এবং ভদ্র বলে প্রয়োজনের সময়ও তলোয়ার ধরতে পারব না? ওরা কি ভুলে গেছে দক্ষিণের বিদ্রোহীদের কেমন করে আমি দমন করেছিলাম, কেমন করে ওদের শহর-গ্রাম আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলাম? কাল আমরা রওনা হব, তার আগে নয়। এই আমার শেষ কথা।'

ফারাও যা বলেছেন তার পরে আর কথা চলে না। সেটা আইনসিদ্ধও নয়। মার্মিস চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন। কিন্তু আসতি দুঃসাহস দেখালেন কথা বলার।

'ও মহামহিম ফারাও, আপনার এই দাসীর ওপর রাগ করবেন না। মহানুভব, আপনি জানেন, আমার কিছু অতিলৌকিক ক্ষমতা আছে। কখনও কখনও মৃতদের আত্মারা আমার কানে কানে বলে যায় সামনে কী ঘটবে। কিছুক্ষণ আগে যখন রানীর কাছ থেকে এসে একা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিলাম তেমনি একটা সঙ্কেত আমি পেয়েছি। মহানুভবের স্বর্গীয় স্ত্রী রানী আহুরা, যিনি আমার বন্ধু এবং মনিব

ছিলেন, তাঁর আত্মা আমার সামনে এসে বললেন,

' "আসতি, এখনই গিয়ে ফারাওকে বল, তাঁর এবং আমাদের রাজকীয় কন্যার সামনে ভয়াবহ বিপদ। এখনই যেন তিনি মেম্ফিস ছেড়ে চলে যান। নইলে এখানেই তাঁকে শেষকৃত্যের জন্য প্রস্তুত করা হবে, আর আমেনের ভোরের তারা ঢাকা পড়বে ভয়ানক লজ্জার মেঘে। তাঁর সিংহাসনের আশেপাশেই থাকে এমন এক নারী আর তার দোসর যাদুকর সম্পর্কে তাঁকে সাবধান করে দাও। এই দুজন গতরাতে একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে।" '

'ভালই স্বপ্ন দেখতে পার তুমি, আসতি,' বললেন ফারাও। 'তোমার এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দাও। আমার সিংহাসনের আশপাশের যে নারী আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে সে কে? আর কোন যাদুকরের সাথে মিলে সে ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে?'

'স্বর্গীয় রানী তা আমাকে বলেননি, মহানুভব, তবে আমার নিজের কৌশলে আমি জেনেছি সেই নারীর নাম মেরিত্রা, আপনার প্রিয় দাসী। আর যাদুকরের নাম কাকু। কাল রাতে এই কাকুর কাছে গেছিল মেরিত্রা।'

হেসে ফেললেন ফারাও। 'কী বলছ তুমি, আসতি? ঐ লম্বু বুড়ো জ্যোতিষী, যে তার মালিককে গ্রেপ্তারের পর পালানোর পথ খুঁজে পাচ্ছিল না? ও তো সাধারণ এক গুপ্তচর ছাড়া কিছু নয়। বহু বছর যাবৎ আমি নিয়মিত মাসোহারা দিয়ে আসছি ওকে। ব্যাটা ভাবে ওর মত জ্ঞানী কেউ নেই, আসলে হাতুড়ে। আর মেরিত্রা–বহু বছর আগে আবির এক ষড়যন্ত্রের কথা আমার কাছে ফাঁস করে দিয়েছিল। আসতি, তুমি উচ্চবংশজাত এবং বুদ্ধিমতি, আমি তোমাকে ভালবাসি এবং সম্মান করি যেমন করে রানী, আমার কন্যা। কিন্তু ভাবিনি তুমিও ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়তে পার। আসতি, নিজের মনকে চোখ ঠেরো না, স্বর্গীয় আহুরা নয়, ঈর্ষাই তোমার কানে কানে বলে গেছে এসব কথা। তোমার এসব আতঙ্ক নিয়ে তুমি বিদায় হও, মেরিত্রা আমার কাপড় ছাড়িয়ে দেয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে। তারপর মজার মজার গল্প বলে ও আমাকে ঘুম পাড়াবে।'

'ঠিক আছে, মহামহিম ফারাও, আমি তাহলে যাই। আপনার ঘুম সুখের হোক।'

সেরাতে দু-চোখের পাতা এক করতে পারল না তুয়া। যখনই চোখ বন্ধ করে নানা রকম দৃশ্য ভেসে ওঠে মনের পর্দায়। আতঙ্ককর অদ্ভুত সব

দৃশ্য। প্রতিটিতেই অবধারিতভাবে উপস্থিত মোটা ভয়ঙ্করদর্শন আবি। থিবিতে কেশ যুবরাজের সম্মানে আয়োজিত ভোজসভায় আসতি ফুলদানির ভেতর থেকে যুবরাজ আমাথেলের চেহারার বাঁদর বের করে এনেছিলেন। সেই একই দৃশ্য আবার দেখলো তুয়া, তবে আমাথেলের বদলে বাঁদরের চেহারা নিয়ে ফুলদানির ভেতর থেকে খোলা তলোয়ার হাতে বেরিয়ে এলো আবি, মাথায় তার ফারাওয়ের মুকুট। ফুলদানি থেকে বেরিয়েই সে লোভাতুর দৃষ্টি দিয়ে তুয়ার শরীরটাকে চাটতে লাগলো। পা টিপে টিপে এগিয়ে আসতে লাগলো তাকে ধরবার জন্য। অথচ তুয়া একটু নড়তে পারল না। কিসে যেন তাকে সিংহাসনের ওপর ঠেসে ধরে রেখেছে।

আর সহ্য করতে না পেরে চোখ মেলে অন্ধকারে তাকিয়ে রইল তুয়া। তাতেও স্বস্তি নেই। অন্ধকার থেকে ভেসে এলো কণ্ঠস্বর, মৃত্যু আর যুদ্ধের কথা বলছে। কানে আঙুল চাপা দিয়ে তুয়া তার সমস্ত মনোযোগ রামেসের ওপর নিবদ্ধ করার চেষ্টা করলো। তার উজ্জ্বল দু-চোখ, পৌরুষদৃপ্ত মুখ, দৃঢ় পায়ে হালকা চালে চলার ছন্দ সে মনের চোখে দেখার চেষ্টা করলো। কতদিন দেখা হয় না রামেসের সাথে! ওকে ছাড়া নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ আর অরক্ষিত মনে হচ্ছে তুয়ার। কোথায় এখন রামেস? কী ঘটেছে ওর ভাগ্যে? তুয়ার মনে হলো তার ভেতর থেকে কে যেন বলছে, মারা গেছে। ওহ! রামেস যদি মারা গিয়ে থাকে, কী করবে ও? রামেস যদি না-ই থাকে কী লাভ মিশরের রানী হয়ে থেকে?

ভয়ানক নিঃসঙ্গতার বোধটা চেপে বসলো তুয়ার ওপর। নিঃশব্দে বিছানা থেকে নেমে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সে। আসতির দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ভেতরে কথার আওয়াজ। মার্মিস বোধহয় রয়েছেন স্ত্রীর সঙ্গে। কিন্তু না, আসতিরই কণ্ঠস্বর। কান খাড়া করে শুনলো তুয়া। প্রার্থনা করছেন আসতি। ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজা। ছোট একটা লণ্ঠন জ্বলছে ঘরে। মৃদু আলোয় তুয়া দেখলো, ধবধবে শাদা পোশাক আসতির পরনে। এলো চুলগুলো কাঁধ ছাড়িয়ে নিচে নেমে এসেছে। হাত দুটো ওপর দিকে তোলা। হঠাৎ করেই আসতি খেয়াল করলেন তুয়াকে। লণ্ঠনের মৃদু আলো দরজা পর্যন্ত পৌঁছায়নি। অন্ধকারে তাকে চিনতে পারলেন না আসতি। তাঁর প্রার্থনা শুনে কোন প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয়েছে মনে করে বলে উঠলেন, 'ও আত্মা, সামনে এসে পরিচয় দিন, আজকের মত আর কখনও আপনার প্রয়োজন অনুভব করিনি।'

'আত্মা নয়, আমি,' বললো তুয়া। 'এত রাতে আত্মার সন্ধান করছ কেন, দাইমা? এর মধ্যেই কি যথেষ্ট বিপর্যয়ের মধ্যে পড়িনি, যে আরও বিপদ ডেকে আনার চেষ্টা করছ?'

'আত্মাদের ডাকছি বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে। আমারও মনে হচ্ছে, রানী, আমরা মারাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছি। ভয়ানক সব যাদুর খেলা চলছে এই রাতে। বাতাসে তার গন্ধ পাচ্ছি। কিন্তু তুমি না ঘুমিয়ে এখানে কেন?'

'ঘুম আসছে না। চোখ বুজলেই ভয় আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। এই জঘন্য মেম্ফিসে আসাই আমাদের উচিৎ হয়নি!'

'ভয় পেয়ো না, মা,' তুয়াকে জড়িয়ে ধরে বললেন আসতি। 'কাল সকালেই আমরা এই শহর ছেড়ে চলে যাব। ফারাওয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। রক্ষীরা এর মধ্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। আবি ঠেকাতে পারবে না। অভিশপ্ত লোকটা এখন কারাগারে।'

'কবর ছাড়া আর কোন কারাগার ওকে আটকে রাখতে পারবে না, মা। ওহ্! বাবা যে কেন ওকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন না? আমি হলে তা-ই করতাম।'

'ও নেতের-তুয়া, যা ঘটেছে নিয়তির বিধান মতই ঘটেছে। ফারাও তাঁর নিজের বা আমাদের নিয়তিকে তো ইচ্ছে করলেই খণ্ডন করতে পারবেন না।'

আসতির কথা শেষ হওয়ার আগেই নিচে কোথাও থেকে কারো তীব্র যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ উঠলো। সেই সঙ্গে সিঁড়িতে ধুপ ধাপ পায়ের আওয়াজ।

'কী হয়েছে?' লাফ দিয়ে দরজার কাছে গিয়ে চিৎকার করলেন আসতি।

'ফারাও হয় মারা গেছেন, নয় তো যাচ্ছেন!' আতঙ্কিত এক কণ্ঠস্বর জবাব দিলো। 'মহামান্য রানীকে এখনই ফারাওয়ের কাছে আসতে বলুন!'

তাড়াতাড়ি বাইরে বেরোনোর পোশাক পরে সরু সিঁড়ি বেয়ে রুদ্ধশ্বাসে নেমে ফারাওয়ের ঘরে পৌঁছুলেন ওঁরা। এরই মধ্যে ফারাওয়ের চিকিৎসকরা পৌঁছেছেন সেখানে। কথা বলতে পারছেন না ফারাও, তবে তাঁর চোখ খোলা। মেয়েকে চিনতে পারলেন। অনেক কষ্টে হাত তুলে তাকে কাছে যাওয়ার ইশারা করলেন।

'কী হয়েছে বাবার?' প্রধান চিকিৎসককে জিজ্ঞেস করলো তুয়া।

ফারাওয়ের পায়ের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে ফেললেন চিকিৎসক।

তুয়া দেখলো পা দুটো শাদা আর থকথকে হয়ে গেছে, আগুনে পুড়লে যেমন দেখায় সেরকম।

'কী অসুখ এটা?' আবার জিজ্ঞেস করলো তুয়া।

'জানি না, মহামান্য রানী, এমন কোন রোগের কথা জীবনে আমরা শুনিনি, দেখা দূরে থাক। হঠাৎ করেই মাংস নষ্ট হয়ে দুটো পা অচল হয়ে গেছে।'

'আমি জানি কী হয়েছে,' বললেন আসতি। 'অসুখ নয়। কালো যাদুর প্রভাবে এমন হয়েছে। আবি অথবা তার কোন যাদুকরের কাজ। শেষ কে ছিল মহামহিম ফারাওয়ের কাছে?'

'ফারাওয়ের একান্ত পরিচারিকা মেরিত্রা সম্ভবত,' জবাব দিলেন প্রধান চিকিৎসক। 'রক্ষী বললো, সে-ও প্রায় দুঘণ্টা আগে চলে যায় এখান থেকে। আমি এসেছিলাম মহানুভব কেমন ঘুমাচ্ছেন দেখতে। এসে দেখি এই অবস্থা।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মাথা সোজা করে দাঁড়ালো তুয়া। বললো, 'আমার পিতা গুরুতর অসুস্থ। কথা বলতে পারছেন না। এই অবস্থায় আবারও মিশরের শাসন ক্ষমতা আমার একার হাতে তুলে নিতে হচ্ছে। এই মুহূর্ত থেকে আমার নির্দেশে সব চলবে। এক্ষুনি কুমার আবিকে কারাগার থেকে ভেতরের মিলনায়তনে নিয়ে আসা হোক। আমি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করব। পরিচারিকা মেরিত্রাকেও খোলা তলোয়ার হাতে পাহারা দিয়ে নিয়ে এসো।'

কুর্ণিশ করে চলে গেল রক্ষী। কয়েকজন রক্ষী গেল মিলনায়তনে বাতি জ্বালতে। তুয়া ফারাওয়ের কামরা থেকে বেরিয়ে পাশের একটা কামরায় পায়চারি করতে লাগলো। একটু পরেই ফিরে এলো আবিকে আনতে গিয়েছিল যে সেই রক্ষী।

'ও মহামান্য রানী, রাগ করবেন না আমার ওপর, কুমার আবি নেই,' আতঙ্কিত স্বরে বললো সে। 'পালিয়েছেন উনি। পরিচারিকা মেরিত্রাকেও পাওয়া যাচ্ছে না।'

'এটা কী করে সম্ভব?' শীতল গলায় বললো তুয়া।

'মহামান্য রানী, ছোট ফটকটা খোলা রাখা হয়েছিল। কালকের যাত্রার প্রস্তুতির জন্যে একটু পরপরই লোকজন আসা যাওয়া করছিল। এর মধ্যে ঘণ্টাখানেক আগে মেরিত্রা ফটকে এসে ফারাওয়ের অঙ্গুরীয় দেখিয়ে বলে, ফারাওয়ের কাজে সে বাইরে যাচ্ছে। তার সঙ্গে ছিল আরবী পোশাক পরা মোটা এক লোক। উটের ব্যবসায়ী। উটের বিষয়ে কথা বলতে প্রতিদিনই কয়েকবার সে আসা যাওয়া করে। এখন মনে

হচ্ছে মোটা লোকটা আবি ছাড়া কেউ নয়। যেখানে তাকে রাখা হয়েছিল সেই প্রকোষ্ঠে একটা গোপন পথ আছে। আমরা কেউ জানতাম না। যে আরবটার পোশাক পরে সে পালিয়েছে তাকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে আমাদের ধারণা আশেপাশেই কোথাও সে ঘুমাচ্ছে অথবা অজ্ঞান হয়ে আছে।'

'সব ফটক বন্ধ করে দাও!' নির্দেশ দিলো তুয়া। 'কেউ যেন বেরোতে বা ঢুকতে না পারে! আসতি, তুমি কয়েক জনকে নিয়ে মেরিত্রার ঘরে যাও। ভাল করে তল্লাশি করে দেখ। এর মধ্যে সে ফিরেও এসে থাকতে পারে।'

গেলেন আসতি, এবং অল্প পরে যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর হাতে কাপড়ে মোড়া কী একটা যেন। 'মহামান্য রানী, মেরিত্রা নেই,' বললেন আসতি। 'ওর বিছানার নিচে এটা পাওয়া গেছে।' কাপড়ে মোড়া জিনিসটা টেবিলের ওপর রাখলেন আসতি।

'কী এটা? কোন বাচ্চার মমি?' জিজ্ঞেস করলো তুয়া।

'না, রানী, মানুষের মূর্তি।'

কাপড় সরিয়ে ফেলে মোমে তৈরি মূর্তিটা দেখালেন আসতি। হুবহু ফারাওয়ের মত দেখতে। পা দুটো গলে যাওয়া এবং কিছুটা বাঁকানো। গলে যাওয়া মোমের ভেতর হাতির দাঁতে তৈরি হাড় এবং সরু তার দিয়ে তৈরি স্নায়ু দেখা যাচ্ছে। থুতনির নিচে যেখানে জিহ্বার গোড়া থাকার কথা সেখানে তীক্ষ্ণধার কাঁটা বেঁধানো। জিনিসটা এমন বাস্তব যে দেখে গা শিউরে ওঠে। আরও আতঙ্ককর ব্যাপার হচ্ছে, বিছানায় শোয়া ফারাওয়ের অবস্থা ঠিক মোমের মূর্তিটার মত।

দেয়ালে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রইল তুয়া। তারপর আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালো। 'চিকিৎসক, পারিষদবর্গ এবং রক্ষী-কর্মকর্তাদের যার যার পক্ষে আসা সম্ভব সবাইকে ডাক,' নির্দেশ দিলো সে। 'ফারাওয়ের বিরুদ্ধে তাঁর ভাই কুমার আবি আর তার যাদুকর কাকু এবং তাদের সহযোগী মেরিত্রা কী ভয়বহ অপরাধ করেছে সবাই দেখুক।'

তুয়ার নির্দেশমত সবাইকে ডেকে আনা হলো। টেবিলের ওপর ফারাওয়ের মোমের মূর্তিটা দেখে শিউরে উঠলেন তাঁরা। কেউ কেউ অভিশাপ-বাক্য উচ্চারণ করতে লাগলেন।

'ওদের অভিশাপ দিয়ে লাভ নেই,' বললো তুয়া, 'ওরা এমনিতেই অভিশপ্ত। সময় মতই এর প্রতিফল ওরা পাবে। আপনাদের ডেকেছি ওদের অপরাধ স্বচক্ষে দেখার জন্য। লিপিকর কই? দ্রুত লিখে ফেল

এর বিবরণ।'

লিপিকরের লেখা শেষ হওয়ার পর রানী এবং উপস্থিত সবাই সাক্ষী হিসেবে তাতে স্বাক্ষর করলেন। এরপর তুয়া মূর্তিটার দ্বারা ফারাওয়ের আরও ক্ষতি হওয়ার আগেই সেটা ধ্বংস করে ফেলার নির্দেশ দিলো। ওসিরিসের এক পুরোহিত মূর্তিটা তুলে নিয়ে চলে গেলেন।

ফারাওয়ের কামরায় ফিরে এসে তাঁর বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো তুয়া। চোখ বন্ধ ফারাওয়ের, যেন ঘুমিয়ে আছেন। একটু পরেই চমকে জেগে উঠলেন তিনি। উন্মাদের মত চারপাশে তাকাতে তাকাতে কথা বলার ভঙ্গিতে ঠোঁট নাড়তে লাগলেন। কিন্তু কোন শব্দ বেরোলো না তাঁর মুখ দিয়ে। হঠাৎই স্বর ফিরে পেলেন ফারাও। অস্বাভাবিক ঘড়ঘড়ে এক কণ্ঠে বলে উঠলেন,

'ওরা আমাকে জাদু করেছে! পুড়ে যাচ্ছে! আমার গা পুড়ে যাচ্ছে।' প্রচণ্ড যন্ত্রণায় বিছানার ওপর তড়পাতে লাগলো ফারাওয়ের দেহ। 'তুয়া, মা আমার, প্রতিশোধ নিও! কোন কিছুকেই ভয় পেয়ো না! দেবতারা আছেন তোমার সঙ্গে। আমি তাঁদের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছি। ওহ! পুড়ে গেল, জ্বলে গেল!'

এরপরই তাঁর মাথাটা পেছন দিকে হেলে পড়লো। মৃত্যুর শান্তি নেমে এলো যন্ত্রণাকাতর ভ্রূর ওপর। তুয়া সেই মৃত ভ্রূতে আলতো করে চুমু খেলো। তাঁর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করলো। তারপর সোজা হয়ে বললো,

'চিরশান্তি নেমে এসেছে ফারাওয়ের ওপর। ওসিরিসের অনন্ত রাজ্যের পথে প্রস্থান করেছেন তিনি। সবাইকে জানিয়ে দিন, ফারাও মারা গেছেন, এখন থেকে আমি একা মিশর শাসন করছি। ওসিরিসের পুরোহিতকে পাঠিয়ে দিন, শেষকৃত্যের আয়োজন করতে হবে তাঁকে।'

রানীর নির্দেশমত এলেন পুরোহিত। কিন্তু দরজার কাছে হাত ধরে তাঁকে থামিয়ে আসতি জিজ্ঞেস করলেন, 'মোমের মূর্তিটা কীভাবে ধ্বংস করেছেন?'

'এই মন্দিরের পুরনো নিভৃতকক্ষে বেদীর ওপর রেখে পুড়িয়ে দিয়েছি।'

'ওহ, গর্দভ!' বললেন আসতি। 'মাটিতে পুঁতে ফেলতে হত। মূর্খ, তুমি মন্ত্র পড়া ঐ মূর্তির সঙ্গে সঙ্গে ফারাওকেও পুড়িয়ে মেরেছ।'

শুনে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল পুরোহিত। শেষকৃত্যের ক্রিয়াকর্ম সাধনের জন্য আরেকজন পুরোহিতকে ডাকা হলো।

১০
কা-এর আগমন

ভোর হয়েছে মেম্ফিসে। চিকিৎসকরা যতটুকু সম্ভব ফারাওয়ের দেহে মলম লাগিয়ে মমি করার চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যে তুয়া তার পারিষদবর্গ ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছে। দীর্ঘ চুলচেরা আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে তাঁরা খুবই বড় বিপদে পড়েছেন। আবি পালিয়েছে। তাকে আবার ধরা যাবে কিনা সন্দেহ। এদিকে মেম্ফিস আর তার আশেপাশে আবির হাজার হাজার সৈন্য মোতায়েন রয়েছে। বিপরীতে রাজকীয় সৈন্য আছে মাত্র পাঁচ দল– প্রতি দলে একশো করে। তারাও আবার রয়েছে নগরীর সড়ক-জাল আর ইট-কাঠের স্তূপের মাঝখানে প্রায় ফাঁদে পড়া অবস্থায়।

সেনাকর্মকর্তাদের একজন পরামর্শ দিলো, মন্দিরের দেয়াল ভেঙে নৌপথে পালানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। মন্দিরের গা ঘেঁষে নীলনদে নোঙ্গর করে আছে কয়েকটি রাজকীয় বজরা। সেগুলোতে চেপে বসতে পারলেই হলো। অনুমোদন পেলো এই পরিকল্পনা। কিন্তু কাজ শুরু করতে গিয়ে দেখা গেল বজরাগুলো দখল করে উজানের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এরপর হাতে থাকলো কেবল দুটি বিকল্প– প্রাচীন মন্দিরে থেকে গিয়ে সাহায্যের জন্য লোক পাঠানো অথবা যা সৈন্য আছে তা-ই নিয়ে সাহস করে নগরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ফটক ভেঙে বেরিয়ে যাওয়া, এবং নৌকা দখল করে নৌপথে অনুগত কোন নগরীতে চলে যাওয়া, আর সেটা করা না গেলে স্থল পথে যাওয়ার চেষ্টা করা।

কোনটা করলে ঠিক হবে তা নিয়ে দুদলে ভাগ হয়ে গেল তুয়ার সঙ্গীরা। শেষে সিদ্ধান্ত দেয়ার ভার পড়ল রানীর ওপর। একটু ভেবে তুয়া বললো, 'এখানে আমি থকব না। এখানে থাকলে অবরুদ্ধ অবস্থায় না খেয়ে মরতে হবে, নয়তো সাহায্য আসার আশায় বসে থাকতে থাকতে একদিন আমার বাবার হত্যাকারী ঐ জঘন্য লোকটার সৈন্যদের হাতে বন্দী হতে হবে। তারচেয়ে বরং আমি রাস্তায় যুদ্ধ করে মরতে রাজি। তাতে আর কিছু না হোক নিষ্কলুষ দেহে সূর্যের ওপারে অনন্ত রাজ্যে বাবার সাথে যোগ দিতে পারব। মধ্যরাতে আমরা রওনা হব।'

পারিষদ-কর্মকর্তা সবাই রানীর কথা মেনে নিয়ে প্রস্তুতি শুরু

করলেন। ওদিকে রাজগৃহের নারীরা ফারাওয়ের মৃত্যুতে শোকসূচক আর্তনাদ শুরু করলো। একই সঙ্গে উঁচু মিনার থেকে ঘোষণা করা হতে লাগলো আমেনের ভোরের তারা, 'গৌরবে রা-য়ের মত, সৌন্দর্যে দেবী হাথোর' নেতের-তুয়ার উত্তর ও দক্ষিণ ভূখণ্ড এবং মিশরের প্রজাদের একক সার্বভৌম শাসক হিসেবে আবির্ভাবের সংবাদ। বার বার এই ঘোষণা দেওয়া হতে লাগলো। শুনে নিচে জনতার কেউ কেউ আনন্দ প্রকাশ করলো। তবে কুমার আবির ভয়ে বেশির ভাগই রইল চুপ। ঘোষণায় আবিকে এসে রানীর কাছে আনুগত্য প্রকাশের আহ্বান জানানো হলো। কিন্তু আবির দিক থেকে তার কোন আলামত দেখা গেল না।

অবশেষে এলো মধ্যরাত। সঙ্কেত পাওয়া মাত্র ফটক খুলে গেল। প্রথমেই ফটক পেরোলো কয়েকজন রক্ষীর ছোট একটা দল। তারপর ফারাওয়ের দেহ বহন করে কয়েকজন পারিষদ। মন্দিরের কিছু পুরনো চিনার কাঠের শাদামাঠা এক শবাধারে করে নেয়া হচ্ছে মিশরের মহাপরাক্রমশালী সম্রাটের মৃতদেহ। পেছনে রাজ অন্তঃপুরের নারীরা। তাদের পিছনে পুরোহিত আর শবযাত্রার গায়কদল। প্রাচীন এক শোকগীতি গাইতে গাইতে চলেছে তারা। কোনরকম বিপদের আশঙ্কা আছে, তাদের আচরণে এমন কিছু বোঝার উপায় নেই। তাদের পরে মালপত্র বাহকদল, এবং তারপর রাজকীয় দেহরক্ষীদের মাঝে রথে চড়ে স্বয়ং রানী। পুরুষের মত পোশাক তার পরনে। পাশে একান্ত পরিচারিকা ও দাই মা আসতি।

প্রথম কিছুক্ষণ ভালই চললো সব। মন্দিরের সামনের বিরাট চত্বরটা ফাঁকা। ফারাওয়ের শববাহী শোভাযাত্রা চত্বরে উঠে এগিয়ে চললো মাইলখানেক দূরে নগর ফটকের দিকে। এরপর সারি বেঁধে চত্বরে পৌঁছুলো রাজকীয় রক্ষীরা। হঠাৎ করেই, যেন মাটি ফুঁড়ে, বেরিয়ে এলো বিরাট এক সেনাদল। পাশের এক সড়কে লুকিয়ে ছিল তারা।

এই সেনাদলের সামনের সারি থেকে কেউ একজন চিৎকার করে উঠলো, 'থাম!'

একই সঙ্গে সৈন্যরা চত্বরের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে রানী ও তার সঙ্গী পারিষদ ও কর্মকর্তাদের ঘিরে ফেললো। কয়েকজন সৈন্যের একটা দল এগিয়ে গেল রানীর রক্ষীদের দিকে। আবির চার ছেলে রয়েছে তাদের ভেতর। তারা কুমার আবির নামে রানীকে তাদের হাতে তুলে দিতে বললো। তারা আশ্বাস দিলো রানীকে তারা সসম্মানে নিয়ে

যাবে, আর তার সঙ্গে যারা আছে তাদের মধ্যে যারা চলে যেতে চায় তাদের বিনা বাধায় চলে যেতে দেয়া হবে।

রানীর রক্ষীদলের প্রধান মার্মিস গিয়ে তুয়াকে জানালেন একথা।

'ওদের বলে দিন,' জবাব দিলো তুয়া, 'মিশরের রানী বিদ্রোহী খুনীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে না, বরং তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হত্যা করাই তার কাজ।'

মার্মিস গিয়ে জানালেন রানীর বক্তব্য। পরমুহূর্তে রানীর সৈন্যদের ছোঁড়া এক ঝাঁক তীর ছুটে গেল আবির সৈন্যদের দিকে। আবির চার ছেলে এবং তাদের সঙ্গীদের বেশির ভাগই ঝুঁকে পড়ে আত্মরক্ষা করলো। তারপর শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। রানীর সেনাদল ছোট, তবে বাছাই করা লোক নিয়ে গঠিত, এবং তারা ক্রোধে ক্ষোভে মরীয়া হয়ে আছে। রানী তুয়া সে-রাতে মোটেই নারীর ভূমিকা পালন করলো না। রথের ওপর দাঁড়িয়ে এমনভাবে সে তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে ধেয়ে গেল, চাঁদের অনুজ্জ্বল আলোয় মনে হতে লাগলো কোন ক্রুদ্ধ দেবী শত্রুদলনে চলেছেন। শত শত তীর বা বর্শা তার দিকে ছুটে এলেও একটাও তার বা তার রথের ঘোড়াগুলোর গায়ে লাগলো না, যেন অলৌক কোন শক্তি তাদের রক্ষা করে চলেছে।

তবু এক সময় শত্রুর সংখ্যার কাছে হার মানতে হলো রাজকীয় সৈনিকদের। এরই মধ্যে বেশ কিছু সৈন্য মারা পড়েছে। শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে করতে পিছু হটতে লাগলো তারা। পিছাতে পিছাতে প্রথমে সেখেত মন্দিরের দেয়ালের কাছে, এবং তারপর মন্দিরের প্রাঙ্গণে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। তখন মার্মিসের নেতৃত্বে মাত্র জনা পঞ্চাশেক টিকে আছে। প্রাণপণ লড়াইয়ে ফটক রক্ষার চেষ্টা করছে তারা। তবে পেরে উঠছে না। বর্শা-বৃষ্টিতে একে একে লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে।

মন্দির প্রাঙ্গণে রথ থেকে নেমে ধনুকে ভর দিয়ে দাঁড়ালো তুয়া। তার তূণের সব তীর শেষ। আসতি পাশে। দুজনেরই চোখ ফটকের দিকে। রাজ-রক্ষীরা আর পেরে উঠছে না। তখন মাত্র দশ-বারোজন টিকে আছে। তারা পিছিয়ে এসে রানীকে ঘিরে দাঁড়ালো। তীব্র এক চিৎকার করে আবির সৈন্যরা ফটক পেরিয়ে ঢুকে পড়লো প্রাঙ্গণে। তুয়া ও তার সঙ্গীদেরকে তাড়া করে নিয়ে গেল প্রথমে মন্দিরের ভেতরে, তারপর যে মিনারে তুয়ার থাকার ঘর সেই মিনারে।

সেখানে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে শেষ প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করলো তুয়া। ধাপের পর ধাপ সিঁড়ি আগলানোর চেষ্টা করে গেল ওরা। কিন্তু

আবির সৈন্যরা ওদের ঠেলে নিয়ে গেল ওপরের দিকে। শেষে তুয়া, আসতি আর মার্মিস কেবল বেঁচে রইলেন। সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন মার্মিসের। রক্ত পড়ছে দর দর করে। রানীর কামরা আর আসতির ঘরের মাঝখানের অপ্রশস্ত জায়গায় ওঁরা এখন। মাত্র তিনজন টিকে আছে দেখে হামলাকারীরা থামল এক মুহূর্ত। মনোবেদনা আর ক্ষতের যন্ত্রণায় অস্থির মার্মিস ঘুরে স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে চুমু খেলেন। রানীর সামনে এসে কুর্ণিশ করে বললেন, 'একা একজন মানুষ আর কী করতে পারে? মহামান্য রানীকে রক্ষা করার জন্য যতটুকু সাধ্য আমি করেছি। এখন চললাম ফারাওয়ের কাছে জবাব দেয়ার জন্য, রানীকে রেখে যাচ্ছি আমেনের হেফাজতে, আর আমার ছেলে রামেসের দায়িত্বে। আমেনের কন্যা, বিদায়! বিদায়, প্রিয়তমা স্ত্রী!'

পূর্বপুরুষের রণহুঙ্কার ছেড়ে মার্মিস তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুর ওপর, এবং দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত শত্রুনিধন করে গেলেন। শেষে তাঁর প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল সিঁড়ির ধাপে। অস্ফুট আর্তনাদ করে দুহাতে মুখ ঢাকলেন আসতি।

'রাজকীয় বীরের স্ত্রী, এসো আমার সাথে,' আসতিকে বললো তুয়া।

'স্ত্রী বোলো না, রানী, বলো বিধবা। দেখনি তাঁর আত্মা দেহ ছেড়ে গেছে?'

আরও কয়েক প্রস্থ সিঁড়ি ভেঙে আসতিকে নিয়ে মিনারের চূড়ায় পৌঁছুলো তুয়া। আসতি মুখ ঢেকে বসে পড়লেন মেঝেতে। তুয়া চূড়ার একবারে প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল জীবনের শেষ মুহূর্তের অপেক্ষায়। তখন ভোর হচ্ছে। পুব আকাশে মরুভূমির ওপর সূর্যের লাল আভা ফুটে উঠতে শুরু করেছে। মিনার চূড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা তুয়ার ধাতব বর্ম ও মাথায় মুকুট চেহারার শিরোস্ত্রাণের ওপর সেই আভা পড়ে অপূর্ব এক মহিমা ছড়িয়ে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে অন্ধকারের রাজ্যের ওপর মাথা তুলেছে এক অগ্নিমূর্তি। নগরীর রাস্তা এবং নীলের বুকে নৌকা থেকে অনেকেই দেখতে পেলো সেই দৃশ্য।

'আমেন রা-য়ের কন্যা!' চিৎকার করে উঠলো তারা। 'দেখ দেখ, দেবতার মহিমা কেমন ঘিরে রেখেছে ওঁকে!'

সৈন্যরা হৈ হৈ করতে করতে উঠে এলো মিনার চূড়ায়। তাদের পেছন থেকে ঠেলেঠুলে এলো আবি।

'ধরো ওকে!' হাঁপাতে হাঁপাতে নির্দেশ দিলো সে।

কিন্তু সৈন্যরা রানীর জ্যোতির্ময় রূপ দেখে এগোনোর সাহস পেলো

না।

'আমাদের ভয় করছে,' বললো তারা। 'ফারাওয়ের আত্মা দাঁড়িয়ে আছে রানীর সামনে!'

এবার কথা বললো নেতের-তুয়া। 'আবি, এক সময় তুমি মিশরের রাজপুত্র এবং মেম্ফিসের বংশানুক্রমিক অধিপতি ছিলে, কিন্তু এখন তোমার হাত তোমার রাজার এবং রাজানুগত আরও অনেকের রক্তে রঞ্জিত। আমি মিশরের বৈধভাবে অভিষিক্ত রানী বলছি। শোন দুর্বৃত্ত, আমি তোমাকে প্রথম ও দ্বিতীয় মৃত্যুর দণ্ডে দণ্ডিত করছি। আমার দিকে আর এক পা-ও এগিয়েছ কি আমি নিচে ঐ যে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছে শত শত মানুষ, তাদের সামনে এই ভয়ানক জায়গা থেকে নীলের জলে ঝাঁপিয়ে পড়বো। মৃত ফারাওয়ের সঙ্গে যোগ দিয়ে অবিনশ্বর দেবতাদের কাছে তোমার দুষ্কর্মের কথা বলবো। আমার অভিশাপ শোন, আজ থেকে এক সাপ তোমার জীবনীশক্তি কুরে কুরে খাবে, তোমার হৃদয়ে কামড় বসাবে দাঁত বের করে। ফারাও এবং তাঁর যে সেবকদের তুমি হত্যা করেছ তাদের আত্মা ঘুমের ভেতর তোমাকে তাড়া করে ফিরবে। শান্তির ঘুম তোমার জীবন থেকে হারিয়ে যাবে। সিংহাসনে বসেও তুমি রেহাই পাবে না। আমার আত্মা সেই সিংহাসন ঘিরে ভয়ঙ্কর এক অন্ধকার তৈরি করে রাখবে। তারপর ভয়ঙ্কর লজ্জাজনক মৃত্যু নেমে আসবে তোমার ওপর। অপদেবতার খোরাক হবে তোমার আত্মা। তোমার মত একই পরিণতি হবে তোমার পরিবার এবং তোমার সঙ্গে যারা সহযোগিতা করছে সবার। আমি নেতের-তুয়া, দেবতাদের দেবতা আমেনের কন্যা, আমেনের কণ্ঠস্বরে বললাম একথা।'

সৈন্যরা নিঃশব্দে একে একে নেমে যেতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। শেষ পর্যন্ত মিনার চূড়ায় তুয়া, আসতি আর আবি ছাড়া কেউ রইল না। আবি তাকিয়ে আছে তুয়ার দিকে। কথা বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। গলার কাছে আটকে যাচ্ছে কথা। তিন তিনবার চেষ্টার পর গলা দিয়ে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরোলো আবির, 'ও মহামহিম রানী, অভিশাপ ফিরিয়ে নিন, আমি আপনাকে ছেড়ে দেব। আমি বুড়ো হয়েছি। গত রাতে আমার সব বৈধ ছেলে মারা গেছে। অভিশাপ ফিরিয়ে নিয়ে আমাকে আমার জায়গায় থাকতে দিন, আমি আপনাকে ছেড়ে দেব।'

'না,' জবাব দিলো রানী, 'তা আর সম্ভব নয়, আমি চাইলেও না। এই অভিশাপ আমি উচ্চারণ করিনি, অন্য এক শক্তি আমার মুখ দিয়ে

কথা বলেছে। সেৎ-এর পুত্র, যত অপকর্ম তোমার পক্ষে সম্ভব করে যাও। অভিশাপ থাকবে তোমার ওপর।'

ভয় আর ক্রোধে কেঁপে উঠলো আবির শরীর। 'তাই হোক তাহলে, আমেনের তারা, আর কোন ভয় নেই, আমার সাধ্যমত খারাপের চেষ্টা আমি করে যাব। আমার প্রধান শত্রু ফারাও মরেছে, এবং তুমি তার মেয়ে, তোমার নিজের ইচ্ছায় আমার স্ত্রী হবে, নইলে এই মিনারেই তুমি না খেয়ে মরবে। আমি এখনই মরব না–সে-রকমই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে আমাকে। এই সময়ে ইচ্ছে হলে আমাকে সাথে নিয়ে তুমি শাসন করতে পার, অথবা আমাকে ছাড়া না খেয়ে শুকিয়ে মরতে পার। আমেনের কন্যা, শুনে রাখো, এখনও আমার দিন আছে।'

'আর তুমি শুনে রাখো, সেৎ-এর পুত্র, দিনের পরে আসবে দীর্ঘ সেই আতঙ্ককর রাত, যার কোন শেষ নেই।'

একথার কোন জবাব খুঁজে পেলো না আবি। শুকনো মুখে নেমে গেল মিনার থেকে।

আবি চলে যাওয়ার পর নিচে তাকালো তুয়া। মন্দিরের সামনে বিশাল চত্বরটায় হাজার হাজার মানুষ জড় হয়েছে। সবাই নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ও-ও কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো নীরবে। তারপর আসতিকে তুলে তাঁর হাত ধরে নেমে এলো নিচের ছোট্ট ঘরে, যেখানে সে ঘুমায়।

ছ'দিন চলে গেছে। সেই ঘরেই আছে রানী নেতের-তুয়া। এর মধ্যে এক বেলাও খাবার জোটেনি। ঘরে পানি যা ছিল তা দিয়ে এই ক'দিন চলেছে। এখন আর এক ফোঁটাও নেই। পানি ছাড়া এই ক'দিনে ওরা খেয়েছে মধু। সেই ভয়ঙ্কর সকালে মিনার চূড়া থেকে নেমে আসার সময় সেখানকার ছাদের নিচে একটা মৌচাক দেখতে পেয়েছিলেন আসতি। পরে তা ভেঙে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। পানির সঙ্গে সঙ্গে সেই মধুও শেষ। মধু খেয়ে বেঁচে থাকার কথা স্মরণ করে পরবর্তী জীবনে রানী নেতের-তুয়া মৌমাছিকে তার রাজকীয় প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এবং জীবনে আর কখনও সে এই পতঙ্গের পরিশ্রমের ফসল মুখে তোলেনি।

'চল, দাইমা, ছাদে যাই,' বললো তুয়া, 'রা-য়ের অস্ত যাওয়া দেখি গিয়ে। হয়তো এ-ই হবে শেষ দেখা। আমার মনে হচ্ছে রা-য়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও চলে যাব পশ্চিম সিংহদ্বার দিয়ে।'

তুয়া আসতি দুজনই ক্ষুধা তৃষ্ণায় ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়েছেন।

দুজন একে অপরকে ধরে উঠে এলেন ছাদে। ঐ উঁচু থেকে ওঁরা দেখলেন আবির সৈন্যরা দুটো চক্র তৈরি করে ঘিরে রেখেছে মন্দিরটা। মন্দিরের যে পাশ নীলনদের গা-ঘেঁষা সেই দিকটার পাহারায় রয়েছে বেশ কয়েকটা যুদ্ধজাহাজ। সৈন্যদের চক্রের ওপাশে সেই চত্বরটায় এখনও সেদিনের মতই হাজার হাজার লোকের সমাগম। তারা জানে অভুক্ত রানী প্রথা অনুযায়ী সূর্যাস্তের সময় মিনার চূড়ায় উঠে আসবেন। এখনও তুয়ার গায়ে সেই চকচকে বর্ম। সূর্যাস্তের সময়কার আলো পড়ে সেদিন ভোরের মত এখনও অদ্ভুত এক আভাময় রূপ নিয়ে জনতার চোখে ধরা পড়লো তুয়া। সাগরের গুঞ্জনের মত একটা গুঞ্জন উঠলো তাদের ভেতর। তারপরই সব চুপ। রানীর জন্যে অপার সহানুভূতি সত্ত্বেও আবির ভয়ে কেউ কিছু বলতে পারছে না। এই নীরবতার মধ্যেই প্রাচীন রাজাদের পিরামিডের পেছনে ডুবে গেল সূর্য। নেতের তুয়া তার অসাধারণ মাধুর্যময় কণ্ঠে গান ধরলো–আমেন-রা-য়ের সান্ধ্য স্তুতি-সঙ্গীত। নীরবে শুনতে লাগলো জনতা।

গানের শেষ রেশ মিলিয়ে যেতে আবারও গুঞ্জন উঠলো তাদের ভেতর। ততক্ষণে সন্ধ্যার আঁধার নেমে এসেছে। দুই নারী হাত ধরাধরি করে নেমে এলো তাদের শোয়ার ঘরে।

'আমাদের সাহায্য করার সাহস নেই ওদের,' বললো তুয়া। 'চল, দাইমা, আমরা ঘুমিয়ে যাই, ঘুমের মধ্যেই মরে যাব।'

'না, রানী,' আসতি বললেন, 'যিনি অসহায়কে সাহায্য করেন আমরা তাঁর দিকে তাকাবো। মনে নেই, স্বর্গীয় রানী আহুরা কী বলেছিলেন?'

'মনে আছে, দাইমা।'

'যথেষ্ট অপেক্ষা করা হয়েছে, রানী। আমার কানে কানে যে মন্ত্র তিনি দিয়েছিলেন তা একবারই মাত্র ব্যবহার করা যাবে। সেজন্যেই অপেক্ষা করেছি। এখন আমি নিশ্চিত, তোমাকে রক্ষা করার জন্য তোমার ভেতরে যাকে দিয়ে দেয়া হয়েছে সময় হয়েছে তাকে ডাকবার।'

'তাহলে ডাকো, দাইমা, যদি তোমার ক্ষমতা থাকে,' ক্লান্ত ভঙ্গিতে বললো তুয়া। 'আর নয়তো মরতে দাও। কিন্তু, বলো তো, কাকে ডাকবে তুমি? আমেনকে? ফারাওয়ের আত্মাকে, না আমার মা আহুরার আত্মাকে? নাকি কোন অভিভাবক দেবতাকে?'

'এদের কাউকে না। কাকে ডাকতে হবে তা আমাকে বলে দেয়া হয়েছে। তুমি ঘুমিয়ে যাও, মা। অন্ধকারে অনেক কাজ করতে হবে

আমাকে। ঘুম থেকে জেগে সব তুমি জানতে পারবে।'

'হ্যাঁ,' বললো তুয়া, 'ঘুম থেকে জেগে–যদি কখনও জাগি। কে জানে ঘুমের ভেতরেই তুমি আমাকে খুন করবে কিনা? যদি করোও ক্ষতি নেই। অনশনের এই যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে আমার স্বর্গীয় বাবা-মায়ের সাথে যোগ দিতে পারব, অপেক্ষা করব প্রিয়তম রামেসের জন্যে। ছোটবেলায় যেমন গান গেয়ে আমাকে ঘুম পাড়াতে এখন আবার তেমন করো না, দাইমা।'

শুয়ে পড়লো তুয়া। সত্যি সত্যিই আসতি তার পাশে বসে তার হাত ধরে গান শুরু করলেন মৃদু সুরেলা কণ্ঠে। অল্পক্ষণেই চোখ বুজে এলো তুয়ার। নিশ্বাস-প্রশ্বাস ভারি হয়ে উঠলো। আস্তে আস্তে গান শেষ করলেন আসতি। তারপর উঠে প্রার্থনায় বসলেন। একের পর এক প্রার্থনা করে চললেন তিনি, যতক্ষণ না তাঁর অন্তর পবিত্র হয়ে উঠলো, এবং তিনি মনে করলেন এবার উচ্চারণ করা যায় সেই ভয়ানক মন্ত্র, আহুরা যা তাঁর কানে কানে বলে গিয়েছিলেন।

আসতি মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করতেই রাতের নৈঃশব্দ্য খান খান করে চারদিক থেকে ভেসে আসতে লাগলো বিভিন্ন কণ্ঠস্বর। মিনারের পাথরে পাথরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো তা। কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো মিনার। নগরীরর সব উঁচু দালানই কাঁপছে থর থর করে। ঠিক ঐ সময় জ্যোতিষী কাকুর ঘরে কাকু আর মেরিত্রা তাকিয়ে ছিল ছাদে ঝোলানো স্ফটিক গোলকের দিকে। হঠাৎ করেই ওটা ভেঙে খান খান হয়ে ছড়িয়ে পড়লো মেঝেতে। কুমার আবি নিজের ঘরে শুয়ে ছিল বিছানায়। আতঙ্কে ধড়মড় করে উঠে বসলো সে। আর সেখেত মন্দিরের মিনারে আসতি লুটিয়ে পড়লেন তার আসনে। জ্ঞান হারিয়েছেন না ঘুমিয়ে পড়েছেন বোঝার উপায় নেই। তারপর সব আবার সুনসান।

জেগে উঠলো নেতের-তুয়া। মিনারের জানালা দিয়ে তখন ভোরের প্রথম আলো প্রবেশ করছে ঘরে। প্রথমেই তুয়ার চোখ গেল আসতির দিকে। হাতের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছেন তিনি। তারপরই তুয়া খেয়াল করলো, তার বিছানার পায়ের কাছে আভাময় এক অবয়ব। আকাশের তারা এবং চাঁদের কাছ থেকে টেনে আনা অস্পষ্ট শাদা আলোর মত সেই আভা। তুয়া দেখলো, মিশরের রাজকীয় পোশাক পরা, জোড়-মুকুট মাথায় তারই প্রতিরূপ।

স্বপ্ন দেখছে মনে করে অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইল তুয়া। শত্রুর হাতে বন্দী অবস্থায় প্রায় সাতদিন অভুক্ত সে, তবু ভালই

লাগছে। মেরিত্রা আর কাকুর ষড়যন্ত্রে আজকের এই অবস্থা না হলে স্বপ্নের ঐ অবয়বের মতই থাকতো ও। নিয়তির লিখনে সব বদলে গেছে। তবে এই শোচনীয় দশা–ক্ষুধা, বন্দিত্ব সব সত্ত্বেও অহঙ্কার আর আত্মমর্যাদাবোধ ওকে ছেড়ে যায়নি। পাশাপাশি এটাও বুঝতে পারছে, তার শেষ কাছিয়ে আসছে। শুয়ে আছে ছায়ার মত। সামনে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মৃত্যু অথবা ঘৃণ্য এক বিয়ে মেনে নেয়া। সে ফারাওয়ের কন্যা। মারা গেলে তাকে হয়তো রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হবে। রাজাদের নামের তালিকায় ওর নামটাও হয়তো অন্তর্ভুক্ত হবে। আর রাজদ্রোহী নষ্ট স্বভাবের আবি চড়ে বসবে সিংহাসনে। দেবতারা তাকে যদি ছেড়ে না যেতেন তাহলে হয়তো পায়ের কাছের ঐ আলোকময় অবয়বটার মতই থাকতো ওর অবস্থা।

ভাবনার এ-পর্যায়ে অন্তরটা তেতো হয়ে উঠলো তুয়ার। তাকে দেবতার কন্যা বলা হয়, অথচ এমন একটা মৃত্যু তাকে বরণ করতে হচ্ছে যা অতি সাধারণ মানুষেরও কাম্য নয়। তার মুকুট, সিংহাসন, প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা–সবই কেড়ে নেয়া হয়েছে। তার ভলবাসা নিষ্ফল হতে চলেছে। মৃত্যুর ওপারে কি রামেসের সঙ্গে দেখা হবে? সেখনে কি তাদের বিয়ে হবে, পাবে সন্তান? পাতালপুরীর ফারাও কে?

ওহ! এক ঘণ্টা–মাত্র এক ঘণ্টার জন্য যদি ও মুক্তি পেতো! ঐ সময়ের মধ্যেই সেনাবাহিনী নিয়ে এসে বিদ্রোহী মেম্ফিস গুঁড়িয়ে দিতো। নগরীর প্রাসাদগুলোয় আগুন জ্বালিয়ে দিত। অভিশপ্ত আবিকে নিক্ষেপ করতো কুমিরের মুখে। ভাবতে ভাবতে বুকের ভেতরটা ওর উত্তাল হয়ে উঠলো।

তাপর ঘটলো সেই অলৌকিক ঘটনা। পায়ের কাছের সেই আভাময় অপরূপা অবয়ব–ওর নিজের অবয়ব এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়লো ওর ওপর। তার সুন্দর লাল ঠোঁট দুটো নড়ে উঠলো। তুয়ার কানে ভেসে এলো ওরই অপূর্ব কণ্ঠস্বর

'কী চাও তুমি, বলো, রানী? যা চাইবে তা-ই হবে। ও ভোরের তারা, আমেনের রাজকীয় কন্যা, আমি এই যে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, আমি তোমার হুকুমের দাসী।'

বিছানায় উঠে বসে হেসে উঠলো তুয়া।

'আমি চাই?' বললো সে? 'ও স্বপ্ন, আমার সাথে কেন ঠাট্টা করছো? একটু ভাবতে দাও আমাকে। আমি কী চাই? ও স্বপ্ন, ভিক্ষুকের যা চাওয়া এখন আমারও চাওয়া তাই– একটু পানি আর এক টুকরো রুটি।'

'ওখানেই আছে,' হাতের স্ফটিক রাজদণ্ড দিয়ে বিছানার পাশে টেবিলের দিকে ইশারা করলো অবয়বটা।

বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে দুলতে তাকালো তুয়া। সত্যিই টেবিলের ওপর রয়েছে রুপোর পানপাত্রে পানি আর সোনার থালায় চমৎকার রুটি। এই স্বপ্ন ভালই লাগছে তুয়ার। হাত বাড়িয়ে ও তুলে নিলো অলৌকিক পানপাত্রটা। ঠোঁটে তুলে চুমুক দিলো। তারপর! সত্যিই ওর জিহ্বা স্পর্শ পেলো শীতল জলের। সবটুকু পানি খেয়ে নিলো ও। তৃষ্ণা আর নেই। হাত বাড়িয়ে রুটি তুলে নিলো এবার তুয়া। গোগ্রাসে শেষ করে ফেললো রুটির শেষ কণাটা পর্যন্ত। তারপরেই মনে পড়লো আসতির কথা।

'ওহ, কী স্বার্থপর আমি!' বলে উঠলো সে। 'সব খেয়ে ফেলেছি, আমার দাইমার জন্য একটুও রাখিনি!'

'ভয় নেই,' জবাব দিলো স্বপ্ন। 'দেখ দাইমার জন্যেও আছে।'

সত্যিই তাই, রুপোর পানপাত্র আর সোনার থালা আবার ভরে গেছে পানি আর রুটিতে। স্বপ্ন এবার বললো, 'নিশ্চয়ই তোমার আরও চাওয়া আছে, ও ভোরের তারা?'

'হ্যাঁ। আমি বিশ্বাসঘাতক আমার পিতার হত্যাকারী আবির ওপর প্রতিশোধ নিতে চাই। আবির ওপর এবং আবির সব সহযোগীর ওপর।'

কুর্ণিশ করলো আভাময় অবয়ব। অলঙ্কারে সাজানো হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'আমি তোমার হুকুমের দাসী। তোমার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবে না। এমন প্রতিশোধ নেয়া হবে যার কথা কেউ কোনদিন শোনেনি। বিষের মত ফোঁটায় ফোঁটায় প্রতিশোধ আবির শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়বে। প্রেমে ব্যর্থ হবার জ্বালা, সর্বক্ষণ ভয়ানক আতঙ্কে থাকার যন্ত্রণা, সিংহাসন পেয়েও হারানোর বেদনা ওকে কুরে কুরে খাবে। তারপর আবি এবং তার সব সহযোগীর জন্য থাকবে অশেষ যন্ত্রণাদায়ক অনন্ত নরকবাস। আরও একটা চাওয়া আছে না তোমার, ও ভোরের তারা?'

'হ্যাঁ। কিন্তু সেই চাওয়ার কথা আমি নিজেকে এমনকি ঘুমের মধ্যেও বলতে চাই না।'

'তোমার সেই চাওয়াও পূর্ণ হবে, ভোরের তারা। তোমার ভালবাসা তুমি খুঁজে পাবে। যদিও এখন বহু দূরে আছে, কিন্তু সে ফিরে আসবে তোমার কাছে। দুজনে তোমরা অপার সম্মান আর গৌরবের সঙ্গে শাসন করবে উত্তর ও দক্ষিণ ভূ-খণ্ড।'

এবার যেন সত্যিই জেগে উঠলো তুয়া। চোখ কচলে তাকালো এদিক ওদিক। আসতি ঘুমিয়ে আছেন এখনও। বিছানার পাশে টেবিলের ওপর সাজানো রয়েছে রুপোর পানপাত্রে পানি আর সোনার থালায় রুটি। আর বিছানার পায়ের কাছে সত্যিই দাঁড়িয়ে আছে ওর নিজের আলোময় অবয়ব, যার গায়ে রাজকীয় পোশাক, মাথায় জোড়-মুকুট।

'কে তুমি? কী তুমি?' চিৎকার করে উঠলো তুয়া। 'কোন দেবী না আত্মা? নাকি নিছকই ঠাট্টা– উন্মাদ মস্তিষ্কের কল্পনা?'

'কোনটাই না, ও ভোরের তারা! আমি তুমি–তোমার সত্তা, তোমার কা। তোমার পিতা আমেন তোমার জন্মের সময় আমাকে তোমার ভেতরে পঠিয়ে দেন। তোমার মনে নেই ছোটবেলায় আমরা একসাথে খেলা করতাম?'

'হ্যাঁ, মনে আছে,' বললো তুয়া। 'তুমি মন্দিরের পুকুরে কুমীর দেখতে যাওয়ার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছিলে। কিন্তু তারপর আর কখনও দেখিনি তোমাকে। সশরীরে আমার সামনে আসার ক্ষমতা তুমি কোথায় পেলে?'

'আসতির যাদু। তোমাকে রক্ষা করার জন্য উপর থেকে তাকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সেই ক্ষমতায় আমি ক্ষমতা পেয়েছি, নেতের-তুয়া। জেনে রাখ, তুমি সব সময় আমাকে দেখতে না পেলেও আমি তোমার চিরসাথী। জীবনে আমি তোমার সঙ্গী, মরণের পরেও থাকবো সঙ্গে–সমাধিগৃহে তোমাকে পাহারা দেব পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত। আমার আছে ক্ষমতা, গোপন জ্ঞান, যা তোমার ভেতরেই বাস করে, কিন্তু তুমি তা ধরতে পার না। আমি স্মরণ করতে পারি অতীত–অনন্ত অতীত, যা তুমি ভুলে গেছ। আমি দেখতে পাই ভবিষ্যৎ–অসীম ভবিষ্যৎ, যা তোমার অগোচরে রয়েছে। আমি দেবতাদের মুখের দিকে তাকাই, শুনতে পাই তাদের কণ্ঠস্বর। নিয়তি তার গ্রন্থ আমাকে পড়তে দেয়। আমি ঘুমিয়ে থাকি তাঁর সান্নিধ্যে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন এবং যাত্রা শেষে তোমাকে কোলে নিয়ে যাঁর কাছে আমি ফিরে যাব। ও ভোরের তারা, আসতির মন্ত্র আমাকে শরীর দিয়েছে, আমেনের শক্তি দিয়েছে পায়ের ওপর দাঁড়ানোর ক্ষমতা। আমি তোমার দাসী, হুকুম পালনের জন্য হাজির!'

বিস্মিত হতভম্ব তুয়া সন্ত্রস্ত কণ্ঠে ডেকে উঠলো, 'ওঠো, দাইমা, ওঠো, আমি পাগল হয়ে গেছি। আমার মনে হচ্ছে উপর থেকে আসা এক দূত আমারই রূপ ধরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার সাথে কথা

বলছে।'

আসতি চোখ মেলতেই দেখলেন আলোময় মূর্তিটা। তাড়াতাড়ি উঠে বসে তাকে অভিবাদন জানালেন তিনি, তবে কিছু বললেন না।

'বসো,' বললো তুয়ার কা, 'আমার কথা শোন, সময় খুব কম। মন্ত্রের প্রভাব যতক্ষণ থাকবে কেবল ততক্ষণই আমি থাকতে পারব। তুমিই বলো, আমি যার তার ইচ্ছা কী? আমি নিজের মত করে পূরণ করবো সেই ইচ্ছা। ঐ যে ওখানে খাবার আছে, পানি আছে–খেয়ে তারপর বলো।'

আসতি খেয়ে নিলেন। পরিতৃপ্তির সঙ্গেই খেলেন। তারপর, কী আশ্চর্য! অদৃশ্য হয়ে গেল সোনার থালা, রুপোর পানপাত্র।

'রাজকীয় নক্ষত্রের ছায়া, আমার উচ্চারণ করা মন্ত্র ধারণ করে তুমি দৃশ্যমান রূপ পেয়েছ। আমাদের সমস্যার কথা বলছি তোমাকে। এখানে আমরা বন্দী। আমাদের খাবার-পানীয় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আমাদের বেরোনোর সব পথ বন্ধ। এসব করছে আবি, যাকে রানী ঘৃণা করে। রানী বেঁচে থাকলে আবি তাকে বিয়ে করবে, আর মারা গেলে সে দখল করে নেবে সিংহাসন। এই অবস্থায় আমাদের বুদ্ধি আর কাজ করছে না। তুমি বলে দাও, এই নক্ষত্র তার নির্ধারিত সময়ের আগেই যেন ডুবে না যায় তার জন্য আমরা কী করবো।'

'এটুকুই তোমাদের চাওয়া?' জিজ্ঞেস করলো তুয়ার দ্বিতীয় সত্তা।

'না!' এবার কথা বলে উঠলো তুয়া। 'আমি একা জ্বল জ্বল করতে চাই না। আমার আকাশ ভাগ করে নেয়ার জন্য আরেকটি নক্ষত্র চাই আমি।'

'তোমার কি বিশ্বাস আছে? আর নির্দেশ পালনের ইচ্ছা? বিশ্বাস আর ইচ্ছা ছাড়া আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়।'

আসতি তুয়ার দিকে তাকালেন। সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো তুয়া।

'হ্যাঁ, আমাদের বিশ্বাস আছে, নির্দেশ পালনের ইচ্ছাও আছে,' বললেন আসতি।

'তাহলে তা-ই হোক,' বললো তুয়ার ছায়া। 'কিছুক্ষণের মধ্যেই আবি এসে জানতে চাইবে রানী তার স্ত্রী হতে রাজি নাকি মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এখানেই বন্দী থাকতে চায়। আমি রানীর রূপ ধরে আছি। আমিই তার স্ত্রী হয়ে যাব, এমন স্ত্রী যা কোন পুরুষ আগে কখনও পায়নি। আবি বুঝবে তাকে যে ঘৃণা করে তার আত্মার সঙ্গে বিয়ের ফল কেমন ভয়াবহ হতে পারে।'

তার কা-য়ের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে মুচকি হাসলো তুয়া। 'মানে তুমি আমার আসনে বসবে, আর তোমার স্বামী হয়ে আবি বসবে ফারাওয়ের সিংহাসনে, এবং হাড়ে হাড়ে টের পাবে বসার মজা। কিন্তু মিশর আর আমার জনগণের কী হবে?'

'মিশর আর তোমার প্রজাদের জন্য দুশ্চিন্তা কোরো না, ভোরের তারা। তুমি ফিরে এসে দাবি করা মাত্রই এসব তুমি ফিরে পাবে।'

'আমার এই দাই মা আর আমার কী হবে?' জিজ্ঞেস করলো তুয়া।

তুয়ার দ্বিতীয় সত্তা তার রাজদণ্ড তুলে জানালার দিকে ইঙ্গিত করলো। ওপাশে কয়েকশো হাত নিচে বয়ে চলেছে নীলের জল।

'আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঝাঁপ দাও। নীলনদ তোমাদের আশ্রয় দেবে।'

তুয়া আর আসতি একে অন্যের দিকে তাকালেন। 'তারমানে বিশ্বাস করে ওসিরিসের হাতে তুলে দিতে হবে নিজেদের,' বললো তুয়া। 'ওখান থেকে পড়ে বেঁচে থাকার আশা কেউ করতে পারে না।'

'তা-ই তোমার মনে হয়, ভোরের তারা? একটু আগে যে বিশ্বাসের প্রতিশ্রুতি দিলে কোথায় গেল তা? আর কিছু আমি বলতে পারব না। যা বললাম কর, নয়তো বিদায় দাও আমাকে। আবিকে কী বলবে তা ঠিক করে ফেল।' কা-য়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই নিচ থেকে ভেসে এলো মন্দিরের ভারি ব্রোঞ্জের ফটক খোলার আওয়াজ।

কেঁপে উঠলো তুয়ার বুকের ভেতরটা। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি কী করবো ঠিক করে ফেলেছি। ফারাওয়ের মেয়ে রানী নেতের-তুয়া ভীতু একথা কেউ কোনদিন বলতে পারবে না। আবির বাহুলগ্না হওয়া, বা কারাপ্রকোষ্ঠে তিলে তিলে মরার চেয়ে ওসিরিসের পদতলে ঠাঁই নেয়া অনেক সম্মানের। আমেনের ওপর এবং, আমার ছায়া, তোমার ওপর আস্থা স্থাপন করছি।'

আসতির দিকে তাকালো তুয়ার কা।

'আমার রানী যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব। সেটা যদি পরলোক হয় তাহলেও দুঃখ নেই, মার্মিস অপেক্ষা করছে সেখানে। কী আমাদের করতে হবে, বল!'

তুয়া আর আসতিকে সরু জানালাটার ওপর উঠে হাত ধরাধরি করে দাঁড়াতে বললো কা। তারপর রাজদণ্ড তুলে কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করলো। সঙ্গে সঙ্গে চোখে তীব্র আলোর ঝলকানি দেখলো তুয়া আর আসতি। কপালে লাগলো তীব্র বাতাসের ঝাপটা। আর কিছু মনে নেই তাদের।

১১
আবির স্বপ্নদর্শন

যে রাতে নেতের-তুয়ার কা-কে আবাহন করে আনা হলো সে-রাতেই জাদুকর কাকু আর ফারাওয়ের একান্ত পরিচারিকা মেরিত্রা কাকুর সেই মিনারের ওপরের ঘরে বসে আছে।

'তোমাকে এমন সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে কেন?' মেরিত্রাকে জিজ্ঞেস করলো কাকু। 'সব ভালয় ভালয় হয়ে গেছে। এখন আর চিন্তা কী? সেৎ নিজে যদি ঐ যাদুর মূর্তি তৈরি করতেন তাহলেও বোধহয় এত ভাল কাজ করতো না।'

'ভালই বটে!' ঝাঁঝিয়ে উঠলো মেরিত্রা। 'তুমি আমার সঙ্গে জঘন্য কৌশল করেছ, কাকু। কথা ছিল আমি ফারাওকে খোঁড়া করে দিতে সাহায্য করবো, তাকে হত্যা করতে নয়।'

'চুপ, চুপ! কী বলছো তুমি, প্রিয়তমা! হত্যা এক ভয়ঙ্কর শব্দ। আর যারা তা করে কখনও কখনও তাদের জীবনে নেমে আসে ভয়াবহ মৃত্যু। কোন নির্বোধ পুরোহিত যদি পুতুলটাকে পূজাবেদীর ওপর রেখে পুড়িয়ে দিয়ে থাকে, তাতে তোমার দোষ কোথায়?'

'দোষ আমার নয়, ঐ পুরোহিতেরও নয়; দোষ তোমার আর ঐ শুয়োর আবির আর তোমাদের দুজনের মালিক সেৎ-এর। কিন্তু দোষ পড়বে আমারই ঘাড়ে। রানী আর আসতি সত্য জানে, এবং আজ হোক কাল হোক তা প্রকাশ পাবে। তখন ডাইনী বলে আমাকে পুড়িয়ে মারা হবে। পাঠিয়ে দেয়া হবে পাতালপুরীতে, আর তখন আমার হাতে থাকবে ফারাওয়ের রক্ত, যিনি কখনও আমার ভাল ছাড়া মন্দ করেননি। তখন কী হবে আমার?'

মেরিত্রার এ-প্রশ্নের জবাব কাকুর জানা নেই। উঠে লম্বা গাল চুলকাতে চুলকাতে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। অশুভ এক হাসি জাদুকরের মুখে। দেখে গা জ্বলে গেল মেরিত্রার। 'জংলীর মত দাঁত বের করে হেসো না আর,' বললো সে। 'এই অশুভ খেলার শেষ কোথায় বলবে আমাকে?'

'শেষ নিয়ে ভেবে মাথা নষ্ট করার কোন দরকার আছে, সুন্দরী? শেষ কত দূরে কে বলতে পারে? বড় দার্শনিকেরা বলেন, এ-ধরনের ব্যাপার কখনও শেষ হয় না। সেই পবিত্র চিহ্ন দেখনি, একটা সাপ

পুরো পৃথিবীকে বেষ্টন করে নিজের লেজ নিজে কামড়ে ধরে আছে? এর অর্থ কী? যেখানে শুরু সেখানেই শেষ, বা যেখানে শেষ সেখানেই শুরু। যেকোন সমাধিগৃহে–'

'তোমার এই সাপ আর সমাধিগৃহের কথা বন্ধ করবে?' চিৎকার করে উঠলো মেরিত্রা। 'এই দুটোর কথা ভাবলেই গা শিউরে ওঠে আমার।'

'ঠিক বলেছ, প্রিয়তমা। আমাদের মিশরীয়দের এটা বড় দোষ– সমাধিগৃহ এবং তার ওপারে কী আছে এসব নিয়ে বেশি মাথা ঘামাই। ভাগ্য ভাল, ওপারে যা আছে বলে বলা হয় তা নিয়ে সন্দেহ আছে। সুতরাং সমাধিগৃহ আর মৃতদেহের কথা রেখে আমরা প্রাসাদ এবং জীবনের দিকে মুখ ফেরাই। যা বলছিলাম, দুর্ঘটনাক্রমে ফারাও এবং তার রক্ষীদল এবং আবির চার বৈধ পুত্র মারা যাওয়ায় আমরা ব্যথিত, মর্মাহত। তারপরেও এ-পর্যন্ত সব কিছু ভালভাবে এগিয়েছে। আজ আমি কুমারের কাছ থেকে প্রধানমন্ত্রী এবং রাজার প্রধান সহচর হিসেবে নিয়োগপত্র পেয়েছি। আজই নিয়ম মাফিক আনুষ্ঠানিকতায় তুমি আমার স্ত্রী হয়েছ। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমার নিয়োগ আবি সিংহাসনে বসার দিন থেকে কার্যকর হবে। একই দিন থেকে আমার সঙ্গে সঙ্গে তুমি হবে মিশরের দ্বিতীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি। এর আগে কী ছিলে? ফারাওয়ের পরিচারিকা বৈ তো নয়।'

'রক্ত মাখা রাষ্ট্রীয় আসনের চাইতে পরিচারিকার সাধারণ তেপায়াও বসার জন্য বেশি আরামের। শোন, কাকু, সত্যিই আমার ভয় করছে। তুমি দাবি কর, তুমি মহাজ্ঞানী, ভবিষ্যৎ পড়তে পার। আমি জানতে চাই ভবিষ্যৎ। তুমি যদি হাতুড়ে ধোঁকাবাজ না হও তো বলো, আমাদের সামনে কী আছে।'

'হাতুড়ে! ধোঁকাবাজ! ফারাওয়ের মূর্তি দিয়ে কী কাণ্ড-কারখানা করলাম তা দেখার পরও তুমি বলতে পারলে একথা?'

'এমনও তো হতে পারে ঘটনাচক্রে ওসব ঘটে গেছে। ফারাও বহু বছর ধরেই অসুস্থ। মাত্র ক'মাস আগে বড় এক আঘাত সামলে উঠেছেন। তুমি যদি ধোঁকাবাজ না হও তো ঐ জাদুর গোলকে দেখাও ভবিষ্যৎ। যত খারাপই হোক আমি দেখতে চাই, যাতে করে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে পারি।'

'ঠিক আছে, প্রিয়ত স্ত্রী, চেষ্টা করে দেখা যাক। কিন্তু, রাগ কোরো না, এসব দেখবার জন্য যে ধরনের শান্ত-সমাহিত মন লাগে, তোমার এ-মুহূর্তে তা নেই। তবু চেষ্টা করছি। এখানে বস। স্থির

দৃষ্টিতে তাকাও। আমি যখন মন্ত্র পড়ি, কোন কথা বোলো না।'

কাকু স্ফটিক গোলকটা নামিয়ে এনে টেবিলের ওপর স্থাপন করলো। দুজন ওটার দিকে তাকালো। কাকু বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়তে শুরু করলো। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও কিছু দেখতে পেলো না মেরিত্রা। তারপর হঠাৎ অস্পষ্ট একটা ছায়া ভেসে উঠলো গোলকের ভেতর। আস্তে আস্তে ছায়াটা স্পষ্ট হলো–মৃত ফারাওয়ের মমি করা দেহ। পর মুহূর্তে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো মেরিত্রা। ফারাওয়ের মমির একটা হাত কাপড়ের বাঁধন থেকে বেরিয়ে ঘুসি মারার ভঙ্গিতে ছুটে আসছে। সেই ঘুসির আঘাতেই যেন স্ফটিক গোলকটা টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়লো চারদিকে। একটা টুকরো সাঁ করে এসে লাগলো মেরিত্রার মুখে। চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে। ব্যথায় এবং ভয়ে চিৎকার করে চলেছে সমানে। কাচের আঘাতে তার সামনের দুটো দাঁত পড়ে গেছে। ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে দর দর করে। আর কাকু লাফ দিয়ে উঠে ছুটেছে পালানোর জন্য। তবে দরজার কাছে গিয়ে দ্বিতীয়বার ভেবে সে রয়ে গেল ঘরে। আতঙ্কে তার দেহ কাঁপছে থর থর করে।

অনেকক্ষণ পর চিৎকার থামিয়ে উঠে দাঁড়ালো মেরিত্রা। মুখ থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বললো, 'কী হলো এটা?'

'জানি না,' তোতলাতে তোতলাতে বললো কাকু। 'মনে হচ্ছে দেবতারা আমাদের ভবিষ্যৎ দেখতে দিতে চান না। বর্তমান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকো, মেরিত্রা।'

'বর্তমান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবো!' খেঁকিয়ে উঠলো মেরিত্রা। 'বর্তমান আমাকে কী দিয়েছে দেখেছ? মুখ ভর্তি রক্ত আর ওপড়ানো দাঁত! আমার সুন্দর মুখটা শেষ হয়ে গেল চিরদিনের জন্যে। এখন থেকে আমি বুড়ি হাবড়ি। ফারাও নিজের হাতে ঘুসি মেরে গোলকটা ভেঙে আমার মুখের দিকে কাচ ছুঁড়ে দিয়েছে, আমি দেখেছি। তুমিই তাকে ওখানে এনে বসিয়েছিলে। হতভাগা, বুড়ো, আমি এর শোধ নেব!'

লাফ দিয়ে গিয়ে জ্যোতিষীর টুপি আর তার নিচের পরচুলা খামচে খুলে নিয়ে মেরিত্রা তার টাক মাথায় সমানে চড় থাপ্পড় মেরে চললো। কাকু হাত-পা ছুঁড়েও যখন মাথা বাঁচাতে পরলো না তখন মাফ চাইতে লাগলো অনুনয় বিনয় করে।

ঠিক সেই সময় ঝট করে দরজা খুলে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকলো অর্ধনগ্ন এক লোক। মুখটা তার আতঙ্কে কাগজের মত শাদা হলেও কুমার আবিকে চিনতে অসুবিধা হলো না মেরিত্রা বা কাকুর।

'কী হচ্ছে এখানে?' হুঙ্কার ছাড়লো আবি। 'এই নাকি তোমার রাত জেগে গণাপড়া করা।'

'জি না, মহামান্য প্রভু,' মেরিত্রার দিক থেকে চোখ না সরিয়েই কুর্ণিশ করার চেষ্টা করলো কাকু। 'নিশ্চয়ই না, সম্মানিত কুমার। এই একটু দাম্পত্য কলহ আর কি। এই বুনো বিল্লির মত মহিলাকে আজ আমি বিয়ে করেছি। একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায় আমার ওপর মেজাজ দেখাচ্ছিল।'

'আবার বলো ঐ কথা, তোমাকে আমি ঐ জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেব। তখন যাদু খাটিয়ে দেখো নিচের শক্ত শান নরম হয় কিনা। দেখুন, মাননীয় কুমার, ওর অভিশপ্ত যাদু দিয়ে কী করেছে আমার!' ভাঙা দাঁতদুটো হাতে নিয়ে দেখালো মেরিত্রা। বলে চললো, 'ও ঐ স্ফটিক গোলকের ভেতর ফারাওয়ের আত্মা ডেকে এনে আমাকে মারতে চেয়েছিল। ভেতর থেকে ঘুসি মেরে ফারাও গোলকটা ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেললেন।'

'চুপ কর, মেয়েমানুষ!' চেঁচিয়ে উঠলো আবি, 'নইলে চাবকে তোর পিঠের ছাল ছাড়িয়ে নেব। কাকু, ফারাওয়ের আত্মা নিয়ে কী বলছে ও? ঐ আত্মা কি সব জায়গায় আছে? আমি তো ফারাওয়ের আত্মা নিয়েই কথা বলতে এসেছি।'

'উত্তর ভূ-খণ্ডের মাননীয় শাসক, রাজকীয় রক্তধারার মহান বাহক, শিগগিরই যিনি ফারাও হবেন–'

'চুপ, গর্দভ!' খেঁকিয়ে উঠলো আবি, 'বন্ধ করো তোমার গালভরা উপাধি আওড়ানো। আমি যা বলছি শোন, আমার পরামর্শ দরকার। তুমি যদি তা দিতে না পারো, অন্য কারো কাছে যেতে হবে আমাকে। একটু আগে আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলাম, ভয়ানক এক স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম আমি জেগে গেছি, এবং আমার পাশে কারো শুয়ে থাকার ওজন অনুভব করছি। তাকিয়ে দেখি ফারাও, আমার ভাই, মমির কাপড় জড়ানো অবস্থায় শুয়ে আছে আমার পাশে। আর–'

'আমিও তো গোলকের ভেতর তা-ই দেখেছি,' বাধা দিয়ে বললো মেরিত্রা। 'আপনাকেও কি ঘুসি মেরেছে, মাননীয় কুমার?'

'তার চেয়েও খারাপ। আমার সঙ্গে কথা বলেছে। বলেছে, "তুমি আমার ভাই, তোমার সব অপরাধ আমি ক্ষমা করেছিলাম, আর তুমি সাপের মত এক নারী, যাকে আমি বুকে করে রেখেছিলাম তাকে আর তোমার ভৃত্য কৃষ্ণ-হৃদয় জ্যোতিষীকে নিয়ে আমাকে হত্যা করেছ। শুধু তা-ই নয়, তুমি দুই ভূ-খণ্ডের রানী, আমেনের রাজকীয় কন্যার চাচা

হয়েও ওর রূপ আর আমার সিংহাসনের লোভে পাগল হয়ে ওকে আসতিসহ না খাইয়ে মারার ব্যবস্থা করেছ। তোমার জন্যে দেবতাদের পাঠানো এক বার্তা নিয়ে এসেছি আমি। শোন, দেবতারা তোমার এই পাপের কথা লিখে রেখেছেন। শেষ বিচারের দিন তোমার এইসব অপরাধের বিচার হবে। তখন তোমার ডানপাশে থাকবেন ত্রাণকর্তা ওসিরিস আর বামপাশে আত্মার খাদক।

' "আবি, তোমার জন্যে দেবতাদের বার্তা এই : সকালে সেখেত-এর মন্দিরে গিয়ে তোমার কামনার রাজকীয় সুন্দরীকে পাবে। তাকে তোমার বাসনা মত বিয়ে কোরো, ও আর আপত্তি করবে না। বিয়ে করবে ধূমধামের সাথে। তারপর রাজকীয় স্ত্রীর অধিকারে মিশর শাসন কোরো, যতদিন না দেখা হয় রামেস আর এক ভিক্ষুকের সাথে। রামেসকে চিনতে পারছ না? আমার মতই যাকে তুমি হত্যা করেছ সেই মার্মিসের পুত্র রামেস। আর ভিক্ষুক–বিশেষ এক বার্তা নিয়ে আসবে সে। ও আবি, আমার দেহটা থিবিতে নিয়ে গিয়ে আমার তৈরি করানো সমাধি-মন্দিরে সমাহিত কোরো। তারপর বোসো আমার সিংহাসনে। শাসন কোরো যাকে তুমি বিয়ে করবে সেই রাজকীয় রূপসীর নির্দেশ মত। জেনে রাখ, তার নির্দেশ তোমাকে পালন করতেই হবে। সবকিছু খুব তাড়াতাড়ি করবে। কারণ সময় খুব কম। আমার সমাধির পাশেই তোমার জন্যে একটা কবর খুঁড়ে রেখো। তুমি মারা যাওয়ার পর আমার এই কা তোমার সাথে দেখা করতে আসবে, যেমন এসেছে এই রাতে।"

'এর পরেই ফারাওয়ের কা–নাকি দেহ আমি জানি না, কথা বন্ধ করে হিম-শীতল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে শুয়ে রইলো আমার পাশে। একসময় আমার মৃত চার ছেলের আত্মারা এসে তাকে নিয়ে চলে গেল। এই সময় আমার ঘুম ভেঙে যায়। থর থর করে কাঁপছিলাম আমি তখন। এক মুহূর্ত দেরি না করে ছুটে এসেছি তোমার কাছে এই স্বপ্নের অর্থ জানার জন্য। আর এসে দেখি ফারাওয়ের ক্ষয়ে যাওয়া জুতো, যেটা আমি বহুদিন আগে পা থেকে খুলে ফেলে দিয়েছিলাম সেই ছোটজাত ছিনালটার সঙ্গে তুমি রঙ-তামাশা করছ।'

এসব কথা পছন্দ হওয়ার কথা নয় মেরিত্রার। সে কিছু একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু আবি আর কাকু এমন আগুন-ঝরা চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে, সে চুপ হয়ে গেল।

'এই স্বপ্নের অর্থ কী বলো, কাকু, মনটা আমি কিছুতেই স্থির করতে পারছি না,' বলে চললো আবি। ' যদি না বলতে পারো যে পদ

তোমাকে দিয়েছি তা কেড়ে নেব, আর যতক্ষণ না বলার মত বুদ্ধি ফিরে আসে ততক্ষণ তোমাকে চাবকানো হবে। তুমিই আমাকে এই পথে এনেছ, দেবতাদের কসম, তোমাকেই আমার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে হবে।'

বিপদ টের পেয়ে একেবারে শান্ত হয়ে গেল কাকু। বললো, 'এটা যেমন সত্য, আমিই আপনাকে এপথে–এই সুউচ্চ সোনালী পথে এনেছি তেমনি এটাও সত্য, শুরু থেকেই আমি আপনাকে নিরাপদ রেখেছি। আমার পরামর্শ না পেলে অনেক আগেই আপনি বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হয়ে মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে যেতেন। মনে পড়ে সেই রাতের কথা, যে রাতে আপনি ফারাওয়ের হৃদয়ে ছোবল বসানোর কথা ভেবেছিলেন?–আমিই সেদিন আপনাকে সুবুদ্ধি দিয়ে নিরস্ত রেখেছিলাম। এর পরেও কতবার আপনাকে সৎপরামর্শ দিয়েছি মনে করে দেখুন। ভবিষ্যতেও, কুমার, আমার সহায়তার ওপর নির্ভর করবে আপনি সোজা থাকবেন না পড়ে যাবেন। আপনার যদি অন্য রকম মনে হয় অন্য কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে নিয়োগ করুন উপদেষ্টা হিসেবে, আর আমাকে যত খুশি চাবকান। এখন বলুন, আমি পরামর্শ দেব, না আপনি অন্য উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন?'

'তুমিই দাও,' বিরস মুখে বললো আবি। 'আমরা একই জালের মাছ। ভাল হোক মন্দ হোক শেষ পর্যন্ত আমাদের একসাথেই চলতে হবে। চিন্তা কোরো না, ক্ষমতা আমার হাতে আসা মাত্রই প্রতিশ্রুত পদ তুমি পাবে।'

'এইমাত্র আপনি চাবুকেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,' পরচুলাটা মাথায় বসাতে বসাতে বললো কাকু। 'যাক সেটা। এখন আপনার স্বপ্নের কথায় আসি। আমার তো মনে হচ্ছে এর অর্থ ভাল। ফারাও কী রূপ ধরে আপনার কাছে এসেছে? জীবিত আত্মা হিসেবে নয়, বরং মৃত মানুষ হিসেবে। মরা মানুষের তোয়াক্কা করে কে?'

একটা গামলার পানিতে ঠোঁটের ক্ষতস্থান ধুচ্ছিল মেরিত্রা। সে বলে উঠলো, 'আমি করি, বিশেষ করে যখন তা ভাঙা কাচ দিয়ে আমার মুখ কেটে দেয়, দাঁত উপড়ে ফেলে।'

'ঠোঁটের বদলে তোর জিভ কেটে নিলে ভাল হত,' বললো আবি। 'কাকু, বলে যাও, ওর কথায় কান দিও না।'

'কী বললো ফারাওয়ের মৃতদেহ? আপনি মিশরের রানীকে বিয়ে করে তার অধিকারে দেশ শাসন করবেন, এবং রাজার আসনে বসবেন। আপনি কি তা-ই চাইছেন না? এই ইচ্ছা পূরণের জন্যেই কি

এত বছর ধরে চেষ্টা করছেন না?'

'সেটা ঠিক। কিন্তু, কাকু, তুমি জনৈক রামেস আর এক ভিখিরি আর আমার কবর খোঁড়ার কথা ভুলে গেছ।'

'রামেস? মেরিত্রা ওর ব্যাপারে আপনাকে ভাল বলতে পারবে, কুমার। ও এক উন্মাদ সেনা কর্মকর্তা, কেশ-এর যুবরাজকে হত্যা করেছে। কেলেঙ্কারি ছাড়াই যাতে ঘটনাটার শেষ হয় সে-জন্যে নেতের-তুয়া তাকে কেশ-এ পাঠিয়ে দেন। ওর সেখান থেকে বেঁচে ফিরে আসার সম্ভাবনা খুব কম। যদি কখনও আসেও কোন ভিক্ষুককে সঙ্গে নিয়ে, ওর পাওনা শাস্তি ওকে দিতে হবে।'

'কিন্তু, কাকু, ফিরে এলে রানী ওকে কী বলবে? নানা রকম কাহিনী শুনি–'

'সব মিথ্যে কথা, কুমার। আমাথেলকে খুন করার পরপরই রানী ওকে প্রাণদণ্ড দিতেন, তাঁর পালক মা আসতি আর তার স্বামী মার্মিস প্রভাবিত করায় পারেননি। এই রামেস হচ্ছে আগের ফারাও বংশের শেষ উত্তরাধিকারী। বুঝতে পারছেন, বিয়ের পর আমেনের তারা তাঁর আকাশে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রাখতে চাইবেন না। আর কোন ভিখিরি যদি কোন বার্তা নিয়ে আসে, তার মর্ম হবে: মিশরের সঙ্গে সঙ্গে কেশ রাজ্যেরও রাজা আপনি। বার্তা যদি অন্য কিছু হয় তাহলেও আপনি রামেসকে হত্যা করে আপনার ভবিষ্যৎ নিষ্কণ্টক করতে পারবেন।'

স্বস্তি ফিরে আসতে শুরু করেছে আবির মনে। 'হুঁ,' বললো সে, 'এটুকু ঝুঁকি আমি নিতে পারব। কিন্তু ফারাও যে সমাধিগৃহ আর কবর খোঁড়ার কথা বললো তার অর্থ কী?'

'যেহেতু তিনি মারা গেছেন, তাঁর কা একটা ভাল–তার নিজের তৈরি সমাধিগৃহ চাইবে, এটাই স্বাভাবিক। নীতিগতভাবে আমাদের তা দেয়া উচিৎ। এর বাইরে যা বলা হয়েছে তা-ও খুব স্বাভাবিক। আমরা যারা ষাট বা তার চেয়েও বেশিবার নীলের কূল প্লাবিত হতে দেখেছি তাদের তো সমাধিগৃহের কথা মাথায় রাখা দরকার। তবে যখন আমরা সমাধিগৃহে পৌঁছুবো এই ব্যাপারটা নিয়ে তখন মাথা ঘামালেও অসুবিধা নেই। তার আগ পর্যন্ত জীবন নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকা কর্তব্য, আর যতদূর সম্ভব জীবন উপভোগ করে নেয়া উচিৎ–যেমন: সিংহাসনে আরোহণ করা, বা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর ভালবাসা পাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনার ফসল পাকা মাত্রই কেটে ঘরে তুলুন, আগামী বছর ফসল হবে কিনা, বা, ফারাওয়ের কা সেই ফসলে তৈরি রুটি খেয়ে শেষ করবে কিনা তা নিয়ে এখন মাথা নষ্ট করা অর্থহীন। ফারাওয়ের–

বা আমেনের মেয়েই এখন আপনার বিবেচনার বিষয়, ফারাওয়ের প্রেতাত্মা নয়।'

'ঠিক বলেছ, ভবিষ্যদ্বক্তা, এই মেয়েটাই আমার বিবেচ্য বিষয়।'

'হ্যাঁ, কুমার, দুশ্চিন্তা দূর করুন। সামনে আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। যে সোনালী সড়ক আমি আপনার বিজয়ী পায়ের সামনে খুলে দিয়েছি তা আপনাকে নিয়ে যাবে সেই ভবিষ্যতের পানে। অথচ আপনি আমাকে চাবুক মারার ভয় দেখিয়েছেন। আমিই আপনাকে বুদ্ধি দিয়েছি, কীভাবে ফারাওকে মেম্ফিসে আটকানো যাবে। মোমের মূর্তির সহায়তায় ফারাওকে অসুস্থ করে ফেলা–সেটাও আমার কাজ। এই মেরিত্রা, যাকে একদিন আপনি বের করে দিয়েছিলেন, ও অবশ্য এসব ব্যাপারে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। মন থেকে সব সন্দেহ দূর করুন, কুমার। আপনি যে স্বপ্ন দেখেছেন তা সুস্বপ্ন, মোটেই দুঃস্বপ্ন নয়। আপনার চার ছেলের আত্মা যে দেখা দিয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে আপনার পরিবারের অগ্রযাত্রা অপ্রতিহত হবে।'

'যা-ই বলো, আমার চার ছেলে সেই অগ্রযাত্রা দেখতে পাবে না, কাকু, ওরা মৃত,' বিষণ্ন কণ্ঠে বললো আবি। ছেলেদের সে সত্যিই ভালবাসত।

'তাতে কী হয়েছে, কুমার? তারা সাহসের সঙ্গে লড়াই করে মারা গেছেন। আমরা তাদের মৃত্যুতে আন্তরিক শোক করেছি। সব চাইতে বড় কথা তাদের মৃত্যুতে আপনার উপকার ছাড়া অপকার হয়নি। চিন্তা করে দেখুন, রানীর গর্ভে আপনার যে সন্তান হবে তার বা তাদের সাথে আপনার এই ছেলেদের যে ঝুট-ঝামেলা হওয়ার আশঙ্কা ছিল তা চিরতরে দূর হয়ে গেছে।'

'হতে পারে, হতে পারে,' হাত নেড়ে বেদনাদায়ক প্রসঙ্গটা চাপা দিলো আবি। বলে চললো, 'কিন্তু এই রানী, এখনও তো আমার স্ত্রী হয়নি। ঐ মিনারে না খেয়ে আছে। এখন কী করণীয় আমার? আমি গিয়ে জোর করে ধরে আনার চেষ্টা করলে ও আত্মহত্যা করবে। আর আমি চুপ করে বসে থাকলে অল্প সময়েই না খেয়ে মারা যাবে। তার চাইতে বড় কথা, ওখানে যাওয়ার সাহস আমি পাচ্ছি না। মেম্ফিসের জনগণ আমাকে ভালবাসলেও এখন কানাঘুষা শুরু করেছে। ওরা বলছে, মিশরের রানীর অনাহারে মৃত্যু তারা মেনে নেবে না। মেয়েটা ভালই মন ভুলিয়েছে লোকগুলোর। একে অপূর্ব সুন্দরী, তার ওপর কাল সন্ধ্যায় রা-য়ের যে স্তুতিগান করেছে তাতে সবাই মুগ্ধ। ওর ঐ গানের পর রাতে আমার প্রাসাদের বাইরে ওদের চিৎকার শুনেছি। দল

বেঁধে ওরা বলছিল, "রানীকে খাবার দাও, মুক্তি দাও, নইলে আমরাই তাঁকে মুক্ত করবো।"

'আরও একটা কথা, ভবিষ্যদ্বক্তা, এতক্ষণে নিশ্চয়ই ফারাওয়ের মারা যাওয়া এবং অন্যান্য খবর থিবিতে পৌঁছে গেছে, এবং প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সেনাবাহিনী তৈরি হতে শুরু করেছে। এই অবস্থায় কী আমি করবো?'

'মৃত ফারাও স্বপ্নে আপনাকে যা করতে বলেছেন–ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেখেত মন্দিরে যাবেন। দেখবেন রানী আপনার কথামত কাজ করতে রাজি। আর কী চাই আপনার? সোজা তাঁকে প্রাসাদে নিয়ে আসবেন, এবং সবার সামনে বিয়ে করবেন, এবং তাঁর অধিকারে আর আপনার বাহুবলে মিশর শাসন করবেন।'

'সেটা চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে,' বললো আবি। 'তাতে অন্তত এটুকু বুঝতে পারবো, এই স্বপ্নের কতটুকু সত্যি। কিন্তু ওর সঙ্গী আসতির কী হবে?'

'এই আসতি সবসময় রানীকে কুপরামর্শ দেয়,' থুতনি চুলকাতে চুলকাতে বললো কাকু। মাথায় যখন দুর্বুদ্ধি খেলা করে তখন এমনি করে থুতনি চুলকায় সে। 'তাছাড়া ওর বয়স বেশি বলে ক্ষুধা আর শোকে বেশি ভেঙে পড়েছে নিশ্চয়ই। এখনও যদি বেঁচে থাকে মেরিত্রা ওর দায়িত্ব নেবে। তোমরা তো ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাই না, মেরিত্রা?'

'খুবই ঘনিষ্ঠ,' জবাব দিলো মেরিত্রা, 'একই মালিকের বিড়াল আর পাখির মত। ওর সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার। একটা ব্যাপারে সাবধান করে দেই, স্বামী, আসতি মোটেই দুর্বল মেয়েমানুষ নয়। তোমার যাদু শক্তিশালী, কিন্তু ওর যাদু আরও বেশি শক্তিশালী– ও আমেনের পূজারিণী, তার ওপর ওর যাদু-ক্ষমতার উৎস দেবতারা, অপদেবতারা নয়।'

ভোরের প্রথম আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আবি রাজসিক পোশাক পরে তার উপদেষ্টাদের নিয়ে হাজির হলো সেখেত মন্দিরে। উপদেষ্টাদের মধ্যে আছে কাকু ছাড়াও আবির কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্মকর্তা। আরও আছে ছোট এক রক্ষীদল। বিশালবপু আবির জন্য প্রাসাদ থেকে সেখেত মন্দির পর্যন্ত অতটা পথ হেঁটে যাওয়া কষ্টকর। তাই ও এসেছে পালকিতে করে। ফটকে পালকি থেকে নেমে হেঁটে সে মন্দিরের ভেতর ঢুকলো। হাঁটতে হাঁটতেই কাকুকে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় খুঁজবে রানীকে।

'একটাই মাত্র জায়গায়, মহামান্য কুমার,' বললো কাকু, 'নদীর দিকের মিনারে। ওখানেই উপোষ করছেন রানী আর আসতি।'

'ওহ ঐ উঁচু মিনারে,' বিরক্ত কণ্ঠে বললো আবি। 'সেদিন জান বেরিয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল অত উপরে উঠতে। ঠিক আছে চল।'

সরু সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে চললো ওরা। আর এক প্রস্থ সিঁড়ি টপকালেই পৌঁছে যাবে তুয়ার ঘর যেখানে সেই তলায়। সবাইকে থামার নির্দেশ দিলো আবি।

'তাড়াহুড়ার কিছু নেই,' বললো সে। 'এর ওপরের তলাতেই আছে রানী। তার সঙ্গে আছে আসতি। আমাদের ধুপধাপ পায়ের আওয়াজ শুনে কী পরামর্শ দেবে কে জানে। রানী গিয়ে মিনারের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে বসতে পারে। আমি একটু দম নিয়ে নেই তারপর এখান থেকেই ডাকবো।'

কিছুক্ষণ পর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হলে আবি বলতে শুরু করলো, 'ও রানী, তোমার এই শোচনীয় ঘরে আরও শোচনীয় উপবাস বন্ধ করো। আমরা তোমার বিশ্বস্ত প্রজা, তোমাকে তোমার যোগ্য জায়গায় নিয়ে যেতে এসেছি।'

একবার, দুবার, তিনবার একই কথা বললো আবি। কিন্তু কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো সে। বললো, 'নিশ্চয়ই মারা গেছে। ওহ! ওর মৃত্যুর জন্য মিশর এখন আমাকেই দায়ী করবে। কাকু, তুমি যাও, দেখে এসো কী হয়েছে। তুমি যাদুকর, তোমার তো ভয়ের কিছু নেই।'

কিন্তু জ্যোতিষী তখন অন্য রকম ভাবছে। ইতস্তত করতে লাগলো সে। শেষে আবি যখন তার সিডার কাঠের ছড়িটা তুললো মারার জন্যে তখন কাকু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করলো। একটা একটা করে সিঁড়ি টপকে গিয়ে দাঁড়ালো সে তুয়ার দরজার সামনে। হাঁটু গেড়ে বসে চাবির ছিদ্র দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলো শূন্য ঘরটা। হামাগুড়ি দিয়ে উল্টো দিকে আসতির ঘরের সামনে গেল। সেটাও খালি। ভয়ে সাহস বেড়ে গেল কাকুর। সিঁড়ি বেয়ে মিনারের ছাদে উঠে গেল সে। সেখানেও কেউ নেই। ফিরে এসে আবিকে জানালো, রানী কোথাও নেই।

'মেম্ফিসের অধিষ্ঠাতা দেবতা তাহ্-র কসম,' হতাশায় চিৎকার করে উঠলো আবি, 'এই রানী হয় পালিয়েছে নয়তো নীলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এখন পুরো মিশর লাগবে আমার পিছনে, নয়তো দেবতারা। প্রতারক, ভণ্ড, এই তোমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা!'

'নিশ্চিত না হয়ে এত কথা বলা ঠিক নয়, কুমার,' অবিচল ধৈর্যের

প্রতিমূর্তি হয়ে জবাব দিলো কাকু। 'মন্দিরের সব জায়গায় খুঁজে দেখতে হবে। ওঁরা অন্য কোথাও সরে গিয়ে থাকতে পারেন।'

খোঁজ শুরু হলো। কক্ষের পর কক্ষ পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত ওরা ভেতরের মিলনায়তনে এলো। ফারাও মেম্ফিসে আসার পর এখানেই তাঁর সিংহাসন আর দরবার স্থাপন করা হয়। মিলনায়তনটি এমনিতেই প্রায়ান্ধকার। ওপর দিকের কয়েকটা ঝাঁঝরি দিয়ে সামান্য আলো আসে। এখন সূর্যোদয়ের সময় রীতিমত রাতের মত অন্ধকার সেখানে। আবির সঙ্গী-সাথীরা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সেই অন্ধকারে। হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে চলেছে তারা। কিন্তু কিছুই হাতে বাধছে না। একটু পরেই পুব দিকের দেয়ালে ওসিরিসের চোখের মত দেখতে এক ফোকর দিয়ে উদীয়মান সূর্যের এক ঝলক আলো এসে পড়লো মিলনায়তনে। সেই আলোয় সবাই দেখলো দেবীর হাজার বছরের পুরোনো বেদীর ওপর স্থাপিত সিংহাসনে বসে আছে নেতের-তুয়া, মিশরের মহামহিম রানী।

সে কি তার রূপ আর মহিমা! যেন অন্ধকারের ভেতর এক ফালি অগ্নিশিখা। তার রাজকীয় পোশাক, দেহের অলঙ্কার, হাতের রাজদণ্ড আর মাথার জোড়-মুকুট সূর্যের আলোয় ঝিকিয়ে উঠছে। তবে এসবের চাইতেও বেশি ঝলক দিচ্ছে তার তীক্ষ্ণধার আয়ত চোখ দুটো। সেই চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু আছে, যারা তাকিয়ে ছিল সে-দিকে তাদের ভেতরটা কুঁকড়ে গেল ভয় আর শ্রদ্ধায়। কানাকানি করতে লাগলো, এ নারী নয় দেবী। পিছিয়ে এসে এক জায়গায় গা ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়ালো তারা।

অবশেষে সাহস সঞ্চয় করে কাকু বললো, 'ঐ যে আপনার বধূ, কুমার, এমন বধূ কোন মানুষ এর আগে দেখেনি। যান, ওঁকে গ্রহণ করুন।'

সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও বলে উঠলো, 'হ্যাঁ; কুমার, যান, ওঁকে গ্রহণ করুন।'

আবি অন্যদের চাইতে মোটেই কম ভয় পায়নি। কিন্তু সবার এই কথার পর আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। এগোতে শুরু করলো সে, যদিও বার বার পেছন ফিরে তাকাচ্ছে। সিংহাসনের সামনে পৌঁছে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ।

অনেকক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে রইলো আবি। কী বলবে কিছু বুঝতে পারছে না। বিরক্ত লাগছে ওর। তারপর হঠাৎ নূপুর-নিক্কণের মত পরিষ্কার একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো সে।

'মেম্ফিসের প্রশাসক, এখানে কেন তুমি? ফারাও তোমাকে বন্দী

করার পর যেখানে রেখেছিলেন সেখানে নয় কেন? ওহ-হো! মনে পড়েছে, ফারাওয়ের ব্যক্তিগত পরিচারিকা, তোমার বেতনভুক গুপ্তচর মেরিত্রা তোমাকে বের করে এনেছে। ও এখানে নেই কেন? যাদুকর কাকুকে দেখতে পাচ্ছি। যাদুর মূর্তি বানিয়ে যে ফারাওয়ের জন্য মৃত্যু ডেকে এনেছে সে আছে অথচ তার সাহায্যকারী নেই! কাল রাতে ওর যে ঠোঁট কেটেছে তার জন্য চিকিৎসকের কাছে গেছে বলেই কি সে আসতে পারেনি? তুমি যখন স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনবার জন্যে কাকুর কাছে গিয়েছিলে তার ঠিক আগেই তো ওর ঠোঁট কাটে তাই না?'

'এসব কথা তুমি জানলে কী করে, রানী? আমার প্রাসাদেও কি তোমার গুপ্তচর আছে?'

'হ্যাঁ, কুমার আবি, আমার কাকা, শুধু তোমার প্রাসাদে নয় সব জায়গায় আমার চর আছে। আমেন যা দেখতে পান তাঁর কন্যা তা জানতে পারে। তুমি তো তোমার স্ত্রী করার জন্য আমাকে নিতে এসেছ, তাই না? আমি প্রস্তুত। সাহস থাকলে তোমার ইচ্ছা পূরণ করো।'

'সাহস থাকলে! কেন আমি সাহস করবো না, রানী,' সন্দেহের সুর আবির গলায়।

'মেম্ফিসের কুমার, এ-প্রশ্নের জবাব তোমাকেই খুঁজে বের করতে হবে। আচ্ছা একটা কথা বলবে, কাল রাতে কাকুর ঘরে কোন কারণ ছাড়াই যাদুর স্ফটিক গোলকটা ভেঙে গেল কেন, আর তুমি কেন ধরে নিলে, যে কাকু চাবুক না খেয়ে কখনও সত্য বলে না সে তোমাকে তোমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা ঠিক ঠিক দিয়েছে?'

'আমি জানি না, রানী,' বললো আবি। আগুনঝরা চোখে জ্যোতিষীর দিকে তাকিয়ে যোগ করলো, 'কাকুর ব্যাপারটা নিয়ে আমি পরে কথা বলবো। দরকার হলে তুমি যেভাবে বলবে সেভাবেই ওর বিচার করবো।'

'না, কুমার আবি, তুমি যেমন জান না, তেমনি কাকুও কিছুই জানে না। জানি কেবল আমি। আমেন আমাকে ভবিষ্যৎ দেখার ক্ষমতা দিয়েছেন বলেই আমি জানি। এবং যা জানি তা গোপন রাখি। তা যদি না করতাম, আবি, তোমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এমন কথা আমি জানি যা শুনলে তোমার চুল শাদা হয়ে যাবে, আর তোমার উপদেষ্টা কাকু আর গুপ্তচর মেরিত্রাকে এমন পুরস্কার দেবে যে নির্যাতন-কক্ষও ওদের কাছে অনেক শান্তিময় মনে হবে। কিন্তু বলাটা আইনসম্মত নয়, আর এই বিয়ের আনন্দের সময় তা সুখকরও নয়।'

একটা থামের ছায়ার আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে কাকু ঠক ঠক করে কাঁপছে। পারলে ছুটে পালাতো। আর আবি ও তার পারিষদরা ভয়ানক এক অস্বস্তি নিয়ে তাকিয়ে আছে সিংহাসনে আসীন রানীমূর্তির দিকে। আবিরও মনে হচ্ছে চলে যায় রানীর সামনে থেকে। দু-দুবার সে দরজার দিকে তাকালো। কিন্তু কিসে যেন বেঁধে রাখলো তাকে।

'তোমার কথাগুলো, রানী, দু-ধার তলোয়ারের মত কাটছে, মনে হচ্ছে ক্ষতস্থানে বিষ পড়ছে। এখন বলো, যদি তুমি মানুষই হবে সাতদিনের অনাহারে তোমার সৌন্দর্য একটুও ম্লান হয়নি কেন? ঐ রাজকীয় পোশাক এই শূন্য মন্দিরে কে এনে দিলো তোমাকে? তোমার পালক মা আসতিই বা কোথায়?'

'দেবতারা আমাকে খাইয়েছেন। আমার এই পোশাকও তাঁরাই এনে দিয়েছেন। আর আসতিকে আমি সাইপ্রাসে পাঠিয়েছি বিশেষ এক সুগন্ধী আনার জন্যে– ঐ সুগন্ধী সাইপ্রাস ছাড়া আর কোথাও তৈরি হয় না। না, ভুল বললাম, কুমার, কাল তাকে সুগন্ধি আনতে পাঠিয়েছিলাম, সেই সুগন্ধী আমি মেখেছিও। আসতি এখন থিবিতে, আমার একটা কাজে আছে। গোপন কিছু নয়–ফারাওয়ের হত্যাকাণ্ড ও তাঁর সাথে কেমন করে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে তার ইতিহাস তাঁর সমাধিমন্দিরের প্রথম কামরায় লিখে রাখার জন্যে পাঠিয়েছি।'

এই অবিশ্বাস্য অশুভ কথা শুনে আবির সঙ্গীদের কলজে শরীর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল। পা পা করে তারা দরজার দিকে পিছাতে লাগলো। আবিও তাদের মধ্যে আছে।

'কী হলো? তোমরা আমাকে এখানে একা ফেলে রেখে যাবে নাকি?' দুঃখের সুরে বলে উঠলো রানী, যদিও সেই সুরে দুঃখের চাইতে বিদ্রূপই খুঁজে পাওয়া গেল বেশি। 'আমার ক্ষমতা আর জ্ঞান তোমাদের ভয় পাইয়ে দিয়েছে? কী করবো বলো? পানপাত্র উল্টে দিলে মদ ঢেলে পড়বেই। তবু এটা তো ঠিক, আমার উপস্থিতিতে রাজার প্রাসাদের শ্রীবৃদ্ধি হয়, হোক না তা তোমার মত রাজার প্রাসাদ। তোমাকে ওসিরিস পছন্দ করেন। দেখ, তোমার মন ভুলানোর জন্যে এখন আমি নাচ-গান করবো, যেমন গান করেছিলাম কেশ যুবরাজের সামনে।'

ধীরে, খুব ধীরে সিংহাসন থেকে উঠে এলো রানী। তারপর যেন বাতাসে ভেসে নাচের ভঙ্গিতে শরীর দোলাতে দোলাতে এসে দাঁড়ালো আবি ও তার সঙ্গীদের সামনে। হালকা চালে কয়েক মুহূর্ত নাচের পর গান শুরু করলো সে।

গানের কথাগুলো এর আগে কেউ কখনও শোনেনি। তবু

প্রত্যেকের মনে হলো তাদের হৃদয়ের এক গোপন দরজা যেন খুলে গেল। টেনে নিয়ে এলো তারুণ্যের স্মৃতি। প্রত্যেকের সামনে নাচতে লাগলো রানী নয়, যাকে সে সবচেয়ে বেশি ভালবাসত সেই নারী। দেহে হারানো সেই প্রেমাস্পদের স্পর্শ অনুভব করতে লাগলো তারা। কানে কানে শুনতে লাগলো তাদের হারিয়ে যাওয়ার হুতাশ্বাস। এমনকি বৃদ্ধ ধূর্ত আবিও এ থেকে বাদ রইলো না, যদিও তার মনের সচেতন অংশ দিয়ে সে বুঝতে পারছে এই গান তাকে এক সুউচ্চ গিরিখাতের কিনারে নিয়ে যাচ্ছে। গান যখন শেষ, তার মনে হলো সে সেই গিরিখাতের কিনার থেকে পড়ে শূন্যে ভাসছে।

নাচ শেষে গানের রেশ যখন মিলিয়ে গেল মৃদু হেসে রানী বললো, 'যাও এখন, কুমার, তোমরাও যাও। আমাকে রেখে যাও আমার নিঃসঙ্গ ঘরে। ফারাও যতদিন না পশ্চিমের ওপাশে তাঁর নতুন রাজ্য থেকে ডেকে পাঠান ততদিন আমি এখানেই থাকবো।'

কিন্তু ওরা গেল না—ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারতো না। অদৃশ্য কোন শক্তি তাদেরকে বেঁধে রেখেছে সেখানে। আবি চোখ সরাতে পারছে না রানীর ওপর থেকে। তার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে তড়বড় করে বলে যাচ্ছে নিজের আবেগ আর কামনার কথা। মুখে মৃদু হাসি নিয়ে শুনে গেল রানী। আবির কথা শেষ হলে বললো,

'মানে, তুমি আমাকে যতটা ভয় পাও তার চেয়ে বেশি ভালবাস? ভাল। তোমার নিয়তি এর চেয়ে সুখকর হলে ভাল হতো। ভবিষ্যৎ বলা বেআইনী, তাই তা বলবো না, নিজেই জানবে সময় হলে। এখন এটুকুই জান, মেফিসে মহাআড়ম্বরে এক বিয়ে হবে। এমন বিয়ের কথা উত্তর ও দক্ষিণ ভূ-খণ্ডের কেউ কোনদিন শোনেনি, দেখেনি। আর তুমি, আবি, মিশরের রানীর পাশে বসবে, তার আলোয় আলোকিত হবে। ফারাওকে পরাজিত করে সেই স্থান তুমি অর্জন করেছ। তোমার ঘুমের ভেতর ফারাও-ও তো সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাই না? এসো, নতুন দিনের সূর্য আলো ছড়াচ্ছে, ছায়াকে বিদায় জানিয়ে আমরা সেই আলোয় পা রাখি।'

১২
রাজকীয় পরিণয়

অদ্ভুত কিছু গুজব ভেসে বেড়াচ্ছে মেম্ফিস জুড়ে। শোনা যাচ্ছে রানী মেনে নিয়েছে কুমার আবির বিয়ের প্রস্তাব। এর মধ্যেই সে সেখেতের প্রাচীন মন্দির ছেড়ে বিশাল শ্বেত প্রাসাদে চলে এসেছে। এখন কেবল বিয়ের দিনের অপেক্ষা। কিন্তু জনসাধারণ একথা বিশ্বাস করতে পারছে না। তারা বলাবলি করছে, এটা সত্যি হতেই পারে না। প্রশ্ন করছে, এত ব্যক্তিত্বময়ী নারী, যে মিশরের রানী, সে তার বাবার হত্যাকারী এবং নিজের চাচাকে স্বামী হিশেবে গ্রহণ করবে? এর চেয়ে সেই মিনারের ওপর, যেখানে তাকে তারা রাতের পর রাত দাঁড়িয়ে গান করতে দেখেছে, সেখানে অনাহারে মৃত্যুকেই কি সে বেশি পছন্দের মনে করতো না? পুরুষরা হৃদয়ের অন্তস্তলে অনুভব করছে, এই বিয়ে হতে পারে না, হওয়া উচিৎ নয়। বরং পবিত্র এই নারী, যে আমেনের কন্যা হিসেবে পরিচিত, তার এই বিয়ে মেনে নেয়ার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। তাহলে মিশর তাকে চিরকাল স্মরণ করবে, তাকে নিয়ে গর্ব করবে।

তাদের স্ত্রী-কন্যারা অবশ্য এরকম মনে করছে না। তারা বলছে, রানী হোক আর যা-ই হোক সে তো নারীই। তার পক্ষে মিশরের রানীর আসন আর ক্ষমতার মায়া ত্যাগ করা সহজ নয়। তার চাইতে বড় কথা, আত্মহত্যা করে সাধারণ সমাধিগৃহে আশ্রয় পাবার ইচ্ছা তার কিছুতেই হতে পারে না। সুতরাং যা শোনা যাচ্ছে তা-ই ঠিক, রানী চলে আসবে দ্বিতীয় আসনে, আর আবি হবে তার প্রভু। না খেয়ে মরার কষ্ট স্বীকারের চাইতে আবির কাছে পোষ মেনে যাওয়াই তাঁর কাছে সুবিধাজনক মনে হয়েছে।

গুজবের অবসান হলো শিগগিরই। ঘোষকরা সারা নগরে ঘোষণা করে দিলো, বিয়ের অনুষ্ঠান হবে শ্বেত-প্রাসাদের বড় মিলনায়তনে সন্ধ্যার ঠিক আগে। শুনে মেয়েরা সব বিজয়ীর হাসি হাসলো, আর চুপ মেরে গেল পুরুষরা।

নির্ধারিত সময় এসে গেল। শ্বেত-প্রাসাদের বড় মিলনায়তন ভরে গেল আমন্ত্রিত অতিথিতে। প্রাসাদের বাইরের প্রাঙ্গণ এবং রাজপথ পূর্ণ হয়ে গেল কৌতূহলী মানুষে। কিছুই তারা দেখতে পাচ্ছে না, তবু

একটু পা রাখবার জায়গা পাবার জন্যে চলছে প্রাণান্তকর চেষ্টা। মিলনায়তনের এক প্রান্তে দুটি সিংহাসন পাতা হয়েছে। বড় এবং বেশি জাঁকজমকপূর্ণ যেটা সেটা কুমার আবির জন্য, আর ছোট এবং নিচুটা রানী নেতের-তুয়ার জন্য। ধূর্ত জ্যোতিষী কাকুর পরামর্শে এমন ব্যবস্থা। জনগণকে শুরুতেই বুঝিয়ে দেয়া যে, এখন থেকে শাসক আবিই, ফারাওয়ের মেয়ে নয়।

নির্দিষ্ট লগ্নে কোন এক সঙ্কেতমত নগরীর সব মন্দিরের ওপর থেকে বেজে উঠলো তূর্যনাদ। পর পর তিনবার সেই আওয়াজ শোনা গেল। উষ্ণ স্থির বাতাসে তার রেশ মিলিয়ে যাওয়ার পর সব নীরব। একটু পরেই সমবেত জনতার সামনে ঘোষণা করা হলো, দেবী হাথোরের মন্দিরে সকল দেবতার পুরোহিতগণের উপস্থিতিতে আবি এবং নেতের-তুয়া বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।

এর পরপরই আরও একটা গুজব ছড়িয়ে পড়লো: হাথোরের মন্দিরে বিয়ের সময় অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। প্রথা অনুযায়ী প্রধান পুরোহিত যখন কনের হাতে দেবীর ফুল পদ্ম-কলি ধরিয়ে দেন, তার হাতের স্পর্শে সেই না ফোটা কলি ফুটে ওঠে। আর পদ্মের ডাঁটা মুহূর্তে পরিণত হয় সোনার রাজদণ্ডে আর ফোটা ফুলটা হয়ে ওঠে নীলকান্ত মণি, মরুভূমির খনিতে যে নীলা পাওয়া যায় তার চাইতেও বিশুদ্ধ তা। এখানেই শেষ নয়, মানুষের মুখে মুখে যে কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে তাতে আরও বলা হয়েছে, বর আবি যখন রীতি অনুযায়ী হাথোরের বেদীতে শ্বেত কপোত অর্ঘ্য দিচ্ছিল সে-সময় একটা বাজপাখি দরজা দিয়ে উড়ে এসে ছোঁ মারে পাখিটিকে। সঙ্গে সঙ্গে রক্তাক্ত হয়ে মারা যায় পায়রাটি। আবির হাত থেকে তা ছিটকে গিয়ে পড়ে দেবীর কোলের ওপর। এর পরই অদৃশ্য হয়ে যায় বাজপাখি।

যারা এই গল্প শুনলো প্রত্যেকেই প্রশ্ন করতে লাগলো, কোন বাজপাখির এত বড় সাহস? আমেন-রা-এর পুত্র হোরাসের মুখ বাজপাখির মত। নিশ্চই তিনিই পাঠিয়েছিলেন ওটাকে।

শিগগিরই অবশ্য এই সব কানাকানি, আলোচনা থেমে গেল। নতুন গুঞ্জন উঠেছে জনতার ভেতর–শ্বেত-প্রাসাদে আসছেন রাজদম্পতি! সেখান থেকে তাঁরা জনতার সামনে দেখা দেবেন, শুভেচ্ছা এবং আনুগত্য গ্রহণ করবেন অভিজাত সম্প্রদায়, বিভিন্ন গোত্রপতি আর সেনাপতিদের।

হাথোরের মন্দির থেকে শ্বেত-প্রাসাদ পর্যন্ত ছাউনিওয়ালা পথ ধরে প্রথমে এলেন পুরোহিত-পূজারীগণ–কণ্ঠে তাদের স্তোত্র। তাঁদের

পেছনে পরিচারক এবং ঘোষকের দল। তারপর সেনাকর্মকর্তা ও রক্ষীদল পরিবেষ্টিত আবি। সঙ্গে তার প্রধান মন্ত্রী কাকু।

কিন্তু আবির পোশাকের চাকচিক্য বা জীবনে প্রথমবারের মত তার মাথায় শোভা পাওয়া রাজমুকুট–কোনটাই দর্শকদের নজর কাড়লো না, বরং সবাই যেটা খেয়াল করলো তা হলো, বর সর্বক্ষণ কেমন একটা অস্বস্তিতে ভুগছে। সমবেত প্রজাদের হর্ষধ্বনির জবাবে যখন সে রাজদণ্ড উঁচু করলো তখন মনে হলো তার হাত কাঁপছে। ঠোঁটদুটো শাদা হয়ে আছে। চেষ্টা করে একটু হাসলো আবি। অবশেষে থিতিয়ে এলো জনতার চিৎকার-কোলাহল।

আবির কথা এখন আর কেউ ভাবছে না। রানীর অপেক্ষা করছে তারা। ঘোষকরা কিছু ঘোষণা না করলেও সবাই অন্তর দিয়ে অনুভব করলো, সে আসছে। হ্যাঁ, ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে। সবাই তাকিয়ে ছিল, কিন্তু কেউ তাকে আসতে দেখেনি। কেউ কেউ ভাবলো, গাঢ় ছায়ার কারণে তার আগমন তাদের চোখে পড়েনি। মঞ্চের প্রান্তে দুই সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে, একা। কিন্তু যা তারা ভেবেছিল তার চাইতে সম্পূর্ণ অন্যরকম দেখাচ্ছে তাকে। জমকালো নয়, সাধারণ কাপড়ের শ্বেতশুভ্র এক পোশাক পরে আছে সে। পোশাকের গলা অনেকটা নামানো–প্রায় বুকের কাছ পর্যন্ত। সেখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে তার জন্ম-চিহ্ন, বুকের ওপর দিকের লাল রঙের জরুলটা, জীবনের প্রতীকের মত দেখতে, সন্ধ্যার সোনালী আলোয় জ্বল জ্বল করছে। এর চাইতেও বেশি যা সবার মনে দাগ কাটলো তা হচ্ছে তার মাথার জোড়মুকুটের সামনের দিকে বসানো রাজকীয় প্রতীক যুগলসর্পের টকটকে লাল চোখ আর হাতের পদ্মাকৃতির রাজদণ্ড– কিছুক্ষণ আগে লোকমুখে যেমন শোনা গেছে তেমনি সোনার ডাঁটার ওপর নীলকান্ত মণির পাপড়িদল।

হ্যাঁ, একেবারে অন্যরকম। তারা ভেবেছিল দুর্বল বিশুষ্ক মুখের এক নারীকে দেখবে, যার চেহারায় থাকবে দীর্ঘ অনাহার আর মৃত্যুভয়ের ছাপ আর চোখে পিতৃহন্তাকে বিয়ে করতে বাধ্য হবার বেদনা। কিন্তু সেসব কিছুই না, আমেনের তারা এখন যেরকম দীপ্তি ছড়াচ্ছে এমনটি আর কখনও ছড়ায়নি। গভীর নীল চোখ দুটোয় এমন তীক্ষ্ণ [illegible] সবার মনে হলো প্রত্যেকের বুকের গভীর পর্যন্ত যেন দেখে নিচ্ছে সেই চোখ। গালে সুস্বাস্থ্যের লালচে আভা, চেহারায় ক্ষমতা আর আত্মমর্যাদার গরিমা। ভয় যেন তার পদতলে লুটাচ্ছে।

কারো মুখে কথা নেই। নিষ্পলক তাকিয়ে আছে সবাই তার

দিকে। মৃদু হেসে সে তার শান্ত নীল চোখের দৃষ্টি দিয়ে তাদের বিস্ময়ের জবাব দিলো। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই প্রতিটা মাথা অবনত হলো তার সুগম্ভীর উদার মহিমার কাছে। মৃত্যুর মত নীরবতা চারপাশে। সিংহাসনের দিকে পা বাড়াতে তার রেশমি পোশাকে যে সামান্য খসখস শব্দ উঠলো তাতেই মনে হলো যেন খান খান হয়ে ভেঙে পড়লো নৈঃশব্দ্য। দুই পরিচারক সচেতন হয়ে তার সঙ্গে এগোলো তার আসন দেখিয়ে দেয়ার জন্যে। হাত নেড়ে তাদের সরে যাওয়ার ইশারা করে সে বললো:

'না, আমেনের কন্যা, মিশরের রানীকে পথ দেখানোর মত কেউ এখানে নেই। নিজের শক্তিতে সে নিজেই তার যোগ্য আসন খুঁজে নেবে।'

অখণ্ড নীরবতার মধ্যে খুব ধীরে সে বড় সিংহাসনটাতে গিয়ে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে আবির পারিষদদের মধ্যে গুঞ্জন উঠলো। কাকু তড়িঘড়ি মুখ বাড়িয়ে কিছু বললো আবির কানে কানে। আর জনতা দাঁড়িয়ে রইলো রুদ্ধশ্বাসে। আবি, অস্থিরভাবে মাটিতে পা ঠুকে এমন এক আদেশ দিলো যা তামিল করার সাহস পেলো না কোন রক্ষী। শেষে নিজেই সে এগিয়ে গেল রানীর সামনে।

'মহিয়সী নারী,' বললো আবি, 'তুমি নিশ্চয়ই জানো না, ঐ আসনটা স্বামীর। স্ত্রীর আসন এই বাঁয়েরটা। ওখানে বসো।'

'কেন, কুমার আবি?' শান্ত কণ্ঠে বললো রানী।

'কারণ স্বামীর স্থান স্ত্রীর উপরে, এবং,' বুনো এক উল্লাসে আবি যোগ করলো, 'পরাজিত থাকে বিজয়ীর নিচে।'

'পরাজিত! বিজয়ী!' ব্যঙ্গের সুরে বললো রানীমূর্তি। 'নিহতের হত্যাকারী বললে কি ভাল হত না? না, কুমার আবি, তুমি ভুল বলেছ। স্বর্গীয় অধিকারবলেই মিশরের সম্রাজ্ঞীর স্থান তার অনুগ্রহভাজনের ওপরে। দেবতাদের ইচ্ছায় অনুগ্রহভাজন একজনকেই সে স্বামী নাম দিয়েছে বটে, সময় হলেই প্রকাশ পাবে আসল কথা। এখন এসো, তোমার রানীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর। তোমার পর যেসব ক্রীতদাস তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল তারাও আনুগত্য জানাবে।'

মহাশোরগোল উঠলো মিলনায়তনে। সেখানে যারা উপস্থিত তাদের অনেকেই ফারাওয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে আবির সহ[illegible]হিসেবে কাজ করেছে। তারা বুঝে গেছে, নেতের-তুয়া যদি টিকে থাকে মৃত্যুও তাদের দিকে মুখ হাঁ করে থাকবে। তারা চিৎকার করে আবিকে বলতে লাগলো সে যেন ঐ মহিলার কথা না শোনে, দরকার হলে তাকে যেন

ছেঁচড়ে নামায় ঐ সিংহাসন থেকে, হত্যা করে মুকুট ছিনিয়ে নেয়। যারা ফারাও পরিবারের অনুগত এবং যারা হাঙ্গামা পছন্দ করে না তারা একজন দুজন করে পিছিয়ে এসে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত তুয়ার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন একজনও মিলনায়তনে রইলো না। বরং কিছু লোক বেরিয়ে যাওয়ার ফলে মিলনায়তন একটু ফাঁকা হওয়ায় ষড়যন্ত্রের অংশীদার যারা বাইরে ছিল তারা এসে তাদের স্থান দখল করতে লাগলো। তাদের মধ্যে যেমন আছে মরুচর বেদুঈন, তেমনি আছে মিশরের প্রাচীন শত্রু হিকসোস জাতির লোক, যারা আবির কাছে বরাবর প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে। আছে লেবাননের সেমাইট গোত্রের লোক আর পান্টের উপকূলীয় এলাকার কৃষ্ণাঙ্গ বর্বররা। মিশরের সম্পদে ভাগ বসানোর আশায় তারা আবির সঙ্গে যোগ দিয়েছে। মাঝখান থেকে এক নারী এসে তাদের আশা পূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, এটা তারা মেনে নিতে পারছে না।

'ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলুন ওকে!' চিৎকার করে উঠলো কয়েকজন। 'নষ্ট ফারাও এই জারজ মেয়েটাকে চাপিয়ে দিয়েছে দেশের ওপর! ও একটা ডাইনী! ওর ভেতর অশুভ আত্মা বাস করে! মারুন ওকে! মেরে ফেলুন! কুমার আবি, আপনি ভয় পেলে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন!'

অনেকক্ষণ চললো এমন হৈ-চৈ। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে চুপ করলো সবাই। এই পুরোটা সময় আবি ইতস্তত করেছে আর একটু পরপর ঘাড় ফিরিয়ে কাকুর পরামর্শ শুনেছে। এবার সে তুয়ার দিকে তাকিয়ে কথা বললো:

'দেখলে তো, রানী, নিজের কানেই শুনলে, আমার লোকেরা তোমাকে অবিশ্বাস করে। ওরা বড় দুর্দান্ত এবং দুর্বিনীত। বেশিক্ষণ আমি ওদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবো না। একবার যদি ওরা তোমাকে ধরতে পারে তোমার এই সুন্দর দেহটাকে ওরা ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলবে, সেৎ যেমন টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলেন ওসিরিসকে।'

স্থির বসে ছিল তুয়া, যেন এই পৃথিবীতেই ছিল না। এতক্ষণে যেন ঘুম থেকে জাগলো। 'উপমাটা যুৎসই হলো না, কুমার, ওসিরিস তো পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, তাই না?' বলে আসনে হেলান দিলো তুয়া এবং [illegible] চুপ।

'আমি তোমার স্বামী,' আবি বললো, 'তুমি কি এখনও চাও আমি তোমার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করি?'

'না কেন? ফারাওয়ের আদেশ কি কখনও বদলায়? নারী হলেও

আমি ফারাও।'

আর সহ্য করতে পারলো না আবি। রাগে তার মুখ লাল হয়ে উঠলো। টেনে হিঁচড়ে রানীকে সিংহাসন থেকে নামানোর হুকুম দিলো রক্ষীদের। রক্ষীরা তৎপর হয়ে ওঠার আগেই হাতের রাজদণ্ড উঁচু করলো রানী। কথা বললো নতুন এক স্বরে। এমন স্পষ্ট আর দৃঢ় সেই কণ্ঠস্বর, মিলনায়তনের সবাই তা শুনতে পেলো পরিষ্কার।

'ও জনগণ, তোমাদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটা হলো, মিশর শাসন করবে কে? আমি তোমাদের রানী। আমার পিতৃপুরুষেরা যেভাবে শাসন করে গেছেন আমিও কি সেভাবেই মিশর শাসন করবো, নাকি শাসন করবে ঐ লোকটা, যাকে আমেনের নির্দেশে আমি স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছি? দেখতে পাচ্ছি, এখানে তোমরা যারা আছ তাদের বেশিরভাগেরই দেহে বইছে হিকসোস রক্ত, যেমন বইছে ঐ লোকটার দেহে। একইভাবে ও যেমন চাইছে তেমনি তোমরাও চাইছ ও শাসন করবে, আর আমি হব ওর দাসী। এই চাওয়া পূর্ণ করতে গিয়ে তোমরা আবির সঙ্গে মিলে আমার দেবতার মত বাবা ফারাওকে হত্যা করেছ। আমি এখানে একা–এক দঙ্গল হিংস্র ক্ষুধার্ত শেয়ালের ভেতর একটা মেষ। আমার পক্ষে কি তোমাদের সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব?'

'চেষ্টা করেই দেখ পার কিনা!' চিৎকার করে উঠলো একজন। 'ভাল চাও তো নেমে এসো, মেষ, এবং আবি নামের সিংহের সামনে অথবা আমাদের মত শত-শৃগালের সামনে হাঁটু গেড়ে বসো। আমাদের দেহে আছে হিকসোস জাতির হিংস্র রক্ত, আমরা কখনোই তোমাকে স্বীকার করবো না। ফারাওয়ের জারজ মেয়ে, ঐ সিংহাসন থেকে নেমে এসে তোমার প্রভুর হারেমে গিয়ে ঢোকো, ওটাই তোমার যোগ্য জায়গা।'

'আচ্ছা! হিকসোস গুণ্ডার দল, তোমরা আমাকে স্বীকার করবে না? আবার বলছো ফারাওয়ের জারজ মেয়ে!' বলে চুপ হয়ে গেল তুয়া, যেন কিছু একটা পীড়িত করছে তাকে। কিছুক্ষণ হাতে হাত ঘষে ভাঙা গলায় বললো, 'তোমাদের এতজনের মাঝে আমি একা মেয়েমানুষ। আমার পিতা ফারাওকে তোমরা হত্যা করেছ, আমাকে বাগে পেয়ে রানী হিসেবে স্বীকার করতে চাইছ না। এমনি অবস্থায় কী [illegible] করতে পারি?'

'ভদ্র দাসী হয়ে যাও, জারজ মেয়ে, স্বামীকে মান্য করো,' কেউ একজন চিৎকার করে উঠলো।

হাসির হররা উঠলো মিলনায়তন জুড়ে। তুয়া তাকালো লোকটার দিকে। আবির বাহিনীর এক কর্মকর্তা, সেই রাতে রাজকীয় রক্ষীদের নিধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল এই লোক। অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকিয়েই রইলো তুয়া। কয়েক মুহূর্ত পরেই লোকটার আশেপাশে যারা ছিল তারা খেয়াল করলো তার ঠোঁট শাদা হয়ে গেছে, আর মুখ এমন ফ্যাকাসে যে মনে হচ্ছে দেহ থেকে সমস্ত রক্ত শুষে নেয়া হয়েছে। চারপাশে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে লোকজন দাঁড়িয়ে না থাকলে সে পড়েই যেতো। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য একটু সুস্থ হলো লোকটা। গরমে অসুস্থ বোধ করছে এই কথা বলে কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা পুরোহিতদের জটলার ভেতরে তাকে স্থান দেয়ার অনুরোধ জানালো। পুরোহিতরা মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে জায়গা করে দিলো। তুয়া লক্ষ করলো বিষয়টা। এবং কথা বললো আবার:

'মিশরের যে রানীকে বৈধভাবে অভিষিক্ত করা হয়েছে, এবং দেবতা স্বয়ং তাঁর পবিত্র একান্ত-মন্দিরে যার অভিষেক অনুমোদন করেছেন তাকে যাচ্ছেতাই ভাষায় গালাগাল করা হচ্ছে,' পুরোহিতদের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা সেই বর্বর সৈনিকটার দিকে চোখ এখনও তুয়ার। 'তা তো হবেই! তোমাদেরই সময় এখন। কী করবো আমি?' আবার কিছুক্ষণ দু'হাত কচলালো সে। 'এখানে যারা ভালমানুষ আছে তাদের বলছি, সবার বড় দেবতা আমেন আমার জন্ম মুহূর্তে আমার ভেতরে তাঁর আত্মার সৌরভ প্রবেশ করিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমার প্রয়োজনের সময় তিনি আমাকে সাহায্য করবেন। তোমাদের কি দয়া হবে? আমাকে একটু জায়গা করে দেবে, যাতে আমি আমেনের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে পারি? ঐ দেখ পশ্চিমাকাশে সূর্য লাল হয়ে উঠেছে–একটু পরেই অস্ত যাবে। যতক্ষণ না সূর্যদেব তাঁর পশ্চিম সিংহদ্বারে প্রবেশ করেন ততক্ষণ আমাকে প্রার্থনা করার সুযোগ দাও। এর মধ্যে যদি সাহায্য না আসে, তোমাদের কথাই আমি মেনে নেবো। হিকসোস রক্তধারী এই লোক যে তার জ্যোতিষী যাদুকর কাকু ও গুপ্তচরী মেরিত্রার সহায়তায় ফারাওকে হত্যা করেছে তাকে আমি স্বামী হিসেবে মেনে নেবো।'

আবি আমেনকে বিন্দুমাত্র ভয় করে না। তার চেয়ে বড় কথা এই হট্টগোলে তার নবপরিণীতা অপরূপা স্ত্রীর কোন ক্ষতি হয়ে যাক তা সে চায় না। একটু প্রার্থনাই তো করতে চাইছে? করুক না। এই ভেবে আবি বললো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জায়গা করে দাও, করুক প্রার্থনা।'

সিংহাসনের সামনে দাঁড়ানো লোকগুলো একটু পিছিয়ে যেতে তুয়া

দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে প্রার্থনা শুরু করলো সশব্দে:

'ও আমেন, আমার পিতা, আমার প্রার্থনা শোন। ও পিতা, তুমি দেখছ কী শোচনীয় অবস্থায় আমি নিপতিত। যে লোক তার ভাই এবং রাজা, আমার জাগতিক পিতাকে হত্যা করেছে তাকেই স্বামী হিসেবে মেনে নেয়ার নির্দেশ তুমি দিয়েছ। এই লাঞ্ছনাই কি তুমি তোমার কন্যার বিধিলিপি করে দিয়েছিলে? এটাই যদি তোমার ইচ্ছা হয় আমি মেনে নেব। যদি তা না হয়, যে প্রতিশ্রুতি তুমি আমার জন্মের সময় দিয়েছিলে সেই প্রতিশ্রুতির প্রমাণ দাও। যারা আমাকে রানী হিসেবে মানতে অস্বীকার করছে, যারা আমাকে জারজ সন্তান বলছে তাদেরকে আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করো। তোমার প্রতি আমি পূর্ণ আস্থাশীল। যদি তুমি আমাকে হত্যাও কর এই আস্থা আমার থাকবে। ও আমেন, ওরা হৃদয়ে তোমাকে স্বীকার করে না। ওরা অন্য দেবতাদের পূজা করে। ওদের ভেতর থেকে কেউ ফারাও হলে মিশর থেকে তোমার সব দেবালয় ওরা উচ্ছেদ করবে। ওদের এই অবাধ্যতা মেনে নেয়া যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমার কিছু বলার নেই। যদি তা না হয়, ওদের তুমি শাস্তি দাও, রক্ষা কর তোমার কন্যাকে। আমি বিশ্বাস করি আমি তোমার প্রেরিত। এমনভাবে তোমার ক্ষমতা দেখাও যাতে ওরাও বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় সত্যিই তুমি আমার পিতা।'

প্রার্থনা শেষ করে সিংহাসনে গিয়ে বসলো তুয়া। গালে হাত রেখে তাকিয়ে রইলো সূর্যাস্তের অপরূপ শোভার দিকে। ওর একার নয়, বিশাল মিলনায়তনের অন্য সবারও চোখ সেঁটে আছে অস্তগামন সেই মহিমার দিকে। তাদের কেউই বিশ্বাস করে না অলৌকিক কিছু ঘটবে। পুরোহিতরাও নয়। মেম্ফিসের পুরোহিতরা তাদের প্রশাসকের মতই আমেন বা তাঁর মহিমা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। তবু সবাই তাকিয়ে আছে যেন অলৌকিক কিছু ঘটবারই আশায়।

তুয়া তাকিয়ে আছে। অন্যরাও তাকিয়ে আছে। তাদের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে তুয়ার প্রার্থনার কথাগুলো। এমন নিশ্চিত নিবেদিত স্বরে সে আকুতি জানিয়েছে যে সবাই ভাবছে ঐ প্রার্থনার জবাবে কিছু ঘটবে। কিন্তু কিছুই ঘটলো না। তবে সবার মনে হলো বড় অদ্ভুত আজকের সূর্যাস্ত। গত কয়েকদিন ধরেই খুব গরম যাচ্ছে। কিন্তু এখনকার গরম রীতিমত ভয়াবহ, আতঙ্ককর। সেই সাথে প্রকৃতি যেন নিথর হয়ে গেছে একেবারে। কোথাও কোন বাতাস নেই। সারা নগরীতে কোন কিছুই নড়ছে না। একটা কুকুরও ডাকছে না, কাঁদছে না কোন শিশু।

বাতাস নেই তবু গাঢ় কাল এক মেঘ উঠে আসছে দিগন্ত থেকে ঊর্ধ্বাকাশে। মেঘের যেখানে সূর্যরশ্মি পড়লো সেখানে রঙ হয়ে উঠলো সোনালী, লাল আর কমলা। তার উপরেই নিকষ কালো। বাতাস নেই তবু নানা আকার ধারণ করছে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। ভাঙছে গড়ছে। যেন এক সেনাবাহিনী যুদ্ধের জন্যে অবস্থান নিচ্ছে। সেনাপতিরা রথে চেপে ছোটাছুটি করে বর্শাধারী পদাতিক আর অশ্বারোহী সৈনিকদের তদারক করছে। তারপর এক টুকরো মেঘ অন্যসব মেঘপুঞ্জের ওপরে উঠে আকাশের এ-প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো এমন এক চেহারা নিয়ে, মনে হতে লাগলো এক নারী তার সোনালী চুল এলো করে ছড়িয়ে দিয়েছে সারা আকাশে। সূর্যের ওপর তার পা। শরীরটা আকাশে আড়াআড়ি হয়ে অনেক দূরে পুবাকাশে সদ্য উঠে আসা চাঁদ ধরেছে হাত বাড়িয়ে।

মেঘের এই রূপ দেখে ভয় পেলো সবাই। 'এ তো চাঁদ হাতে দেবী আইসিস!' বলে উঠলো একজন। আরেকজন বললো, 'না, এ হচ্ছে দেবী-মাতা নূট, পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছেন!' দুজনের কথাই কানে গেল তুয়ার। এবং এই প্রথমবারের মত মুখের ভাবে পরিবর্তন হলো তার। ঠোঁটে ফুটলো শীতল কৌতূহলী একটু হাসি।

কাকু আবির কানে কানে কথা বলতে শুরু করেছে। দুজনেরই চোখে ফুটে উঠেছে উদ্বেগ। কাকু আঙুল তুলে দুটো তারার দিকে ইশারা করলো। কয়েক মুহূর্ত আগে হঠাৎ করেই ফুটে উঠেছে তারা দুটো। রানীর দি[illegible] চোখ ফিরিয়ে আবিকে কিছু বলার তাগিদ দিলো কাকু।

'রা[illegible]ব গেছে,' অবশেষে বললো আবি। 'তোমার বোকামি শেষ করো এবার।'

'এখনই না,' শান্ত কণ্ঠে বললো তুয়া। 'আরেকটু অপেক্ষা কর।'

তুয়ার মুখ থেকে কথাটা পড়তে না পড়তেই হঠাৎ, যেন কোন ইঙ্গিতে নদীতীরের বিশাল খেজুরগাছগুলো নুয়ে পড়লো পুবদিকে, যেন তারা সিংহাসনে আসীন রানীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছে। বাতাস নেই, অথচ পরপর তিনবার গাছগুলো একভাবে নুয়ে পড়ে অভিবাদন জানালো। তারপর মেঘের দল একসাথে ছুটলো আকাশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। মনে হলো মুহূর্তে কালো কাফনে ঢাকা পড়ে গেল সারা আকাশ। কেবল পশ্চিমে ডুবে যাওয়া সূর্যের সামান্য আভা তখনও দেখা যাচ্ছে। মেঘের নিচে সেই আভাটুকুকে মনে হচ্ছে বিশাল এক জ্বলন্ত চোখের মত। আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল আভা। অন্ধকার নেমে এলো চরাচরে। তখনও নিবিষ্ট মনে আমেনকে ডেকে চলেছে তুয়া।

'রা মরেছে!' চেঁচিয়ে উঠলো কেউ। 'দেখ্, দেখ্, বেজন্মা, রা মরেছে!'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমেন বেঁচে আছেন,' শান্ত-শীতল কণ্ঠে বিজয়ীর ভঙ্গিতে বললো তুয়া, 'বিশ্বাসঘাতকের দল, দেখ তার তরবারি!'

তুয়ার কথা শেষ হতে না হতেই তীব্র বিদ্যুৎঝলকে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল রাতের আকাশ। চোখ ধাঁধানো আলোয় সবাই দেখলো নদীতীরের খেজুরগাছগুলো আবারও ঝুঁকে প্রায় মাটিতে মাথা নুইয়েছে। একই সঙ্গে প্রবল বেগে ছুটলো বাতাস। পায়ের নিচের শক্ত মাটি দুলে উঠলো, যেন কোন দৈত্য হাতে তুলে নিয়ে দোলাচ্ছে মিলনায়তনটা। পর পর তিনবার একই রকম দুলুনি অনুভব করলো সবাই। তৃতীয় দুলুনির সময় গাঢ় অন্ধকারের ভেতর তীব্র তীক্ষ্ণ আতঙ্কের যন্ত্রণাকাতর চিৎকার উঠলো। পর মুহূর্তে মনে হলো সারা আকাশ যেন আগুনে গলে নেমে আসছে। সেই আলোয় দেখা গেল সিংহাসনে বসা আমেনের কন্যা নেতের-তুয়া রাজদণ্ড আকাশের দিকে তুলে বিজয়ীর হাসি হাসছে। মিলনায়তনের প্রধান দরজার দুপাশের দুই পাথরের স্তম্ভ দরজার ভারি কপাটসহ ভেঙে খান খান হয়ে মাটিতে ছড়িয়ে পড়লো। দুই স্তম্ভের কাছাকাছি যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের অনেকেই মারা পড়লো পাথরে চাপা পড়ে। পুরোহিতরা যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানেও একজন মারা গেছে ছুটে আসা এক পাথরের আঘাতে। তার হাড়-মাংস সব দলা পাকিয়ে পড়ে আছে। এ[illegible]ছে সেই সৈনিক যে রানীকে বিদ্রূপ করার পর অসুস্থ বোধ করে পু[illegible]হিতদের মাঝে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মিলনায়তনের পশ্চিমের দেয়াল ধসে পড়েছে। সেখান দিয়ে দলে দলে উন্মত্তের মত পালাচ্ছে মানুষ। কে কাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলছে, কাকে মাড়িয়ে যাচ্ছে সেদিকে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। আমেনের প্রতিশোধ থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে সবাই। পুরোহিতরা সবাই সিংহাসনের সামনে এসে নেতের-তুয়ার পায়ের কাছে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে তার এবং দেবতার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছে। তুয়া এখনও তেমনি রাজদণ্ড উঁচিয়ে হেসে চলেছে।

দেখতে দেখতে ফাঁকা হয়ে গেল মিলনায়তন। উপুড় হয়ে থাকা পুরোহিত, মৃত্যুপথযাত্রী, মৃত আর কয়েকজন কর্মকর্তাসহ আবি কেবল রইল। বাইরে মেঘ কেটে গেছে। চাঁদ ও তারার দল মৃদু শান্ত আলোয় ভরিয়ে দিচ্ছে প্রকৃতি। মাটিতে গুটিসুটি হয়ে পড়ে থাকা আবির দিকে তাকিয়ে কথা বললো তুয়াঃ

'তো, স্বামী, বলো এবার, মিশরের অধীশ্বর কে?'

'আমেন, তোমার পিতা,' ঢোক গিলে বললো আবি।

'আর মিশরের ফারাও?'

'তুমি, ও রানী, তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।'

'এ-নিয়েই তো আমাদের বিবাদ চলছিল, তাই না?' বললো তুয়া। 'ভেবেছিলে আমি অসহায়, ক্ষমতার দর্প দেখিয়ে যা বলবে মেনে নেব। সুতরাং আমার সাহায্যকারীদের ডাকতে হলো। দেখতে পাচ্ছ তাদের পায়ের ছাপ? একটু বেশি জোর-পায়ে এসেছিল, তাই না?' টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে থাকা দ্বার-স্তম্ভগুলোর দিকে ইশারা করলো সে।

ঘাড় ঘুরিয়ে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া মিলনায়তনটা দেখে আবি বললো, 'তুমিই ফারাও, আর কেউ নয়। তোমার এই ভৃত্যকে বাঁচতে দাও, তোমার ছায়ায় রাখো তাকে।'

'তোমার প্রথম চাওয়ার ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই,' শীতল কণ্ঠে বললো তুয়া, 'যদিও ভাগ্যক্রমে আমেন তোমার জীবনের ব্যপ্তি আরও কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছেন, তবু এ-ব্যাপারে চূড়ান্ত বোঝাপড়া তোমার করতে হবে আমার আগে যিনি চলে গেছেন তাঁর সাথে আর তাঁর সেই সব সঙ্গী যারা তোমার রাজপথে প্রাণ দিয়েছে তাদের সাথে। আর দ্বিতীয় চাওয়া– ওঠো, পুরোহিত আর সৈনিকরা, দেখ তোমাদের কুমার মিশরের রানীর প্রতি আনুগত্যের প্রমাণস্বরূপ তার পদচুম্বন করছেন।'

রানীর নির্দেশে তারা উঠে গা ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়ালো। সবাই কাঁপছে থর থর করে। রাজদণ্ড দিয়ে তুয়া তার পায়ের দিকে ইশারা করলো। সঙ্গে সঙ্গে আবি হাঁটু গেড়ে বসে চুমু খেলো তার পাদুকায়। তার দেখাদেখি পুরোহিত, আবির সহচর ও সৈনিকরা এগিয়ে এলো রানীর পায়ে ঠোঁট ছোঁয়ানোর জন্যে। জ্যোতিষী কাকুর পালা আসতেই পা সরিয়ে নিলো তুয়া।

'তুমি তো জ্যোতিষী-যাদুকর, গোপন বিদ্যায় অনেক পড়াশোনা তোমার; বলো তো তোমার হাত ফারাওয়ের রক্তে রঞ্জিত হওয়া সত্ত্বেও তুমি এখনও বেঁচে আছ কেন, যেখানে এর চেয়ে অনেক কম অপরাধ করেও অতগুলো লোক মারা গেল?'

ভয়ে থর থর করে কাঁপছিল কাকু। তুয়ার এই কথায় প্রাণ বেরিয়ে যেতে চাইল তার দেহ ছেড়ে। মাটিতে মাথা ঠুকে সে অস্বীকার করতে লাগলো অপরাধের কথা, একই সঙ্গে যে অপরাধ করেনি বলে বলছে তার জন্যে ক্ষমাও ভিক্ষা করতে লাগলো।

'থাম!' ধমক দিলো তুয়া, 'জেনে নাও, তোমার প্রাণ কিছুদিনের জন্যে ভিক্ষা দেয়া হয়েছে, তোমার স্ত্রী মেরিত্রারও। প্রধানমন্ত্রীর পদটাও আরও কিছুদিন থাকবে তোমার।'

শতকণ্ঠে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগলো কাকু। তাকে থামিয়ে দিয়ে তুয়া আবার বললো, 'আমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন নেই। বুঝতে পারছি এই ঘটনার শেষ তুমি জান না। যদি জানতে তুমি আর তোমার স্ত্রী পাগল হয়ে যেতে। আমার দিকে তাকাও, যাদুকর, বলো, আমি কে?' কাকু যেন ভাল করে দেখতে পায় যেন সেজন্যেই একটু ঝুঁকলো তুয়া।

মুখ তুলে তাকালো কাকু। চোখাচোখি হলো রানীর সাথে। তারপর আর চোখ সরাতে পারলো না সে।

'শোন, কাকু,' বললো তুয়া, 'একটু আগেই টের পেয়েছ, গোপন বিদ্যা আমারও কিছু জানা আছে। নইলে আমার কথায় কেন পৃথিবী কেঁপে উঠবে, এভাবে ভেঙে পড়বে স্তম্ভগুলো? একই বিদ্যায় পারদর্শী দুজনের মধ্যে কোন লুকোচুরি থাকা উচিৎ নয়। তাই আমি বলবো তোমাকে–হয়তো এরমধ্যেই তুমি আঁচ করেছ, তবু বলবো। আমি জানি, যা তুমি শুনবে তা কারো কাছেই উচ্চারণ করবে না, তবু বলি, উচ্চারণ করা মাত্র তোমার মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে, শুরু হবে তোমার নির্ধারিত শাস্তি। মোমের মূর্তির কারিগর, তাহলে শোন–' ঝুঁকে ফিস ফিস করে কিছু বললো তুয়া।

শোনামাত্র তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো কাকু। এবং দাঁড়িয়েই টলতে লাগলো মাতালের মত। আবি না ধরলে পড়েই যেতো।

'কী বললো?' জিজ্ঞেস করলো আবি। রানী অন্যমনস্ক হয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে আছে দেখে প্রশ্নটা করার সাহস পেয়েছে সে। কোন জবাব না দিয়ে আবির হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলে গেল কাকু।

১৩
সত্য জানলো আবি

এক চাঁদ চলে গেল। নতুন মাসের শুরুতে মেম্ফিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কার্যালয়ে বসে আছে প্রধানমন্ত্রী কাকু। নগরীর আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করছে। কাজটা সহজ নয়, হিসাবে গরমিল ধরা

পড়ায় গত দশ দিনে দুবার ফারাও বা রানীর নির্দেশে এই হিসাব বিবরণী ফেরত পাঠানো হয়েছে। আবি তার কর্মকর্তাদের ওপর বিশ্বাস রেখে এসব বিষয় তেমন খেয়াল করতো না। কিন্তু দিন বদলে গেছে। খাজনা বা কর যা আদায় হয়েছে, পুরোটাই রাজকোষে জমা হতে হবে, এটাই রানীর নির্দেশ। যে টাকা কম পড়ছে তা জোগাড় না হলে কাকুর সিন্দুক থেকেই তা পূরণ করতে হবে।

ঊর্ধ্বতন দুই খাজনা আদায়কারীকে ডেকে তাদেরকে টাকা দিতে বলেছিল কাকু। কিন্তু তারা কোত্থেকে দেবে? যে টাকার গরমিল দেখা যাচ্ছে তার বেশির ভাগ কাকুই হাতিয়েছে। তারপরেও কাকু জল্লাদ দিয়ে ঐ খাজনা আদায়কারীদের চাবকেছে। তারা টাকা জোগাড় করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর মনটা তার শান্ত হয়েছে।

উঠে নিজের দপ্তরে গেল কাকু। কামরায় ঢুকেই মুখোমুখি হলো আবির। কাকুর জন্যে অপেক্ষা করছিল সে। এই ক'দিনেই পুরো বদলে গেছে আবির চেহারা। বয়সে বুড়ো হলেও মুখে তার কোন ছাপ ছিল না। কিন্তু এখন রীতিমত বুড়ো সে। দেহ শীর্ণ হয়েছে, মুখে ফুটে উঠেছে বলিরেখা, চোখে অবসন্ন দৃষ্টি। আবির চেহারা এতটাই বদলেছে যে সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয় তাকে চিনতে পারলো না কাকু। অধস্তন কোন কর্মচারী ভেবে গালাগাল করে তাকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলো।

রাগে ফেটে পড়লো আবি। লাফ দিয়ে উঠে এক হাতে দাড়ি অন্য হাতে কান খামচে ধরলো কাকুর। 'কুত্তা,' চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'এভাবে তুই তোর প্রভুর সঙ্গে কথা বলিস! আজ তোকে আমি দেখে নেব!'

'ক্ষমা করুন, মহানুভব,' কাঁচুমাচু হয়ে বললো কাকু। 'অন্ধকারে চিনতে পারিনি। এত বদলে গেছে মহানুভবের চেহারা!'

'কেন বদলেছে? তোর বদ পরামর্শ শুনে ফারাওয়ের সিংহাসনে বসার চেষ্টা করতে গিয়েই আজ আমার এই চেহারা। তোকে আমি দেখে নেব! ভালই ছিলাম। পাশে ছিল আমার ছেলেরা, ছিল স্ত্রীরা। আমার ছিল নিজের সেনাবাহিনী। যা খাজনা আদায় হতো তার উপর ছিল আমার একক কর্তৃত্ব। আজ সব গেছে। ছেলেরা মৃত, স্ত্রীদের কে কোথায় জানি না। আমার সেনাবাহিনী অন্যের নির্দেশে চলে, রাজস্ব অন্যের দখলে।'

'অন্তত আপনি ফারাও তো হয়েছেন,' বিনয়ের সঙ্গে বললো কাকু, 'আর স্বামী হয়েছেন বিশ্বের সবচেয়ে রূপসী আর জ্ঞানী রমণীর।'

'ফারাও!' গর্জে উঠলো আবি। 'শহরের অতি সাধারণ সমাধিগৃহের

সবচেয়ে দীন মমিটাও আমার চেয়ে ক্ষমতাশালী রাজা ছিল।'

'আপনার কী হয়েছে, মহানুভব? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'কী হয়নি, হতভাগা? অশুভ কোন গ্রহের প্রভাব পড়েছে আমার ওপর!'

'নিশ্চয়ই আমেনের তারা!'

'হ্যাঁ, আমেনের তারা! সুন্দরীর চেহারায় ঐ মূর্তিমতি আতঙ্ক, যাকে তুই বলছিস আমার স্ত্রী! ও আমার স্ত্রী নয়, কাকু। কালও হারেমে ওর কামরায় আমি গিয়েছিলাম। দেখি আয়নার সামনে বসে গান করছে। পরনে ছিল পাতলা ফিনফিনে একটা শাদা পোশাক আর ওর কাল চুল। ওহ, কাকু, অমন চুল তুমি কখনও দেখনি, প্রায় মাটি পর্যন্ত ঝুলে পড়েছিল। আমাকে দেখে মিষ্টি হেসে তার ঐ উজ্জ্বল দুই চোখের ইশারায় কাছে ডাকলো। এমনকি মুখে স্বামী বলেও ডাকলো। প্রেমের কথা বললো। তখন আমি দুহাত বাড়িয়ে ওকে আলিঙ্গন করার জন্য এগিয়ে গেলাম।'

'তারপর–'

'তারপর, কাকু, ওহ! আমি যাকে জড়িয়ে ধরলাম সে সে নয়, ফারাওয়ের মমি, দাঁত বের করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আতঙ্কিত হয়ে তাকে ছেড়ে দিতেই দেখলাম যেখানে ছিল সেখানেই বসে আছে সেই সুন্দর মূর্তি, মাথায় সুগন্ধী লাগাচ্ছে। আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আমার কী হয়েছে, ভয় পাচ্ছি কেন, এটাই কি স্বামীর আচরণ?

'একমাস আগের সেই প্রথম রাতের মত প্রতিরাতেই এমন চলছে। স্ত্রীকে পাওয়ার জন্য গিয়ে পাই ফারাওয়ের মমিকে। আর সব সময় সে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। অন্য স্ত্রীদের কাছে যাওয়ারও উপায় নেই। সবাইকে ভয় দেখিয়ে সরিয়ে দিয়েছে। বলেছে, সে একাই স্বামীকে ভোগ করবে।'

'আর কিছু?' জিজ্ঞেস করলো কাকু।

'হ্যাঁ, আরও আছে। আমাকে যেমন ভোগাচ্ছে, পুরুষ মানুষ যে-ই তার কাছাকাছি যায় তাকেও তেমনি যন্ত্রণা দেয়। মোহিনী হাসি দিয়ে কাছে ডেকে চোখের চাহনি দিয়ে জাদু করে। প্রেমে পাগল হয়ে যখন তারা আরও এগোতে চায় তখন সরিয়ে দেয় দূরে। পাঠিয়ে দেয় কঠিন কোন কাজে। ষড়যন্ত্রে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিল তাদের দুজন এর মধ্যেই আত্মহত্যা করেছে, একজন পাগল হয়ে গেছে। অন্যরা বাইরে কিছু প্রকাশ না করলেও, টের পাচ্ছি, আমার ভয়ানক শত্রু হয়ে উঠেছে

তারা। ওরা রানীকে ভালবাসে আর মনে করে আমি তাদের মিলনের পথে বাধা হয়ে আছি।'

'এটুকুই?' জিজ্ঞেস করলো কাকু।

'না, আরও আছে। আমার সব ক্ষমতা আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। অপরিমেয় ক্ষমতা ছিল আমার। ফারাওয়ের পর আমিই ছিলাম দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মানুষ। অথচ আমি আজ ক্রীতদাস ছাড়া কিছু নই। আমার অপছন্দের সব কাজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত করে যেতে হচ্ছে–আমেনের মন্দির তৈরি করাতে হবে, খাল খনন করাতে হবে, সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ শুনে প্রতিকার করতে হবে, খাজনা মওকুফ করতে হবে। বেদুঈনরা সব সময় আমার বন্ধু; এখন বলা হচ্ছে তাদের শায়েস্তা করতে হবে। তারপর, সামনের চাঁদে খিতা-র রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে হবে। এই রাজার সঙ্গে আমার একটা গোপন চুক্তি আছে। তার মেয়েকে আমি বিয়ে করেছিলাম। মেয়েটাকে আমি ভালও বাসি। অথচ তাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'তারপর?' জানতে চাইল কাকু।

'ওহ! তার পরের কথা আরও ভয়ঙ্কর। মহামান্য রানী জানিয়ে দিয়েছে, খিতা জয় করে আসার পর আনুষ্ঠানিকভাবে থিবিতে ফিরবে সে। কারণ সেখানে নাকে জরুরি ভিত্তিতে আমার সমাধিগৃহ তৈরি করাতে হবে। বলছে, এ-কাজে একটুও দেরি করা যাবে না। এর মধ্যে ঐ সমাধিগৃহের নকশাও করে ফেলেছে। এমন ভয়ঙ্কর আর ভৌতিক তার চেহারা, কী বলবো! তোমার জন্যেও একটা ছোট সমাধিগৃহ তৈরি করাতে বলেছে। আজ সকালে মরুভূমির পাহাড়ী এলাকায় লোক পাঠিয়েছে তিনটে বড় পাথর আনার জন্যে। ওগুলো দিয়ে শবাধার বানাবে–একটা আমার জন্যে, একটা তোমার আর আরেকটা তোমার স্ত্রী মেরিত্রার জন্যে। বলেছে, এই উপহার দিয়ে প্রাচীন রীতিতে আমাদের সম্মানিত করবে।'

এরপর আর কাকু নিজেকে সামলাতে পারলো না। নিজের দাড়ি খামচে ধরে বিড় বিড় করতে করতে ঘরের এমাথা ওমাথা পায়চারি করতে লাগলো।

'এত কষ্ট আপনি সহ্য করছেন কী করে?' অবশেষে প্রশ্ন করলো সে। 'ছিলেন মহাপ্রতাপশালী কুমার, আজ পরিণত হয়েছেন এক নারীর ক্রীতদাসে। আপনার যে প্রজারা এক সময় আপনার নামেই ঠক ঠক করে কাঁপতো আজ আপনি তাদেরই ঠাট্টা-মস্করার পাত্র। কেন সহ্য

করছেন এই কষ্ট, এই অপমান? ওকে খুন করে বিষয়টার ফয়সালা করে ফেলছেন না কেন?'

'সাহস পাচ্ছি না,' জবাব দিলো আবি। 'এমন কিছু যদি আমি স্বপ্নেও ভাবি ও ঠিক টের পেয়ে যাবে, এবং আমাকেই খুন করবে। নির্বোধ, তোমার মনে নেই, বিয়ের দিন শ্বেত-প্রাসাদে কী ঘটেছিল? না, ওর বিরুদ্ধে আঙুলটাও তোলার সাহস আমার নেই।'

'সেক্ষেত্রে, কুমার, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই জোয়াল টেনে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। পাথরের শবাধার তৈরির কাজ যেদিন শেষ হবে আপনার জীবনও সেদিন শেষ হবে।'

'না, তা আমি হতে দেব না, কাকু। একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়, সেটা নিয়েই তোমার সাথে আলাপ করতে এসেছি। তুমি ওকে হত্যা করবে। শোন, তুমি হচ্ছো তন্ত্র-মন্ত্রের রাজা। যে যাদু বাপের ওপর কাজ করেছে, মেয়ের ওপরও তা করবে। আরেকটা মোমের মূর্তি তৈরি করে তার ভেতর শ্বাস প্রবেশ করাবে তুমি। এটা করতে পারলেই কেল্লা ফতে–কী পুরস্কার তুমি পাবে ভাবতে পার?'

'সেটাই ভাবছি, মাননীয় কুমার,' শুকনো কণ্ঠে বললো জ্যোতিষী। 'কী পুরস্কার জুটবে আমার কপালে বলবো? তিলে তিলে মৃত্যু। তার চাইতে বড় কথা আপনি যা বলছেন তা সম্ভব নয়। আপনি যদি সত্যি কথাটা জানতেন তাহলে একথা বলতেন না। ওকে মারা সম্ভব নয়।'

'কী বলছো তুমি, গর্দভ? রক্ত মাংসের দেহ মৃত্যুর কাছে হার মানতে বাধ্য।'

অসুস্থের মত একটা হাসি খেলে গেল কাকুর মুখে। 'আপনার জ্ঞানের প্রশংসা করতে হয়, কুমার,' বললো সে। 'মানুষের অভিজ্ঞতা বলে রক্ত মাংসের দেহ মৃত্যুর কাছে হার মানতে বাধ্য। হ্যাঁ, যদি রক্ত মাংসের দেহ হয়!'

'তোমার ঐ পিত্তি জ্বালানো হাসি থামাবে, ছাগল!' খেঁকিয়ে উঠলো আবি। খাপ থেকে তলোয়ার বের করে কাকুর মুখের সামনে ধরে বললো, 'এখন সুবোধ ছেলের মত বলো কী বোঝাতে চাইছ তুমি, নইলে–'

আবির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো কাকু। 'মাননীয় কুমার, আমি বলতে পারব না, আমাকে মাফ করুন। দেবতাদের গোপন কথা সেটা–'

'তাহলে দেবতাদের কাছেই তুমি যাও, মিথ্যেবাদী শয়তান,

তাদের সাথেই বিষয়টার ফয়সালা করো গিয়ে!' তলোয়ার তুললো আবি।

'ক্ষমা করুন, প্রভু! বাঁচান আমাকে!' মাটিতে শুয়ে পড়ে আবির পা জড়িয়ে ধরলো কাকু।

ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে ভেসে এলো কথাবার্তার আওয়াজ। সেই সাথে জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকেছে আলোর এক চক্র, আর অতি পরিচিত হাসির শব্দ। কাকুর মাথার ওপর থেকে তলোয়ার নামিয়ে নিয়ে আবি জানালাটার কাছে গিয়ে বাইরে তাকালো। মুহূর্ত পরেই ইশারায় কাছে ডাকলো কাকুকে।

'তোমার মৃত্যু পরেও ঘটানো যাবে। এখানে এসো, দেখ!'

ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো প্রধানমন্ত্রীর। আস্তে আস্তে হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে গেল। নিচে প্রাসাদের বাগানে দাঁড়িয়ে আছে রানী নেতের-তুয়া। গাছ-পালার পত্র-পল্লব ভেদ করে সূর্যের আলো এসে পড়েছে তার ওপর। একা নয় রানী। তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে দামি পোশাক পরা এক লোক। দেখেই লোকটাকে চিনতে পারলো কাকু–মেম্ফিসের এক অভিজাত ধনী, এবং সেনা কর্মকর্তা। তার বুদ্ধিমত্তা আর শৌর্য-বীর্যের কারণে আবি তাকে অল্প বয়েসেই উঁচু পদে বসিয়ে তার এক মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়েছে। ফারাওয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সে। মার্মিসের দেহে শেষ আঘাতটাও হেনেছিল এই কর্মকর্তা।

এখন সে অন্য ভূমিকায়। রানীর প্রেম ভিক্ষা করছে আকুল কণ্ঠে। রানীর ঝুল-পোশাকের নিচের অংশ খামচে ধরে চুমু খাচ্ছে আর আবেগে বলে যাচ্ছে বহু কথা। তার কথার কিছু কিছু বুঝতে পারলো ওরা। সে বলে চলেছে কী করে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সে দেয়াল টপকে এসেছে। সে রানীকে পূজা করে। তাকে ছাড়া বাঁচবে না। তার যে কোন নির্দেশ সে পালন করতে রাজি–রানী চাইলে আবিকে খুন করতেও পিছপা হবে না। মোটেই কঠিন নয় সেটা, কারণ সবাই আবিকে হিংসা করে, এবং মনে করে বুড়ো হাবড়াটা রানীর যোগ্য নয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

মাতালের মত অনর্গল এমন বকে চলেছে লোকটা। তুয়া শুনছে শান্তভাবে। আর মাঝে মধ্যে আমোদে হেসে উঠছে খিল খিল করে। শেষে উঠে দাঁড়িয়ে তুয়ার হাত ধরার চেষ্টা করলো লোকটা। হাত সরিয়ে নিয়ে তাকে পিছনে সরে যাওয়ার ইশারা করে তুয়া বললো, 'তুমি মার্মিসকে খুন করেছ। তিনি ছিলেন আমার পালক-পিতা।

আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন মার্মিস। তার দেহে শেষ আঘাতটা তুমিই হেনেছিলে, তাই না? তুমি যেমন সুপুরুষ তেমনি সাহসী। নইলে এভাবে এখানে আসার দুঃসাহস তুমি দেখাতে না। আমার একটা কথায়ই তোমার মৃত্যু হতে পারে। এখন যাও এখান থেকে। আমার স্বামীর মেয়ে তোমার স্ত্রী–সাহস থাকলে তাকে গিয়ে বলো কোথায় তুমি এসেছিলে, কেন এসেছিলে।'

তুয়ার কথা লোকটার কানে গেছে বলে মনে হলো না। সে আবারও তার আবেগঘন প্রেমাকুতি জানাতে শুরু করলো: তার প্রতি যেন একটু দয়া দেখানো হয়, প্রতীক হিসেবে হলেও সহানুভূতির নিদর্শন হিসেবে কিছু একটা যেন দেয়া হয়। অবশেষে মনে হলো দয়া হলো রানীর। বাগানের অনেক ফুলের ভেতর থেকে একটা তুলে নিয়ে তার হাতে দিয়ে দেয়ালের দিকে ইশারা করলো। আনন্দে আত্মহারা সৈনিক ছুটলো যেমন এসেছিল তেমনি দেয়াল টপকে চলে যাওয়ার জন্যে।

অদ্ভুত এক হাসি মুখে নিয়ে তার চলে যাওয়া দেখলো তুয়া। তারপর যে গাছ থেকে একটু আগে ফুল তুলেছে তাকালো সেটার দিকে। চিনতে পারলো কাকু, মমিকাররা এই ফুলের মালা পরিয়ে দেয় মমির মাথায়। আবি এসব কিছুই খেয়াল করলো না। ঈর্ষায় উন্মত্ত সে তখন। কাকুকে শাস্তি দেয়ার কথা ভুলে গেছে। তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে ঐ নারীমূর্তি আর তার জামাতা তরুণ সেনাকর্মকর্তা–দুজনকে শাস্তি দেয়ার আকাঙ্ক্ষা। দুজনকেই সে খুন করবে। নিজের চোখে যা দেখেছে আর যা শুনেছে তার পর জামাতাকে তো বটেই, রানীকেও খুন করার অধিকার তার জন্মেছে বলেই আবি মনে করছে।

'যত বড় রানী আর ফারাওই হোক, ওকে আমি খুন করবো!' খোলা তলোয়ার হাতে দরজার দিকে এগোলো আবি।

'সেটাই যদি আপনার ইচ্ছা হয়, কুমার, তাহলে এখানেই থাকুন,' বললো কাকু।

'কেন?'

'রানী নিজেই এখানে আসছেন।'

কাকুর কথা শেষ হতে না হতেই কামরার দরজা খুলে আবার বন্ধ হলো। সামনে দাঁড়িয়ে আছে আমেনের তারা নেতের-তুয়া।

প্রায়ান্ধকার ঘরে যেটা প্রথমেই তুয়ার নজরে পড়লো তা হলো আবির হাতের খোলা তলোয়ার। এক মুহূর্ত ওটার দিকে তাকিয়ে থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে এক কোণে জড়সড় কাকুকে দেখলো। তারপর তাকালো

আবির চোখের দিকে।

'হাতে খোলা তলোয়ার কেন, স্বামী?' জিজ্ঞেস করলো তুয়া।

'তোমাকে খুন করবো!' প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়লো আবি।

আগের মতই নীরবে, মুখে হাসি নিয়ে তাকিয়ে রইলো তুয়া আবির চোখের দিকে। অবশেষে মুখ খুললো সে, 'আচ্ছা! তবে এখনই কেন, কেন অন্য কোন সময়ে নয়? কাকুর পরামর্শ তোমাকে সাহস যুগিয়েছে?'

'বেহায়া মেয়েমানুষ, যেন কিছুই জানো না! এই জানালা দিয়ে নিচের বাগান দেখা যায়, তুমি জান?'

'ওহ, এবার বুঝেছি। তোমার যে প্রিয় সেনাধ্যক্ষ এবং জামাতা মার্মিসকে খুন করেছে, এবং আমার কাছে প্রেম নিবেদন করেছে তার কথা বলছ? এটা আমার কোন বিষয় নয়। তোমরা যে আমাদের দেখছ এটা বুঝতে পেরে আমি ওকে একটা শেষকৃত্যের ফুল উপহার দিয়ে দিয়েছি। এখন তুমি আর তোমার মেয়ে গিয়ে তোমার জামাইয়ের সাথে বোঝাপড়া কর। তবে তোমাকে সাবধান করি, এরকম অপরাধের জন্যে যদি তুমি মানুষের জীবন নেয়া শুরু কর তাহলে শিগগিরই দেখবে তোমার আর চাকর বাকর অবশিষ্ট নেই। তারা সবাই পাপী আর তোমার জায়গায় বসতে চায়।'

আর সহ্য করতে পারল না আবি। প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ে অকথ্য ভাষায় গালাগাল আর ভয়ানক শাপ-শাপান্ত করতে লাগলো তুয়াকে। মেরে ফেলবে বলে হুমকি দিতে লাগলো বার বার। নেতের-তুয়া নীরবে শুনে গেল। আবির কথা শেষ হওয়ার পর শান্ত স্বরে বললো, 'তুমি কথা বলো বেশি, কাজ করো কম। তোমার হাতে রয়েছে খোলা তলোয়ার, ব্যবহার করো, এই তো আমি।'

এই বিদ্রূপের পর আর হাত গুটিয়ে থাকা যায় না। তলোয়ার উঁচিয়ে ধেয়ে গেল আবি তুয়ার দিকে। কিন্তু দু'পা যাওয়ার আগেই ছিটকে পিছিয়ে আসতে হলো, যেন অদৃশ্য কোন শক্তি তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। দেয়ালে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আবার সে এগিয়ে গেল। আবারও পিছিয়ে আসতে হলো।

'এত বছর ধরে হাত পাকানোর পরেও কসাই হিসেবে একবারেই আনাড়ি তুমি,' আবারও বিদ্রূপ করলো তুয়া। 'কাকুকে দাও তলোয়ারটা। খুন-খারাবিতে ও তোমার চেয়ে পটু।'

'ও মহামান্য রানী,' কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো জ্যোতিষী, 'অমন নিষ্ঠুর কথা বলবেন না। আপনি জানেন, আপনার বিরুদ্ধে হাত তোলার

আগে আমি হাজার বার মৃত্যু বরণ করবো।'

'হুঁ।' গম্ভীর তুয়ার কণ্ঠস্বর। 'কুমার আবি তোমাকে বলেছিল আমাকে খুন করতে, এবং নিজস্ব কারণে তুমি তাতে রাজি হওনি। কিন্তু তার আগে তুমিই কি তাকে পরামর্শ দাওনি যেন আমাকে খুন করে?'

আবির হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেল।

'জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তোমার জামাতার সাথে আমাকে দেখার আগে কী নিয়ে আলাপ করছিলে তোমরা? এই কুকুরটাকে খুনই বা করতে চাইছিলে কেন?' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তুয়া নিজেই আবার বললো, 'আমিই দিয়ে দেব জবাব? আমার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় কী করে তা নিয়ে আলাপ করছিলে তোমরা। আর তুমি ওকে খুন করতে চাইছিলে কেন কাজটা ওর পক্ষে করা সম্ভব নয় ও তা বলতে চাইছিল না বলে। কী করে বলবে? ও তো জানে, বলামাত্র ও মারা যাবে। তুমিও জানতে চাও? ঠিক আছে, তাকাও আমার দিকে, হতভাগা পুরুষ। লোকজন তোমাকে আমার স্বামী বলে জানছে, কিন্তু তুমি অভিশপ্ত ক্রীতদাস। আমেন তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন পাতালপুরীতে যাওয়ার আগে পৃথিবীতেই কিছু শাস্তি দিয়ে দেয়ার জন্যে। তাকাও আমার দিকে!'

মুখ তুলে তাকালো আবি। কাকুও তাকালো। এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল দুজন। প্রচণ্ড যন্ত্রণা সহ্য করার মত গোঙাতে গোঙাতে মাথা ঠুকতে লাগলো মেঝেতে। যা তারা দেখেছে, পরে যে ক'দিন বেঁচে ছিল কাউকে বলেনি তারা।

অনেকক্ষণ পর কেউ যেন ওদের বুকের ভেতর থেকে আতঙ্ক সরিয়ে নিলো। আস্তে আস্তে মুখ তুলে তাকালো আবার। আগের মতই অপরূপা রমণী দাঁড়িয়ে তাদের সামনে।

'কী তুমি?' ঢোক গিলে বললো আবি। 'দেবী সেখেত, রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে আবির্ভূত হয়েছ? নাকি মৃত্যুর রানী আইসিস? না মৃত তুয়ার প্রেতাত্মা, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে এসেছ?'

'তোমার যা ইচ্ছা বলতে পারো, আমি ওদের সবই, অথবা কোনটাই নয়। তবে এটা সত্যি আমাকে পাঠানো হয়েছে প্রতিশোধ নিতে। তোমার জ্যোতিষীকে জিজ্ঞেস করে দেখ। ও জানে। ওকে বলার অনুমতি দিচ্ছি আমি।'

'আমেনের কন্যার দ্বিতীয়-সত্তা,' গোঙানির মত আওয়াজ বেরোলো কাকুর গলা দিয়ে। 'রানী নেতের-তুয়ার কা। যারা তার প্রতি অবিচার

করেছে তাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে ওকে পাঠানো হয়েছে। মৃত ফারাও আর রানী নেতের-তুয়ার বিরুদ্ধে যারা দাঁড়িয়েছে তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়ে মারার জন্যে তাদের সবাইকে আমেন ওর হাতে তুলে দিয়েছেন।'

'মিশরের রানী নেতের-তুয়া তাহলে কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো আবি। 'ওসিরিসের কাছে?'

'বলবো, বলবো,' জবাব দিলো নেতের-তুয়ার দ্বিতীয় সত্তা। 'ও মারা যায়নি, বেঁচে আছে। যাকে সে ভালবাসে তার সন্ধানে গেছে। ও যখন ফিরে আসবে, আমি বিদায় নেব, আর মৃত্যু হবে তোমাদের। এটাই তোমাদের নিয়তি। ততদিন আমার হুকুম তামিল করো–উঠে দাঁড়াও!'

১৪

রা-এর তরণী

আমেনের ভোরের তারা, নেতের-তুয়া চোখ মেললো। অনেকক্ষণ ঘুম আর জাগরণের মাঝামাঝি এক অবস্থায় শুয়ে থেকেছে সে। শুনতে পাচ্ছিল পানিতে দাঁড় পড়ার ছপাৎ ছপাৎ শব্দ। মনে হচ্ছিল স্বপ্ন দেখছে, আসলে ও থিবিতেই আছে। শুয়ে আছে রাজপ্রাসাদে ওর নিজের পালঙ্কে। একটু পরেই যখন দিনের আলো ফুটে উঠবে পরিচারিকারা আসবে ওকে জাগাতে।

থিবির রাজপ্রাসাদ! এতক্ষণে তুয়ার মনে পড়লো রাজধানী ছেড়ে এসেছে সে কয়েকমাস আগে। এর মধ্যে বহু পথ পাড়ি দিয়ে মিশরের অনেকগুলো নগর ভ্রমণ করে পৌঁছেছিল শ্বেত-প্রাচীরে ঘেরা মেম্ফিসে। সেখানে নানা অঘটন আর বিপর্যয় নেমে এসেছিল ওর ওপর। একে একে সব মনে পড়ল–ফাঁদ পেতে ওদের আটকানো, জাদুর সাহায্যে ফারাওকে হত্যা করা, যুদ্ধ এবং ওর রক্ষীদের নিহত হওয়া; তারপর মিনারে অনশন, ওর রূপ ধরে আসা ওর কা-য়ের সঙ্গে কথাবার্তা, এবং সব শেষে পালক মা আসতির হাত ধরে মিনারের উপর দিককার এক জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়া। ওহ! কোন সন্দেহ নেই সব শেষ, ও মারা গেছে। আর এই সব স্বপ্ন আর স্মৃতি মনে আসছে পাতালপুরীতে আছে বলে। কিন্তু, তাহলে পানিতে দাঁড় ফেলার শব্দ শুনতে পাচ্ছে কেন?

ধীরে, খুবই ধীরে চোখ মেললো তুয়া, ভয় হচ্ছে চোখ খুলে কী না

জানি দেখতে পায়। দেখতে পেলো চাঁদ, পরিষ্কার আকাশে বিরাট এক লণ্ঠনের মত জ্বলছে। ও শাদা পোশাক পরে শুয়ে আছে এক ছাউনির নিচে একটা খাটে। ছাউনির সামনের দিকের রেশমি পর্দা সরানো। সেখান দিয়েই আসছে চাঁদের আলো। ওর পাশে ধূসর রঙের পোশাক পরা আরেকটি দেহ। তুয়া জানে আসতি ওটা। নিথর শুয়ে আছে। এত নিথর যে ওর মনে হলো মারা গেছে আসতি। তবু ও ফিস ফিস করে ডাকলো:

'দাইমা! দাইমা, শুনতে পাচ্ছ?'

পাশের দেহটা নড়ে উঠলো। মাথা কাত করে তাকালো ওর দিকে। তারপর শোনা গেল আসতির গলা, 'হ্যাঁ, রানী, শুনতে পাচ্ছি, দেখতেও পাচ্ছি। কিন্তু, কোথায় আমরা?'

'মনে হয় পাতালপুরীতে। সেই আগুনটা ছিল মৃত্যু, এখন আমরা আত্মাদের রাজ্যে চলেছি।'

'তা-ই যদি হবে তো এ বড় অদ্ভুত ব্যাপার যে আমাদের এখনও চোখ আছে, কান আছে; আছে শরীর এবং মরণশীল মানুষের মত কথা বলার ক্ষমতা। উঠে বসে দেখা যাক।'

উঠে বসলেন দুজন। একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে বাইরে তাকালেন। অসম্ভব সুন্দর একটা জাহাজে রয়েছেন ওঁরা। জাহাজের যেখানে সেখানে সোনা আর রূপা দিয়ে নকশা করা। যে ছাউনির নিচে ওঁরা রয়েছেন সেটা জাহাজের মাঝামাঝি জায়গায়। পেছন দিকের পর্দা সরিয়ে তুয়া দেখলো শাদা পোশাক পরা দাঁড়ীরা দাঁড় টেনে চলেছে। জাহাজের একদম পিছনে উঁচু মঞ্চমত একটা পাটাতনের ওপর দাঁড় ধরে দাঁড়িয়ে আছে একজন। তার মুখটা কাপড় দিয়ে ঢাকা। তার পেছনে দেখা যাচ্ছে প্রশস্ত, আঁকাবাঁকা রূপালি নদী এবং আরও দূরে নদীতীরে খেজুর গাছের সারি আর মন্দিরের চূড়া।

'রা-এর নৌকা!' বিড় বিড় করে উঠলো তুয়া। 'মৃত্যুনদী পেরিয়ে সূর্যের পেছনের রাজ্যে নিয়ে চলেছে আমাদের।' বলেই বিছানায় লুটিয়ে পড়লো সে, এবং আবার ঘুমিয়ে গেল অথবা অচেতন হয়ে পড়লো।

তুয়া আবার যখন জাগলো তখন সূর্য উঠে এসেছে অনেকটা উপরে। আসতি পাশে বসে তাকিয়ে আছেন তার মুখের দিকে। তার চাইতেও বড় কথা সামনে টেবিলে থরে থরে সাজানো রয়েছে নানা ধরনের খাবার।

'ব্যাপার কী বলো তো, দাইমা,' দুর্বল কণ্ঠে বললো তুয়া। 'কোন দুনিয়ায় রয়েছি আমরা?'

'মনে তো হচ্ছে আমাদের দুনিয়াতেই,' বললেন আসতি, 'তবে এ-মুহূর্তে যাঁদের অধীনে, তাঁরা এই দুনিয়ার নয়। এই জাহাজটাও পৃথিবীর সাধারণ কোন জাহাজ নয়। খিদে পেয়েছে, খেয়ে নেই চলো।'

তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া শেষ করে দুজন ছাউনির বাইরে এসে দাঁড়ালো। চারপাশে তাকিয়ে দেখলো বড় একটা জাহাজের উপরের পাটাতনে রয়েছে ওরা। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, পাটাতনের যে অংশে ওদের ছাউনি সেই অংশটা রয়েছে রুপোর তৈরি জালের ভেতর। সে-জাল থেকে বেরোনোর কোন পথ নেই। জালের ফাঁক দিয়ে ওরা দেখলো, দাঁড়গুলো সব জাহাজের ভেতর দিকে, দাঁড়ীরা নেই–বোধহয় বিশ্রাম নিতে গেছে। মাস্তুলে তুলে দেয়া হয়েছে লাল রঙের বিরাট কয়েকটা পাল। জাহাজের সামনে গলুইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে কাপ্তেন। শাদা পোশাক পরা। মুখে মুখোশ থাকায় তার চেহারা দেখা যাচ্ছে না। জাহাজটা এখন আর নদী দিয়ে চলছে না, চলছে একটা খালের ভেতর দিয়ে। দুপাশে যতদূর চোখ যায় বালুময় ধু ধু মরুভূমি।

মরুভূমির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আসতি বললেন, 'মনে হচ্ছে খালটা আমার চেনা। খুব ছোটবেলায় একবার এই খাল দিয়ে আমি নৌকায় করে গিয়েছিলাম। প্রাচীন যুগের ফারাওরা এটা খনন করিয়েছিলেন। হিকসোস রাজাদের পতনের পর পুনর্খনন করানো হয়। বুবাস্তিস থেকে শুরু হয়ে সূর্যোদয়ের দিকে গেছে এ-খাল।'

'হতে পারে,' বললো তুয়া। 'যা-ই হোক, আমরা অন্তত আমাদের পৃথিবীতে আছি, আর আমেনের দয়ায় এবং আমার আব্বার ক্ষমতায় এখনও বেঁচে আছি। কাপ্তেনকে ডেকে জিজ্ঞেস করো না এই জাদুর জাহাজে করে কোথায় আমাদের নিয়ে চলেছে।'

ডাকলেন আসতি। কিন্তু শুনতে পেয়েছে এমন কোন চিহ্ন দেখা গেল না কাপ্তেনের আচরণে, যদিও তার মুখোশ পরা মুখটা এদিকেই ফেরানো। সে আসলে মানুষ না অশরীরী তা-ও বোঝা গেল না। পেছনে হালে বসা লোকটাকেও ডাকা হলো। তার কাছ থেকেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সুন্দর জাহাজটা আর দুপাশের ঊষর মরুভূমি দেখতে দেখতে, আর কোথায় ওরা, কেমন করে এখানে এসেছে ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে ওরা আবার ছাউনির নিচে চলে এলো। দেখলো বিছানার চাদর বালিশ সব বদলে দেয়া হয়েছে। নতুন করে খাবার দেয়া হয়েছে টেবিলে।

'নিশ্চয়ই যাদুর ক্ষমতায় চলছে সব,' চামড়ার গদি মোড়া হাতির দাঁতের একটা আসনে বসতে বসতে বললো তুয়া।

'তাতে সন্দেহ আছে নাকি?' বললেন আসতি। 'তোমার জন্ম যাদুর ক্ষমতায়, ফারাও মারা গেলেন যাদুর ক্ষমতায়, আমরা রক্ষাও পেলাম যাদুর ক্ষমতায়। বিশ্বচরাচর যে চলছে সে-ও তো বোধ হয় যাদুর ক্ষমতায়।'

একটু ভেবে তুয়া বললো, 'যা-ই বলো, আবি শুয়োরটার খোঁয়াড়ের চেয়ে ভাল এই জাহাজ। আর আমরা এই যে জাহাজে করে যাচ্ছি এটাও অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন নয়। তবে আমার কা, আমার দ্বিতীয় আত্মা মিশরের সিংহাসনে বসে কী করছে, আর আমরা কেমন করে এই জাহাজে এলাম, যাচ্ছিই বা কোথায় তা জানতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে।'

'সময় হলেই জানবে। আবির কথা যখন বললে, লোকটাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করলেও ওর জন্যে আমার দুঃখ হয়।'

ছাউনির নিচেই রইলো ওরা। সময় কাটলো মরুভূমির দিকে তাকিয়ে থেকে। সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লে বাইরে বেরিয়ে হাত-পায়ের জড়তা ছাড়িয়ে এলো। খেয়ে নিলো সময় হলে। নতুন সুস্বাদু খাবার। কোত্থেকে, কে দিয়ে গেছে জানে না। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লো মখমলের চাদর পাতা বিছানায়।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙলো, দিনের আলো ফুটে উঠেছে, তবে সূর্য ওঠেনি। জাহাজ দুর্দান্ত গতিতে চলেছে বিক্ষুব্ধ সাগরের ওপর দিয়ে। চারদিকে অথৈ উথাল-পাথাল জল। প্রবল বাতাসের প্রচণ্ড গর্জনে কান পাতা দায়। ডাঙার কোন চিহ্ন কোনদিকে দেখা যায় না। ওদের ওপরের ছাউনিটা নেই। তার জায়গায় বসেছে ভারি সিডার কাঠের কামরা। অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার দেখতে দেখতে গা সওয়া হয়ে গেছে তুয়া আর আসতির। তাছাড়া ওদের পুরো মনোযোগ দখল করে রইলো সাগরের রুদ্র রূপ। ফলে ছাউনি পরিবর্তন ওদের তেমন নজরে পড়লো না। এভাবে তিনদিন তিনরাত সাগরের ওপর দিয়ে ধেয়ে চললো ওরা। কেমন এক নিস্তেজ ভাব ভর করে থাকায় এর বেশির ভাগ সময় কাটলো ঘুমিয়ে।

চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পর জাহাজের ভয়ানক গতি স্তব্ধ হলো। বাইরে বাতাসের গর্জন থেমে গেল। সাহস করে ওরা বের হলো সিডার কাঠের কামরা থেকে। বিরাট এক নদীর মোহনায় প্রবেশ করছে জাহাজ। নদীতীরে বিশাল বিশাল গাছ। তাদের দীর্ঘ আঁকাবাঁকা শেকড় নেমে গেছে পানিতে। সেই সব শেকড়ের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে কুমীর এবং আরও নানা ধরনের সরীসৃপ। জাহাজে শাদা পোশাক পরা দাঁড়ীদের দেখা যাচ্ছে আবার। বাতাস পড়ে যাওয়ায় দাঁড়ের সাহায্যেই

নদীতে ঢুকছে জাহাজ।

অবশেষে একটা বেলে চরার কাছে নোঙ্গর ফেলা হলো। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ফিরে এলো তুয়া আর আসতির ভেতর। টেবিলে খাবার সাজানোই ছিল। খাওয়া শেষ হওয়ার পর পরই মুখোশ পরা দুই লোক হাজির। দুজনেরই হাতে একটা করে ঝুড়ি। আসতি প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। কিন্তু কাপ্তেন আর হালের মাঝির মতই বোবা-কালা যেন লোক দুটো। জবাব না দিলেও তারা বিনয়ের সঙ্গে সামনে ঝুঁকে ডাঙার দিকে ইশারা করলো। তুয়া দেখলো তীরে একটা পাথরের ওপর আগুন জ্বলছে।

'ওরা আমাদের জাহাজ থেকে নামতে বলছে,' আসতি বললেন। 'চলো, রানী, সৌভাগ্যের পথে এগিয়ে যাই।'

'চলো,' বললো তুয়া, 'নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য ছাড়া আমাদের এতদূর নিয়ে আসা হয়নি।'

দুই মুখোশধারীর সঙ্গে জাহাজের কিনারে গেল ওরা। রুপোর জালের বেষ্টনী সরে গেল স্বয়ংক্রিয়ভাবে। সিঁড়ি নেমে গেছে জাহাজের কিনার থেকে তীর পর্যন্ত। সিঁড়িতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে লোক দুটো তুয়া ও আসতির হাতে একটা করে ঝুড়ি ধরিয়ে দিয়ে বিনীতভাবে কুর্ণিশ করে চলে গেল। ওদের পা ডাঙা স্পর্শ করা মাত্র সিঁড়ি তুলে নেয়া হলো। জাহাজের বিরাট দাঁড়গুলো ছপাৎ ছপাৎ শব্দে পড়তে লাগলো তীরের কাছের ঘোলা পানিতে।

বড় একটা বৃত্ত তৈরি করে ফিরতি পথে রওনা হলো জাহাজ। সামনে গলুইয়ের কাছে কাপ্তেন আর পিছনে মাঝি তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। ডুবন্ত সূর্যের লালচে কমলা আলোয় তাদের অবয়ব দুটোকে মনে হচ্ছে আগুনের শিখা। হঠাৎ দুজন একসাথে সরিয়ে ফেললো মুখোশ। মুহূর্তের জন্যে তাদের মুখ দেখতে পেলো তুয়া আর আসতি। আশ্চর্য! কাপ্তেনের মুখটা ঠিক তুয়ার বাবা ফারাওয়ের মত আর হালের লোকটার মুখ আসতির স্বামী মার্মিসের মত।

মুহূর্তের জন্যেই কেবল তাদের দেখা গেল। তারপরেই কালো এক মেঘ ঢেকে ফেললো অস্তায়মান সূর্যকে। মেঘ যখন সরে গেল তখন আর নেই জাহাজটা। দুই নারী একে অন্যের দিকে তাকালো। দুজনেরই চেহারায় ভয়ের ছাপ।

'ভূতুড়ে জাহাজ!' বললো তুয়া, 'আর এই কদিন প্রেতাত্মারা আমাদের ওপর ভর করে ছিল!'

'হ্যাঁ, রানী,' জবাব দিলেন আসতি, 'প্রথম থেকেই আমার সেরকম

মনে হচ্ছিল। মনে সাহস রাখো। এই প্রেতাত্মারা যখন মানুষ ছিলো তখন আমাদের ভালবাসতো, সন্দেহ নেই এখনও বাসে। কোন খারাপ উদ্দেশ্যে তারা আমাদের আবির খপ্পর থেকে রক্ষা করে এই তীরে পৌঁছে দেননি। ঐ যে দেখ, ওখানে আগুন জ্বলছে। চলো, সাহস নিয়ে এগিয়ে যাই। মনে ভরসা রাখো, ভাল ছাড়া কিছু ঘটবে না।'

অন্ধকার নেমে আসতে শুরু করেছে প্রকৃতিতে। দুজন এগিয়ে গেলেন পাথরটার কাছে। আগুনের সামনে বসলেন। পাশে টুকরো কাঠ সাজানো রয়েছে। কাঠের পাশেই রয়েছে উটের পশমে বোনা নরম শীতবস্ত্র। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। দুজন পরে নিলেন আলখাল্লা দুটো। আগুনে কয়েকটা কাঠ গুঁজে দিয়ে জাহাজ থেকে দেয়া ঝুড়ির মুখ খুললেন। প্রথম ঝুড়ি, যেটা আসতির হাতে, সেটায় রয়েছে খাবার–পিঠা, শুকনো মাংস আর খেজুর। তুয়ার ঝুড়িতে পাওয়া গেল হাতির দাঁতে তৈরি সুন্দর একটি বীণা, সোনার কারুকাজ করা তাতে, তারগুলোও সোনার। তুয়া ওটা বের করে আগুনের আলোয় ভাল করে দেখেই চমকে উঠলো।

'এ বীণা তো আমার!' বললো সে, 'কেশ-এর যুবরাজ আমাকে উপহার দিয়েছিল। এই বীণা বাজিয়েই আমি সেই সন্ধ্যায় গান করেছিলাম। কিন্তু এ-বীণা থিবি থেকে এখানে এলো কী করে?'

'আমরা কীভাবে এসেছি? আমার এই প্রশ্নের জবাব দাও, আমি তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারব।'

বীণাটা নামিয়ে রেখে তুয়া আবার তার ঝুড়ির ভেতর তাকালো। শুকনো প্যাপিরাসের একটা আস্তরণের নিচে রয়েছে হাজার হাজার মুক্তা, বিভিন্ন আকারের। এমন উজ্জ্বল আর সুন্দর সেগুলো, অমন মুক্তা কখনও দেখেনি তুয়া। ভিন্ন ভিন্ন আকারের মুক্তা রেশমি সুতো দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মালায় গাঁথা। বিভিন্ন আকারের মুক্তার অনেকগুলো মালা পরতে পরতে সাজানো।

'পৃথিবীর কোন সম্রাজ্ঞীর এত মুক্তা নেই!' বললো তুয়া। 'কিন্তু এই জঙ্গলে মুক্তা আর বীণা আমার কী কাজে আসবে?'

'সময় হলেই জানা যাবে আশাকরি,' বললেন আসতি। 'এসো, এই উপহারের জন্য দেবতাদের ধন্যবাদ জানিয়ে খেয়ে নেই।'

খাওয়া শেষে আর কিছু করার নেই দেখে দুজন শুয়ে পড়লো ঘুমানোর জন্য। কিন্তু চোখ বন্ধ করতে না করতেই মনে হলো সারা বন যেন জেগে উঠেছে। প্রথমেই নদীর দিক থেকে ভেসে এলো রক্ত হিম করা গর্জন। বুঝতে অসুবিধা হলো না, ওটা সিংহের গর্জন। থিবির

কয়েকটা বাগানে সিংহসহ বেশ কয়েক ধরনের বন্য প্রাণী পোষ মানিয়ে রাখা হয়েছে। সেগুলোর ডাক শোনা আছে ওদের। সিংহের গর্জনের পর শোনা গেল নেকড়ে আর বুনো শুয়োরের ডাক। তারপর গুরুগম্ভীর নাক ডাকার মত আওয়াজ গণ্ডার ও জলহস্তীর।

আওয়াজগুলো ক্রমশ কাছিয়ে আসছে। অবশেষে ওরা দেখতে পেলো বনের প্রান্তে অসংখ্য হলদেটে চোখ অন্ধকারে তারার মত জ্বল জ্বল করছে। আর নিচে বালুচরের ওপর দৌড়াদৌড়ি করছে কিছু অবয়ব। তাদের নাক টেনে গন্ধ শোঁকার আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে।

'এবার আমরা শেষ,' ভয়-কম্পিত স্বরে বললো তুয়া, 'এই সব জন্তুর পেটেই যেতে হবে!'

আসতি কোন জবাব দিলেন না। আগুনের শিখা দেখে ভয় পেয়ে জন্তু-জানোয়াররা পালাতে পারে ভেবে তিনি আগুনে আরও কয়েকটা কাঠ গুঁজে দিলেন। কিন্তু পালালো না জন্তুগুলো। ভয়ানক ক্ষুধার্ত তারা। এগিয়ে আসতে লাগলো গুঁড়ি মেরে। এর মধ্যে হায়েনাও যোগ দিয়েছে দলে। তাদের রক্ত হিম করা হাসির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে একটু পরপরই।

'এখনই লাফ দেবে আমাদের খাওয়ার জন্যে!' অস্থির কণ্ঠে বললো তুয়া।

'তোমার পিতা স্বর্গীয় ফারাও আর আমার স্বামী মার্মিসের আত্মা রা-য়ের তরণীতে করে আমাদের এতদূর পৌঁছে দিয়েছেন কি এই সব বুনো জন্তুর পেটে যাওয়ার জন্য?' জিজ্ঞেস করলেন আসতি। তারপর কোন এক অনুপ্রেরণায় বললেন, 'দুশ্চিন্তা না করে বীণাটা হাতে নাও, গান করো।'

বাধ্য মেয়ের মত তুয়া বীণা তুলে নিয়ে সোনার তারে টোকা দিলো। শুরু হলো গান। প্রথমে একটু যেন কেঁপে গেল তুয়ার গলা। তবে তা মুহূর্তের জন্যে। তারপর একটু একটু করে চড়তে লাগলো গানের পর্দা। কিছুক্ষণের মধ্যে গান ছাড়া আর কিছু মনে রইলো না তুয়ার। অপূর্ব কণ্ঠের মাধুর্য মিষ্টি মায়ায় ছড়িয়ে পড়লো বনে, বিস্তীর্ণ নদীর মোহনায়। আশেপাশে ঘুর ঘুর করছিল যে জন্তুগুলো সেই গানে মোহাবিষ্ট হয়ে স্থির হয়ে গেল তারা। পাথরের ফাঁকে সাপের হিসহিসানিও স্তব্ধ হলো।

অনেকক্ষণ পর গান যখন শেষ হলো, হিংস্র জন্তুগুলো নীরবে ঘুরে চলে গেল বনের ভেতর, অথবা নদীর গভীরে। কেবল সাপ যেখানে ছিল সেখানেই ঘুমিয়ে গেল কুণ্ডলী পাকিয়ে। চারদিকে অখণ্ড নীরবতা।

তুয়া আর আসতি শুয়ে পড়লেন আবার। এবং শুতে না শুতেই ঘুম। পরদিন সূর্য বেশ খানিকটা ওপরে উঠে আসার আগে সে-ঘুম ভাঙলো না।

ঘুম থেকে জেগে চারপাশ ঘুরে দেখতে লাগলো ওরা। বনের প্রান্তে এবং মোহনার তীরে বালিতে রাতের সব জন্তুর পায়ের ছাপ। একটা ছাপ অনুসরণ করে নদীর তীরে গেল দুজন। হাত-মুখ ধুয়ে পানি খেয়ে তৃষ্ণা মেটালো। ফিরে এসে আসতির ঝুড়ি থেকে খাবার বের করে খেয়ে নেয়ার পর তাকালো একজন আরেকজনের দিকে। এবার?

'চলো, দাইমা, হাঁটতে শুরু করি,' বললো তুয়া। 'নদীতীরে এমন কাদা আর খাগড়া যে ওখান দিয়ে হাঁটা যাবে না। যেতে হবে বনের ভেতর দিয়ে। তারপর দেবতারা যেখানে নিয়ে যান।'

মাথা ঝাঁকালেন আসতি। উটের পশমের পোশাক পরা কৃষক রমণীদের মত ঝুড়ি মাথায় নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন দুজন। বীণাটা রইলো তুয়ার পিঠে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা বনের ভেতর দিয়ে হেঁটে চললো ওরা বড় বড় গাছের ফাঁকে ফাঁকে পথ করে নিয়ে। চলেছে দক্ষিণ দিকে। মাথার ওপর গাছের ডালে ডালে কিচির মিচির করছে বিরাট বিরাট সব বানর আর অন্যান্য প্রজাতির বনমানুষ। একটু পর পরই দেখা হচ্ছে কোন না কোন হিংস্র শ্বাপদের সাথে। ওদের বিরক্ত না করে সেগুলো হারিয়ে যাচ্ছে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর। দুপুর নাগাদ উঁচু হয়ে উঠতে লাগলো মাটি, গাছপালা ছোট হয়ে ও সংখ্যায় কমে আসতে লাগলো। অবশেষে বালুময় এক মরুভূমির প্রান্তে পৌঁছুলো ওরা। আরও কিছুদূর হাঁটার পর ছোট এক মরূদ্যান। পানি পাওয়া গেল সেখানে। পানি আর সঙ্গের খাবার খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিলো ওরা।

ঘুমের ভেতর একটা ডাক শুনে চমকে চোখ মেললো তুয়া। অদ্ভুত এক লোক কাঁটাময় এক লাঠিতে ভর দিয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। অনেক বয়স লোকটার। লম্বা শাদা চুল তার কাঁধ ছাড়িয়েছে। ধবধবে শাদা দাড়ি নেমেছে বুক পর্যন্ত। এক সময় খুবই লম্বা ছিল বৃদ্ধ। বয়সের ভারে এখন ন্যুব্জ। শীর্ণ দেহের হাড়গুলো যেন চামড়া ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কালো চোখদুটোয় অনুভূতিহীন দৃষ্টি, বোঝা কষ্টকর সেই চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে কিনা। রোদে পুড়ে প্রায় কাল হয়ে যাওয়া মুখটায় শত শত বলিরেখা। তবে দেখে বোঝা যায়, এক সময় অসম্ভব সুন্দর আর কোমল ছিল এ-মুখ।

ফারাওয়ের মারা যাওয়ার পরের মুখটা মনে পড়ে গেল তুয়ার।

বাবা বলেই তাকে ডাকার ইচ্ছে হলো। উঠে বসে বললো, 'বাবা! কে আপনি? কী চান?'

'মা, মরুভূমিতে আমার আবাস, এসেছি সেখান থেকেই,' ভরাট গলায় মিষ্টি করে বললেন বৃদ্ধ। 'আমার সমসাময়িক সবার চাইতে, এমনকি তাদের পিতা-পিতামহদের চাইতেও বেশিদিন আমি বেঁচে আছি। তাই যারা কখনও বদলায় না সেই মরুভূমি আর অরণ্যই এখন আমার একমাত্র বন্ধু। একমাত্র ওরাই জানে ছেলেবেলায় আমি কেমন ছিলাম। দয়া করো। বড় দরিদ্র আমি। তিনদিন পেটে কিছু পড়েনি। তোমাদের সঙ্গে যে মাংস আছে তার গন্ধ আমাকে টেনে এনেছে। মা, বড় ক্ষুধা, আমাকে দাও ঐ মাংস।'

'এ-মাংস আপনারই, ও–'

'আমার নাম কেফার।'

'কেফার! কেফার!' উচ্চারণ করলো তুয়া। বিশেষ এক ধরনের গুবরে পোকা কেফার। মিশরীয়দের কাছে অনন্তের প্রতীক হিসেবে পরিচিত এই পোকার নামে ভিক্ষুকের নাম দেখে আশ্চর্য হলো সে। ঝুড়িতে যে খাবার অবশিষ্ট ছিল সবটা বৃদ্ধের হাতে তুলে দিয়ে বললো, খান।'

কেফার খাবারটুকু নিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন আশীর্বাদ প্রার্থনার ভঙ্গিতে। তাপর বালির ওপর বসে পড়ে খেতে শুরু করলেন বুভুক্ষের মত।

'রানী, সব খেয়ে ফেলবে,' নিচু স্বরে বললেন আসতি, 'তারপর এই মরুভূমিতে আমাদের না খেয়ে থাকতে হবে।' আরও একটা পিঠায় কামড় বসাতে দেখে আসতি যোগ করলেন, 'মানুষ নয়, পঙ্গপাল!'

'উঁহু, অতিথি,' বললো তুয়া। 'যা পারে খাক।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন আসতি। তারপর আবার হা-হুতাশ শুরু করলেন।

'থামো, দাইমা, বলেছি তো, উনি আমাদের অতিথি। অতিথি-সেবার নিয়ম ভাঙা যাবে না।'

'কিন্তু অতিথি-সেবার নিয়ম মানতে গিয়ে তো আমরা না খেয়ে মরবো।'

'তা-ও ভাল, দাইমা। অন্তত এই গরিব মানুষটা পেট পুরে খেতে তো পারছেন। আমাদের জন্যে আছেন পিতা আমেন।' চোখ ছল ছল করে উঠলো তুয়ার। আসতি যা বলেছেন তা যে কতটা সত্যি তা যে

সে জানে না তা তো নয়। যা খাবার ছিল, হিসেব করে চললে তা দিয়ে দুদিন বা তারও বেশি চলে যেত। এখন একটুও অবশিষ্ট নেই। কোথাও থেকে সাহায্য না পাওয়া গেলে শিগগিরই দুর্বল হয়ে মারা পড়বে ওরা। কিন্তু এই মরুভূমিতে সাহায্য আসবে কোত্থেকে?

কেফারের খাওয়া শেষ। যেন অনন্তকাল তিনি না খেয়ে ছিলেন। শেষ খেজুরটাও মুখে পুরে ঝুড়িটা তুয়ার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ধন্যবাদ, মা, মিশরের রানীও বোধহয় এত তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়াতে পারত না। বহুদিন শূন্য ছিলাম। আবার পূর্ণ হয়েছি। প্রতিদানে দেওয়ার মত কিছু তো আমার নেই, দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করি, তোমাকেও যেন পূর্ণ করেন, কোনদিন যেন টের না পাও খাওয়ার কষ্ট কাকে বলে।'

এবার আর নিজেকে সামলাতে পারলো না তুয়া। বড় এক ফোঁটা অশ্রু তার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়লো কেফারের কর্কশ হাতে। 'খেয়ে শান্তি পেয়েছেন এজন্যে আমি আনন্দিত, কিন্তু ঠাট্টা করবেন না আমাদের সাথে। আমাদের কাছে আর কোন খাবার নেই, শিগগিরই আমরা না খেয়ে মরবো।'

'কী বলছো, মা? তোমাদের সব খাবার এই ভিখিরিকে খাইয়ে দিয়েছ? এজন্যেই কাঁদছ তুমি?'

'হ্যাঁ, বাবা, ক্ষমা করবেন কথাটা বলতে হলো বলে,' জবাব দিলো তুয়া। 'খিদে কাকে বলে ক'দিন আগেই টের পেয়েছি তো, তাই চোখে জল এসে গেল। চল, আসতি, গায়ে শক্তি থাকতে থাকতেই রওনা হয়ে যাই।'

আসতির নাম শুনেই চোখ তুলে তাকালেন কেফার। তুয়ার দিকে ফিরে বললেন, 'মা, তোমার চেহারা যেমন সুন্দর, হৃদয়টাও তেমনি বিরাট, নইলে এমন করে আমাকে খাওয়াতে পারতে না। কিন্তু তবু বলি, একটা জিনিসের অভাব এখনও রয়ে গেছে তোমার, তা হলো, দেবতাদের উপর অবিচল আস্থা। সিংহ, গণ্ডার, হায়েনার মত হিংস্র জন্তু-জানোয়ারপূর্ণ জঙ্গল যারা নিরাপদে পার হয়ে এসেছে তাদের মনে দেবতাদের প্রতি আস্থার অভাব থাকা উচিৎ নয়। বলো তো, তোমরা কোত্থেকে কেমন করে এলে?'

'আমরা মিশরের সম্ভ্রান্ত মহিলা,' জবাব দিলেন আসতি, '–অন্তত এই তরুণী। আমি ওর দাইমা। নীলনদের তীরে বেড়াতে গিয়েছিলাম আমরা, সেখান থেকে ফিনিশীয় জলদস্যুরা ধরে জাহাজে করে নিয়ে এসেছে। কোন পথে এনেছে তা বুঝতে পারিনি। পানির জন্য ঐ নদীর

তীরে থেমেছিল ওরা, রাতে আমরা পালিয়ে আসি। সেই হিসেবে পালিয়ে আসা দাস বলতে পারেন আমাদের।'

'আ-হা!' বললেন কেফার, 'ঐ জলদস্যুরা নিশ্চয়ই এখন হা-হুতাশ করছে। কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না ওরা তোমাদের পিছু নিলো না কেন। আমি ভেবেছিলাম আমাকে স্বপ্নে যাদের কথা বলা হয়েছে তোমরা তারা। কাল রাতে বালির ওপর শুয়ে যখন ঘুমাচ্ছিলাম, পাতালপুরীর এক আত্মা আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন আসতি নামের এক মহিলা আর তার সঙ্গিনীকে–কী যেন তার নাম, এখন মনে করতে পারছি না–যেন খুঁজে বের করি। সেই আত্মা তাঁর পরিচয় দিয়েছিলেন মার্মিস বলে।'

অস্ফুট একটা চিৎকার করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন আসতি। কেফারের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এখন বুঝতে পারছি, যে ভিক্ষুকের কথা বলা হয়েছিল, আপনিই তিনি।'

'হয়তো। এখন বলুন তো, আসতি, আপনি এবং আপনার সঙ্গিনী–কী যেন নাম তার?'

'নেফারতি,' চট করে জবাব দিলেন আসতি।

'নেফারতি! উঁহু, সেই আত্মা যে নাম বলেছিলেন তা আর যা-ই হোক নেফারতি নয়– অবশ্য নামটা শুরু হয়েছে নে ধ্বনি দিয়েই। যা হোক, আপনি আপনার সঙ্গিনী নেফারতিকে নিয়ে বদমাশ জলদস্যুদের হাত থেকে পালিয়ে আসার সময় বেশ কিছু জিনিস সঙ্গে নিয়ে আসতে পেরেছেন–যেমন, সুন্দর দামি একটা বীণা, প্রচুর খাবার, আর... আচ্ছা, ঐ ঝুড়িতে কী আছে?'

'মুক্তা,' জবাব দিলো তুয়া।

'...আর এক ঝুড়ি ভর্তি মুক্তা! দেখতে পারি মুক্তাগুলো? ভয় নেই, আমি কেড়ে নেব না। যারা খাবার খাইয়েছে তাদের সম্পদ লুট করে নেয়া মরুভূমির রীতি নয়।'

'মোটেই আমি ভাবিনি আপনি লুট করবেন,' বললো তুয়া। 'আপনি যদি দস্যু গোত্রের লোক হতেন তাহলে আপনার পোশাক আরেকটু ভাল আর আপনি কম ক্ষুধার্ত হতেন। বাবা কেফার, আমার মনে হচ্ছিল আপনি চোখে প্রায় দেখেন না, তাই হয়তো মুক্তা না পাথরের নুড়ি তা বুঝবেন না।'

'অনুভব করবার ক্ষমতা এখনও আমাকে ছেড়ে যায়নি, মা নেফারতি,' মৃদু হেসে বললেন কেফার।

এরপর আর কথা চলে না, তুয়া ঝুড়িটা এগিয়ে দিলো বৃদ্ধের দিকে। কেফার ঝুড়ির মুখ খুলে একটার পর একটা মুক্তার মালা বের করে হাত দিয়ে ছুঁয়ে, এবং গন্ধ শুঁকে দেখতে লাগলেন। বড়গুলো জিভে ছুঁইয়ে পরখ করলেন। সবগুলো মুক্তা নাড়াচাড়া করার পর সেগুলো ঝুড়ির ভেতর ভরে রেখে কেফার বললেন:

'খুবই আশ্চর্য লাগছে আমার, আসতি, এত মুক্তা নিয়ে পালিয়েছেন আপনারা–পুরো একটা রাজ্য কিনে ফেলা যায় এ-দিয়ে, অথচ জলদস্যুরা এগুলো ফিরে পাবার জন্য আপনাদের পিছু নেয়নি!'

'মুক্তা তো আর খাওয়া যায় না,' বললেন আসতি।

'কিন্তু মুক্তা দিয়ে খাবার ছাড়াও বহু প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা যায়।'

'মরুভূমির ভেতরে নয়,' বললেন আসতি।

'তা ঠিক। কিন্তু এমনও তো হতে পারে মরুভূমির ভেতর কোন নগর আছে, আর তা এখান থেকে খুব দূরে নয়।'

'সেই নগরের নাম কি নাপাতা?' আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো তুয়া।

'নাপাতা? উঁহু। তবে ঐ নামের এক নগরের কথা আমি শুনেছি–ওরা বলতো স্বর্ণ-নগরী। যৌবনে একবার গেছিও ওখানে, একশো বছরেরও আগের কথা সেটা।'

'একশো বছর আগে! কোন দিক দিয়ে যেতে হয় মনে আছে?'

'মোটামুটি আছে। কিন্তু পায়ে হেঁটে তো কম পক্ষে একবছর লেগে যাবে সেখানে। মাঝখানে পার হতে হবে বিশাল মরুভূমি আর বর্বর উপজাতীয়দের এলাকা। খুব কম লোকই শেষ পর্যন্ত ঐ নগরে পৌঁছুতে পারে।'

'আমি যাব সেখানে, বাবা! পৌঁছাতে পারলে ভাল, নইলে মরে যাব পথে।'

'তা হয়তো পারবে, মা নেফারতি, হয়তো পারবে, কিন্তু এখনই নয়। তিনমাস পরে রওনা হয়ো। এর মধ্যে বৃষ্টি হলে মরুভূমির কুয়াগুলো সব পানিতে ভরে যাবে। সে-পর্যন্ত আমি যে শহরের কথা বলছিলাম সেখানে গিয়ে থাকো। তোমার কাছে বীণা আছে। ঐ শহরের লোকেরা গান-বাজনা খুব পছন্দ করে। মুক্তাও ওদের খুব প্রিয়। তাই আমার পরামর্শ, ঐ শহরে গিয়ে তোমরা বাস করতে থাক, প্রস্তুতি নাও দীর্ঘ যাত্রার। তারপর সময় হলে রওনা হয়ে যাবে। দাইমা আসতি মুক্তোর ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচয় দেবে, আর তুমি তার মেয়ে

গায়িকা। কী বলো?'

'এই মরুভূমি ছাড়া যেকোন জায়গায় থাকার সুযোগ আমি খুশি হয়েই গ্রহণ করবো,' বললো তুয়া। 'পথ জানা থাকলে নিয়ে চলুন সেখানে।'

'হ্যাঁ, পথ চিনি। এসো আমার সাথে। তোমাদের খাবারের দাম শোধ করি,' বলে লাঠি হাতে লম্বা পায়ে হাঁটতে শুরু করলেন কেফার।

'এই কেফার বুড়োমানুষ হলেও হাঁটে কিন্তু দারুণ গতিতে,' নিচুস্বরে বললো তুয়া। 'প্রথমে দেখে মনে হয়েছিল নড়তেও পারে কিনা।'

'মানুষ কী বলছো?' বললেন আসতি। 'ও আত্মা। ভাল না মন্দ তা আমি বলতে পারব না, ভিখিরির বেশে হাজির হয়েছে আমাদের সামনে। কোন মানুষের পক্ষে কি একবারে অত খাবার খাওয়া সম্ভব? কোন মানুষ কি একশো বছর আগে যে নগরে গেছিল সেখানকার কথা বলতে পারে? সেই জাহাজের দাঁড়ি, মাঝি, কাপ্তেনের মত ও-ও আত্মা।'

'হলোই বা,' বললো তুয়া। 'এ-পর্যন্ত আত্মারা তো আমাদের ভাল ছাড়া খারাপ করেনি।'

'শেষ পর্যন্ত কী হয় সেটাই প্রশ্ন,' বললেন আসতি। 'আপাতত ওর পেছন পেছন যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই।'

সারাদিন হাঁটার পর ক্লান্তির শেষ সীমায় যখন পৌঁছে গেছে সে-সময় বালি আর পাথরের একটা টিলার ওপর পৌঁছুলো ওরা। সেখান থেকে দেখা যায় সামান্য দূরে দেয়াল ঘেরা বিরাট এক নগরী। তার চারপাশে সবুজ উর্বর ভূমি। কেফার থামলেন না, ঢাল বেয়ে নেমে চললেন সোজা নগরের দিকে। তার খানিকটা পেছনে তুয়া আর আসতি। অবশেষে এক ফসল ক্ষেতের পাশে একগুচ্ছ গাছের কাছে পৌঁছে থামলেন কেফার। দুই নারী কাছে পৌঁছার পর আবার হাঁটতে শুরু করলেন গাছপালার ভেতর দিয়ে। কিছুদূর যাওয়ার পর একটা ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে পড়লেন আবার।

'এখানে অপেক্ষা করো তোমরা,' বললেন কেফার। 'মুখের ওপর ঘোমটা টেনে দাও। কেউ এলে বোলো, পথিক, বসে বিশ্রাম নিচ্ছো। সামনে ঐ শহরের নাম টাট। যদি মনে চায়, ছোট একটা মুক্তা কোন একটা মালা থেকে খুলে দাও। আমি শহরে গিয়ে ওটা বিক্রি করে তোমাদের জন্যে খাবার আর থকার ব্যবস্থা করে আসি।'

'পুরো একটা মালা নিয়ে যান না,' বললো তুয়া।

'না, মা, একটাই যথেষ্ট। মুক্তো এখানে খুবই দামি জিনিস।'

একটা মুক্তা দিয়ে দিলো তুয়া– বলা ভাল বৃদ্ধ নিজেই নিয়ে নিলেন রেশমি সুতোর মালা খুলে। তারপর মালাটা এমন সুন্দর করে আবার বেঁধে রাখলেন যে বুঝতে অসুবিধা হলো না চোখে ভালই দেখতে পান কেফার।

মুক্তা নিয়ে চলে গেলেন তিনি। একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসলো তুয়া। ভয়ানক ক্লান্ত সে। বসতে না বসেতেই ঝিমাতে শুরু করলো। যখন ঝিমানি ছুটলো তখন সূর্য ডুবে গেছে। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ভিখিরি কেফার। সঙ্গে দুটি গাধা। তাদের লাগাম ধরে আছে দুই কৃষ্ণাঙ্গ লোক।

'চড়ে বসো,' বললেন কেফার। 'শহরে তোমাদের থাকার ব্যবস্থা করে এসেছি।'

গাধায় চেপে তুয়া আর আসতি অল্প সময়েই পৌঁছে গেলেন নগরীর বন্ধ ফটকের কাছে। কেফারের কথায় রক্ষীরা ফটক খুলে দিলো। নগরীর রাস্তা ধরে কিছুটা যাওয়ার পর বাগান ঘেরা চমৎকার এক বাড়িতে পৌঁছুলেন ওঁরা। ঘরে সাজানো সুদৃশ্য আসবাবপত্র। খাবার ঘরে টেবিলে রয়েছে সুস্বাদু সব খাবার। কোনমতে হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসে গেলেন ওঁরা। কেফারের নির্দেশে এক পরিচারিকা শোয়ার ঘর দেখিয়ে দিলো। শুয়ে পড়লেন দুজন।

১৫

তুয়া এবং টাট-এর রাজা

পরদিন সকাল। হাতের কাছেই পরিষ্কার পরিচ্ছদ সাজানো। সেগুলো পরে খেয়ে নিলেন আসতি আর তুয়া। তারপর মুখ তুলতেই দেখলেন সামনে দাঁড়িয়ে মরু-ভিখিরি কেফার। কখন ঢুকেছেন তিনি টেরই পায়নি ওরা, কোন শব্দও শোনেনি।

'একেবারে নিঃশব্দে এসেছেন আপনি,' কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে বললেন আসতি। 'দ্বিতীয় সত্তা ছাড়া আর কারো পক্ষে এমন নিঃশব্দে চলা সম্ভব নয়। আর আপনার ছায়াই বা কোথায়?' জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ঘরে। সেই রোদেই দাঁড়িয়ে আছেন কেফার, কিন্তু কোন ছায়া পড়েনি।

'ভুলে গেছিলাম,' গম্ভীর গলায় বললেন কেফার। 'আমার মতো

গরিবের পক্ষে কি সবসময় ছায়া নিয়ে ঘোরা সম্ভব? যাক, এই দেখুন এসে গেছে ছায়া। কিন্তু, দ্বিতীয় সত্তা না কী যেন বলছিলেন? এ-বিষয়ে যাকে জ্ঞান দেওয়া হয়নি তার পক্ষে তো তা জানা সম্ভব নয়। আপনার নামে নাম এমন এক মিশরীয় ভদ্রমহিলার কথা আমি শুনেছি, যিনি দ্বিতীয় সত্তাদের দেখতেই শুধু পান না, জীবিত মানুষের শরীর থেকে তাদের ডেকে এনে জাগতিক কাজে নিয়োগ করতেও পারেন। আরও শুনেছি, এখন যিনি মিশর শাসন করেন সেই রানীর এমনি এক দ্বিতীয় সত্তা বা কা আছে, যে তাঁর জায়গা নিয়ে তাঁর সব কাজ করতে পারে, কেউ টের পায় না তিনি আসলে রানী নন। আমেন নাকি জন্ম-মুহূর্তে রানীকে দিয়েছিলেন এই কা। বন্ধু আসতি, বলুন তো, যখন মিশরে ছিলেন এমন কিছু কি শুনেছেন?'

আসতির চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন কেফার। আসতিও তাকিয়ে আছেন বৃদ্ধের দিকে। অবশেষে কেফার এমন এক ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন যে আপনিই মুখ নিচু হয়ে গেল আসতির। এদিকে তুয়া তার দাইমা আর কেফারের আলোচনায় শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। অচেনা অজানা এই বুড়ো যদি সত্য জেনে যায় তাহলে কী হবে বুঝতে পারছে না।

'যেভাবেই আপনি আসুন না কেন, ছায়াসহ অথবা ছায়া ছাড়া, সব সময়ই আপনি আমাদের কাছে সমাদর পাবেন,' প্রসঙ্গ বদলানোর জন্যে বললো তুয়া। 'আপনার কাছে কৃতজ্ঞ আমরা– এই বাসা খুঁজে দিয়েছেন, দাসীর ব্যবস্থা করেছেন, খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু, আপনি আর খাবেন না?'

'না, মা,' মৃদু হেসে বললেন কেফার। 'কাল তোমরা আন্দাজ করতে পেরেছ বোধহয়, আমি মাংস খাই খুব কম–নিয়ম করে তিনদিনে একবার। ওতেই আমার হয়ে যায়। জীবন বড় সংক্ষিপ্ত, খেয়ে সময় নষ্ট করতে চাই না।'

'একশো বছর আগে যার যৌবনের শুরু তিনি যদি এমন ভাবেন তাহলে আমাদের কী হবে?' বললো তুয়া। 'কিন্তু, বাবা কেফার, এই টাট নগরীতে আমরা কী করবো?'

'সেটা তো কালই বলেছি, মা। আসতি মুক্তা বিক্রি করবেন, আর তুমি করবে গান। তবে মনে রেখো, সবসময় তুমি পর্দার আড়ালে থাকবে। যতদিন এই টাট নগরে আছ, তোমার রূপ কারো দেখা চলবে না–এখানকার যে শাসক তার তো নয়ই। এখন আরও দুটো মুক্তা দাও আমাকে, তোমাদের বাদবাকি দরকারি জিনিসপত্র কিনে দিয়ে যাই।

তারপর অনেকদিন আর হয়তো আমার দেখা পাবে না। বিপদ যদি আসে যেকোন একটা জানালার সামনে গিয়ে তোমার বীণার তারে টোকা দিয়ে তিনবার *কেফার* বলে ডেকো। সেই ডাক শুনে কেউ না কেউ আমার কাছে খবর পৌঁছে দেবে। তখন আমি চলে আসবো সাহায্য করতে।'

'ধন্যবাদ, বাবা, মনে থাকবে। কিন্তু আপনার মত এমন–' কথা শেষ না করে থেমে গেল তুয়া।

'এমন বুড়ো, দীন-হীন মানুষ কীভাবে সাহায্য করবে, তা-ই তো, মা নেফারতি? শুধু বাইরেটা দেখে বিচার কোরো না। উৎকৃষ্ট সুরা অনেক সময় সাধারণ মাটির পাত্রে থাকে। চকমকি পাথরে লুকানো স্ফুলিঙ্গ একটা শহর ধ্বংস করে দিতে পারে।'

'একইভাবে নিজের ছায়া গিলে ফেলতে পারে যে ভবঘুরে সে অন্য ভবঘুরেকে সাহায্যও করতে পারে,' বললো তুয়া। 'বুঝতে পেরেছি, বাবা। বয়স কম হলেও এরই মধ্যে এত বিচিত্র আর অলৌকিক অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে!'

'সেই ফিনিশীয় জলদস্যুদের হাতে বন্দী হওয়ার মত?' বললেন কেফার। 'আসি তাহলে, মা নেফারতি। তোমাদের জিনিসগুলো কিনে দিয়েই আপাতত কিছুদিনের জন্যে মরুভূমিতে হারিয়ে যাব। আমি যা বলেছি মনে রেখো, পাহাড়ে বৃষ্টি না ঝরা পর্যন্ত এ-শহর ছেড়ে যেও না। বিদায়, আসতি, আবার আমাদের দেখা হবে। তখন দ্বিতীয় সত্তা নিয়ে আরও আলাপ করা যাবে। ততদিন মিশরের মহাদেবতা–কী যেন তাঁর নাম? আমেন, তাই না? তিনি তোমাদের সহায় থাকুন।'

চলে গেলেন কেফার। সদর দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ পাওয়ার পর তুয়া বললো, 'অদ্ভুত মানুষ!'

'মানুষ?' বললেন আসতি। 'তোমাকে তো বলেছি, উনি মানুষ নন। মানুষ কি কখনও পোশাকের মত নিজের ছায়াকে ভাঁজ খুলে মেলে দিতে পারে? উনি হয় দেবতা নয়তো প্রেতাত্মা, ভিক্ষুকের বেশ ধরে আছেন।'

'প্রেত হোন আর মানুষ হোন, বিপদের সময় আমাদের সাহায্য করেছেন, এটাই বড় কথা, দাইমা।'

ঘণ্টা খানেক পর ওঁরা দেখলেন, একের পর এক কুলি আসছে বাক্স-পেঁটরা নিয়ে। খোলার পর সেগুলো থেকে বেরোলো সোনালী-রূপালী জরির কাজ করা রেশমি কাপড়, দামি চামড়ার কারুকাজ করা জিনিসপত্র, অমন কারুকাজ দেখা যায় কেবল আরব দেশে; কালো

পাথরের বোয়েম ভর্তি মলম, সিরিয়ায় তৈরি পিতলের আর সাইপ্রাসে তৈরি তামার বাসন কোসন এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য সব জিনিস। সবই খুব দামী।

সামনের বড় ঘরটার আলমারী আর গালিচার ওপর যেখানে যেটা মানায়, সাজিয়ে দিয়ে বিদায় নিলো কুলিরা। যাওয়ার সময় কোন পারিশ্রমিক চাইলো না। তারপর দারুণ এক শাদা ঘোড়ায় চেপে এলো এক লোক। ঘোড়া থেকে নেমে কাঠের জাফরির আড়ালে থাকা তুয়া আর আসতিকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানালো। টেবিলের ওপর কিছু একটা লেখা রেখে চলে গেল ঘোড়ায় চেপে। আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে লেখাটা তুলে নিলেন আসতি। মিশরীয় হরফে একই ভাষায় লেখা একটা দলিল। এই বাড়ি আর বাগান আর যেসব দামি জিনিস কুলিরা পৌঁছে দিয়ে গেছে, সবকিছুর ওপর তুয়া আর আসতিকে যৌথ অধিকার দেয়া হয়েছে দলিলে। নিচে লেখা–'আমি যাযাবর কেফার তিনটি মুক্তা এবং ভরপেট মাংস ও খেজুরাহারের বিনিময়ে উপরোক্ত বাড়ি, জমি এবং জিনিসপত্র হস্তান্তর করিলাম।'

এর নিচে গালার ওপর কেফারের সীলমোহর– চমৎকার করে খোদাই করা একটা গুবরে পোকা সামনের দু'পা দিয়ে সূর্যের প্রতীক ধরে আছে।

'শতচ্ছিন্ন ভবঘুরের তুলনায় সীলমোহরটা একটু বেশি জমকালো,' বললো তুয়া।

আসতি জবাবে বললেন, 'এই শহরে ছোট মুক্তারই এত দাম, বড়গুলোর দাম না জানি কেমন! ঠিক আছে ব্যবসা শুরু করে দেয়া যাক। অনেকদিন থাকতে হবে এখানে। মুক্তা আর এসব দামী জিনিসপত্র খেয়ে তো আর থাকা যাবে না।'

টাট নগরীতে ব্যবসা জমিয়ে বসেছে মিশরের রানী, আমেনের নক্ষত্র নেতের-তুয়া আর তার দাইমা, যাদুর রানী আসতি। সকালে এক ঘণ্টা আর বিকেলে এক ঘণ্টা আসতি ঘোমটায় মুখ ঢেকে বাড়ির সামনে মুক্তা বিক্রি করতে বসেন। সঙ্গে থাকে এক পরিচারিকা। মুক্তার বিনিময়ে নেন সোনার গুঁড়া অথবা যেকোন মূল্যবান বস্তু, যার বিনিময়ে অন্য জিনিস কেনা যায়। এক ঘণ্টা মুক্তা বিক্রির পর কাঠের জাফরি আর রেশমি পর্দার পিছনে বসে বীণা সহযোগে গান ধরে তুয়া। সকালে কি বিকেলে গান শুরু হতেই বাড়ির সামনে লোক জড় হতে শুরু করে। এক সময় চওড়া রাস্তার পুরোটা ভরে গিয়ে বন্ধ হয়ে যায় চলাচল।

এইভাবে চলে গেল সপ্তাহের পর সপ্তাহ। শুধু ছোট মুক্তা বিক্রি করেই ওরা ধনী হয়ে উঠতে লাগলো, বড়গুলোর কথা তখনও প্রকাশই করেনি। অল্প দিনেই ওদের কাছে এত সোনার গুঁড়া আর অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী জমা হলো যে ওরা বুঝে উঠতে পারে না সে-সব দিয়ে কী করবে। টাট নগরীকে ওদের ভালই মনে হচ্ছে। কোন অশান্তি নেই। ওদের সম্পদ লুটে নেয়ার চেষ্টা কেউ করেনি। এর একটা কারণ হতে পারে, শুরু থেকেই একটা জনশ্রুতি চালু হয়েছে যে এই বিদেশিনীরা কোন এক দেবতার তত্ত্বাবধানে আছে। কী করে কেন এই কথা চালু হয়েছে তা কেউ বলতে পারে না। তবে এর কারণে বিদেশ বিভূঁইয়ে দুই অরক্ষিত নারী নিরাপদেই আছে।

ওরা যখন টাট-এ আসে সে-সময় সেখানকার রাজা, তাঁর নাম জ্যানিস, সাগরতীরের অন্য এক দেশের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল। কয়েক সপ্তাহ পর যুদ্ধজয় করে ফিরে এলো রাজা জ্যানিস। বিজয় উৎসবের জন্য তৈরি হতে লাগলো টাট। এরই মধ্যে রাজার কানে পৌঁছুলো দুই বিদেশিনী মুক্তা ব্যবসায়ীর কথা। বিজয় উৎসবকে আরও অর্থপূর্ণ করার জন্য রাজা নিজেই মুক্তা সংগ্রহে বেরোলেন। ছদ্মবেশে বিদেশিনীদের বাড়ির সামনে পৌঁছে দেখলেন আসতির সেদিন সকালের বেচা-বিক্রি শেষ, গান শুরু করেছে তুয়া। তার অপূর্ব কণ্ঠের গান শুনে বিমোহিত হয়ে গেল রাজা। মুক্তার কথা ভুলে গান শুনতে লাগলো।

গান শেষে ঘোমটায় মুখ ঢাকা আসতি উঠে দাঁড়িয়ে শ্রোতাদের বিদায় অভিবাদন জানালেন। ভৃত্যদের বললেন দোকানের ঝাঁপ ফেলে বাক্স পেঁটরা গোছাতে।

'কিন্তু আমি তো মুক্তা কিনতে এসেছি,' বললো রাজা।

'বিকেলে আসতে হবে,' বললেন আসতি। 'আপনি যদি এখানকার রাজাও হন নির্ধারিত সময়ের বাইরে আমি বিক্রি করবো না।'

'তুমি বড় লম্বা কথা বলো, মহিলা,' ঝাঁঝের সাথে বললো জ্যানিস।

'লম্বা হোক আর খাটোই হোক, আমার যা বলার বলেছি,' জবাব দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলেন আসতি।

বিকেলে আবার আসতে হলো রাজাকে, যতটা না মুক্তা কিনতে তারচেয়ে বেশি সেই মিষ্টি কণ্ঠের গান শোনার জন্যে। গানের সময় তখনও হয়নি, তাই মুক্তা দেখতে চাইলো জ্যানিস। দেখালেন আসতি। কিন্তু বেশি ছোট, এই কথা বলে সেগুলো সরিয়ে রাখলো রাজা।

আরেকটু বড় কয়েকটা মুক্তা বের করলেন আসতি। এগুলোও পছন্দ হলো না রাজার। তখন সবচেয়ে বড় মুক্তাগুলো থেকে দুটো বের করে আনলেন আসতি। একেবারে নিখুঁত আকার, বুড়ো আঙুলের নখের সমান বড়। মুক্তা দুটো দেখেই চক চক করে উঠলো জ্যানিসের চোখ। এত বড় মুক্তা আগে কখনও দেখেনি সে। দাম জিজ্ঞেস করলো। আসতি তাচ্ছিল্যের সাথে বললেন, সে যা দিতে চাইবে বা পারবে তার চাইতে অনেক বেশি, কারণ এত বড় আর সুন্দর মুক্তা সারা পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। তারপর ঐ দুটো মুক্তার জন্যে যে পরিমাণ সোনার কথা আসতি বললেন, শুনেই পিছিয়ে গেল জ্যানিস। নতুন রাজ্য জয় করে যে সম্পদ সে দখল করে এনেছে তার এক চতুর্থাংশ দাবি করেছেন আসতি।

'আপনি ঠাট্টা করছেন,' বললো জ্যানিস। 'কম কত বলুন।'

'ঠাট্টা করছি না, জনাব। কম হবে না।' মুক্তা দুটো আগের জায়গায় ঢুকিয়ে রাখলেন আসতি।

ভয়ানক ক্রোধে জ্যানিস হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, 'জান, আমি টাটের রাজা, ইচ্ছে করলে দাম না দিয়েই ওগুলো নিয়ে নিতে পারি?'

'তাই নাকি? আমি ধারণাই করতে পারিনি আপনি রাজা। যাহোক, যদি জোর করে নিয়ে নেন তাহলে আপনি হবেন চোরেদেরও রাজা।'

আশপাশে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা হেসে উঠলো এই কথা শুনে। রাজা আর কথা না বাড়িয়ে সত্যিই ঠাট্টা করছিল এমন ভাব করে যোগ দিলো তাদের হাসির সঙ্গে। তারপর আবার শুরু হলো দরাদরি। তা শেষ হওয়ার আগেই নির্দিষ্ট সময়ে পর্দার আড়ালে গান শুরু হলো তুয়ার।

'হয়েছে,' বললো রাজা, 'কাল দাম পাবে। এখন আমি শুনবো গান, কোন দামেই যা কেনা যাবে না।'

মোহাবিষ্টের মত শুনতে লাগলো রাজা। পা পা করে এগিয়ে যাচ্ছে যে পর্দার আড়াল থেকে গান ভেসে আসছে সেদিকে। আসতি তাঁর জিনিসপত্র গোছানোয় ব্যস্ত থাকায় এটা খেয়াল করেননি। পা পা করে জ্যানিস কাঠের জাফরির একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। জাফরির ওপাশে একটা রেশমি পর্দা, তার ওপাশেই গান করছে তুয়া। তন্ময় হয়ে গান শুনতে শুনতে অন্যমনস্কভাবে নাকি ইচ্ছা করেই, বলা সম্ভব নয়, জাফরিতে হেলান দিলো রাজা। অমনি হালকা কাঠের আলতো করে দাঁড় করিয়ে রাখা জাফরি পড়ে গেল হুড়মুড় করে। ভিড় করে থাকা মানুষজন দেখতে পেলো অনিন্দ্যসুন্দরী তুয়াকে। হাতির দাঁত

আর সোনায় তৈরি বীণায় হাত চলছে। মুখে ঘোমটা নেই। মেঘের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা উজ্জ্বল সূর্য কিরণে চোখ ধাঁধিয়ে গেল যেন সবার। কিছুক্ষণ কারো মুখে কোন কথা যোগালো না। তারপর একজন বলে উঠলো:

'এই নিশ্চয়ই রানী কোন দেশের!'

'না, না, দেবী!' বললো আরেকজন।

ততক্ষণে ভেতরের ঘরে চলে গেছে তুয়া। কিন্তু তার আগেই মুখ হাঁ হয়ে গেছে জ্যানিসের। কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে আসতিকে জিজ্ঞেস করলো, 'কে ও? তোমার দাসী?'

'না, আমার মেয়ে। ওকে এভাবে সবার সামনে প্রকাশ করে খুবই খারাপ কাজ করেছেন আপনি।'

'তাহলে ক্ষতিপূরণ করাটাও আমার দায়িত্ব,' ধীর কণ্ঠে বললো রাজা, 'তোমার এই মেয়েকে আমি আমার রানী করতে চাই। বুঝেছ, মুক্তা কারবারি, আমার রানী। এর জন্যে উপহার হিসেবে তুমি পাবে ঐ দুই মুক্তার জন্যে যা দেব বলেছি আরও সেই পরিমাণ সোনা।'

'অন্য অনেক রাজাও একই ইচ্ছা প্রকাশ করে আরও বেশি দিতে চেয়েছেন। কিন্তু ও তাদের কারো জন্যে যেমন নয় তেমনি আপনার জন্যেও নয়,' রাজার চোখে চোখে তাকিয়ে সরাসরি বললেন আসতি।

চড় মারার ভঙ্গিতে হাত তুলেও কী মনে করে রাজা নামিয়ে নিলো হাতটা। 'অজ্ঞাত কুলশীল এক মেয়ের জন্যে এত ভাল একটা প্রস্তাবের জবাব তুমি এমন খারাপভাবে দিলে! আমিও পাল্টা জবাব দিতে পারতাম, কিন্তু সবাই তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। এ-নিয়ে কাল আবার তোমার সঙ্গে কথা হবে।'

'কথা বলে লাভ–,' শুরু করলেন আসতি, কিন্তু ততক্ষণে চলে গেছে রাজা।

তক্ষুনি তুয়ার খোঁজ করতে গিয়ে তাকে বাগানে পেলেন আসতি। সব কথা বললেন তাকে।

'মরুভূমির কেফারকে ডাকার সময় হয়েছে,' বললো তুয়া। 'মনে হচ্ছে আমরা ফাঁদে পড়েছি। এই জ্যানিসের রানী হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।'

'সে-ক্ষেত্রে আমার মনে হয় আজ রাতেই মরুভূমিতে পালিয়ে যাওয়া ভাল। সেখানেই আমরা খুঁজে নেব কেফারকে। কারণ, রানী, অন্য যারা তোমাকে দেখেছে তাদের কে কী করে বসে ঠিক নেই।'

'কেশ যুবরাজের ভাগ্যে কী ঘটেছে তা আমরা দেখেছি, আবির

কপালে কী ঘটছে তা অনুমান করতে পারছি। আমাকে বিয়ে করার চেষ্টা করলে এই জ্যানিসের ভাগ্যেও তার চেয়ে ভাল কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না। তবু, চলো যাই।'

মাথা ঝাঁকালেন আসতি। তারপর কী মনে হতে ঘরের ভেতর গিয়ে চাকর-বাকরদের কিছু প্রশ্ন করলেন। একটু পরেই ফিরে এসে বললেন, 'লাভ নেই, মা, এর মধ্যেই সৈন্যরা বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। এক কাজের মেয়ে একটু আগে বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, সৈন্যরা তাকে যেতে দেয়নি। বলেছে, রাজার আদেশ, কেউ এ-বাড়ির বাইরে যেতে পারবে না।'

'তাহলে কি কেফার যেমন বলে গেছেন, বীণার তারে টোকা দিয়ে তাঁর নাম ধরে ডাকবো?' জিজ্ঞেস করলো তুয়া।

'এখনই না। এমনিতেই বিপদ কেটে যেতে পারে, বা রাতে সুপরামর্শ আসতে পারে। সেক্ষেত্রে খামোকা ডাকার কারণে কেফার রেগে যেতে পারে। তারচেয়ে চলো খেয়ে নেই।'

খাওয়ার ঘরে গিয়ে বসলো ওরা। হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে মুখ তুলতেই দেখলো দুই খোজা রক্ষীর নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন মহিলা দুদ্দাড় করে ঘরে ঢুকছে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পোশাকের ভেতর থেকে ছোরা বের করলো তুয়া। দুই খোজার মধ্যে বয়স্ক জন আজানু কুর্ণিশ করে বললো:

'আমি নিরস্ত্র, ইচ্ছে হলে মেরে ফেলতে পারেন। কিন্তু তাতে লাভ হবে না, বাইরে আরও অনেকে আছে। শুনুন, আপনার বা আপনার সঙ্গিনীর ক্ষতি করতে আমরা আসিনি এসেছি রাজার ইচ্ছার কথা জানাতে। রাজা চান না আপনার মত রাজকীয় চেহারার রমণী বাজারের ভেতর সাধারণ এক বাড়িতে থাকেন। রাজপ্রাসাদই আপনাদের উপযুক্ত স্থান। তাই তিনি মালপত্রসহ আপনাদের নিয়ে যেতে বলেছেন তাঁর প্রাসাদে। সেখানে তিনি আপনাদের সঙ্গে কথা বলবেন।'

আসতি বললেন, 'ছোরা খাপে ভরে রাখ, মা। চাকর-বাকরদের সাথে কথা বলা মানে সময় নষ্ট করা। চল, যাই। এ-ছাড়া আর উপায় আছে বলে মনে হচ্ছে না।'

বাইরে বেরোনোর পোশাক পরে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে খোজা রক্ষীদের আনা জোড়-পালকিতে উঠে বসলো ওরা। আসতির কাছে রইলো ওদের সব মুক্তা আর সোনা। তুয়ার কাছে বীণাটা। রাতের নির্জন নীরব রাজপথ ধরে পালকি পৌঁছুলো রাজপ্রাসাদে। বহু ধাপ

সিঁড়ি আর অলিপথ পেরিয়ে অবশেষে এলো বিরাট এক সুন্দর কামরায়। রুপোর প্রদীপে সুগন্ধী তেলের আলো জ্বলছে সে-ঘরে। ওরা খেয়াল করলো এই কামরা আর আশপাশের আরও কয়েকটা কামরায় রাজপ্রাসাদের পরিচারিকারা ওদের সব জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছে। গোছগাছ শেষে টেবিলে খাবার এবং মদ সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল পরিচারিকারা। একা ঘরে তুয়া আর আসতি একে অন্যের দিকে তাকালো।

'এবার কি ডাকবো কেফারকে?' জিজ্ঞেস করলো তুয়া। 'ঐ দেখ, কেফার যেমন বলেছিলেন তেমন একটা জানালা।'

'আমার মনে হয় এখনও সময় হয়নি, রানী। আগে দেখে নেই পানি কদ্দূর গড়ায়। তারপর দরকার হলে সাহায্য চাইব।' আসতির কথা শেষ হতে না হতেই ঘরে ঢুকলো রাজা জ্যানিস।

ঘরের মাঝখানে মর্মর পাথরের বড় একটা জলাধার বা চৌবাচ্চা। সম্ভবত সাবেক দিনের রানীদের স্নানের জন্য তৈরি করানো হয়েছিল। তুয়া আর আসতি ঐ জলাধারের একদিকে দাঁড়িয়ে, অন্য দিক দিয়ে ঢুকেছে রাজা। অর্থাৎ তাদের মাঝখানে রয়েছে পানি।

তুয়াকে পরপর তিনবার মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে রাজা বললো, 'আমার ভৃত্যদের কাছে শুনলাম আপনার নাম নেফারতি, মিশরের রমণী। আসল নাম যখন জানা নেই, এ-নামেই চলবে। আমি এসেছি ক্ষমা চাইতে–এই রাতে আপনাদের এই টানা হেঁচড়া করায় নিশ্চয়ই ভাবছেন আপনাদের ওপর ঘোর অন্যায় করা হয়েছে। তবে এ-ও বলি, এটা আমার অজুহাত মাত্র। আমি কিছুতেই আপনাকে আরেকবার না দেখে থাকতে পারছিলাম না। আপনার মুখ একবার দেখার পর আর স্থির থাকতে পারছি না। প্রেমের দেবী, যাকে মিশরে আপনারা বলেন হাথোর, তিনি আমাকে তাঁর ক্রীতদাস বানিয়ে ফেলেছেন। রাজ্য, ক্ষমতা, সম্পদ বা অন্য নারী–কোন কিছুই আর আমাকে আকর্ষণ করে না। আমার সমস্ত চিন্তা জুড়ে আছেন আপনি, শুধু আপনি। আমার সিংহাসনের অর্ধেক আপনাকে ছেড়ে দেব, আপনি হবেন আমার একমাত্র রানী। এখন বলুন।'

'রাজা জ্যানিস,' বললো তুয়া, 'বুঝতে পারছি না কী ভূত চেপেছে আপনার ঘাড়ে যে মুক্তা বিক্রেতার মেয়ে সাধারণ এক গায়িকাকে রানী করতে চাইছেন। আমরা যাযাবরের মত ঘুরতে ঘুরতে আপনার নগরে এসেছি, আবার চলে যাব। পৃথিবীর সেরা কোন রমণীর জন্য সংরক্ষিত রাখুন ঐ উচ্চাসন। শুনেছি আবি নামের একজন এখন ফারাও হিসেবে

মিশর শাসন করছেন। তার অনেক মেয়ে। তাদের কাউকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠিয়ে দেখুন। আছে সিরিয়া, বিবলোস, কেশ বা মরুভূমির ওপাশে পান্ট রাজ্য। ওসব দেশের কোন রাজকন্যার জন্যও প্রস্তাব পাঠাতে পারেন। হতভাগী এই গায়িকাকে ছেড়ে দিন।'

'হতভাগী গায়িকা, যার মায়ের আছে এত মুক্তা, যার দাম একটা রাজ্যের সারা বছরের রাজস্ব আয়ের চেয়ে বেশি!' আসতির দিকে ফিরে একটু হেসে মাথা নোয়ালো জ্যানিস। 'সাধারণ এক গায়িকা, যার হাতির দাঁতের বীণার ওপর আঁকা রয়েছে মিশরের রাজকীয় প্রতীক! এই গায়িকা, যার মত রূপসী কেবল প্রাচীনকালের রাজকন্যাদের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব! যার কণ্ঠমাধুর্যে মানুষ তো মানুষ, বনের প্রাণীদেরও হৃদয় তছনছ হয়ে যায়! আপনি যে আমাকে সতর্ক করেছেন, এর জন্যে ধন্যবাদ, গায়িকা নেফারতি, কিন্তু তবু আমি চেষ্টা করতে চাই। বিকেলে যখনই আপনার গলার নিচে মিশরের উপাস্য পবিত্র চিহ্ন দেখেছি তখনই বুঝেছি এই গায়িকার রক্ত ধমনীতে নিয়ে আমার সন্তানরা কোনদিনই অনুশোচনায় ভুগবে না।'

'শুনে সম্মানিত বোধ করছি,' শীতল কণ্ঠে বললো তুয়া। 'আমার দেশের একজনকে আমি ভালবাসি। তাকে ছাড়া আর কাউকে আমি বিয়ে করবো না।'

'আপনার প্রেমিক আছে! তাহলে তার নামটা গোপন রাখুন, নইলে তাকে খুঁজে বের করে টুকরো টুকরো করে ফেলবো আমি। মাথা নাড়ছেন? ভাবছেন সেই লোক বড় বীর? জেনে রাখুন, আপনার ভালবাসা পাবার অপরাধে তাকে আমি পরাজিত করে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবো। শুনুন এখন, আপনাকেই আমি রানী করবো। রানী হতে না চাইলেও আমার হাতের মুঠোতেই থাকতে হবে আপনাকে। আমি সময় দেব আপনাকে। আজ থেকে তিন দিন। তারপরও যদি রাজি না হন, রানী নয়, আমার বাঁদী হতে হবে আপনাকে।'

প্রচণ্ড রাগে অবগুণ্ঠন সরিয়ে ফেলে জ্যানিসের চোখে চোখে তাকালো তুয়া। 'আপনি ভেবেছেন আমি বড় কেউ,' বললো সে। 'ঠিকই ভেবেছেন আপনি। মর্যাদায় আমি যা-ই হই না কেন, দেবতারা সবসময় থাকেন আমার সাথে। তাদের শক্তিতে আমি অপরিমেয় শক্তিশালী। আমাকে ছেড়ে দিন, নইলে আমি গলা চড়ালে দেবতাদের রোষে আপনার মত ক্ষুদ্র রাজা ধ্বংস হয়ে যাবেন।'

'এর মধ্যেই আপনি দেবী হাথোরের রোষের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন আমাকে। বাকি দেব-দেবীদের আমি ভয় করি না। তাদের যা খুশি

তারা করতে পারেন। আমার কথা ঐ একটাই, আজ থেকে তিনদিন পর রানী হিসেবে হোন আর দাসী হিসেবে হোন, আপনি হবেন আমার। আমার এই প্রতিজ্ঞার সাক্ষী রইলেন এই মহিলা, যাকে আপনি মা বলেন, শেষ পর্যন্তও সাক্ষী রইবেন তিনি।'

'হ্যাঁ, রাজা, শেষের সাক্ষী আমি থাকবো,' বললেন আসতি, 'কিন্তু শেষটা যে কেমন হবে তা এখনও জানি না। আপনি চাইলে জানার চেষ্টা করতে পারি। দেশে থাকতে মাঝে মধ্যে একটা বিশেষ ক্ষমতা আসতো আমার কাছে–বলতে পারেন গুপ্তক্ষমতা বা যাদুশক্তি। কখন কী করে এই ক্ষমতা আমার ভেতর এলো বলতে পারবো না। সবসময় যে থাকে তা-ও নয়। কখনও মনে হয় এই ক্ষমতা আমার দাস, কখনও আবার চেষ্টা করেও কিছু করতে পারি না। তবু, আপনার খাতিরে চেষ্টা করতে পারি। জানতে চান এই মেয়েকে জোর করে রানী করার চেষ্টা করলে শেষটা কেমন হবে?'

'হ্যাঁ, যদি কোন কৌশল জানা থাকে তো দেখান,' বললো জ্যানিস।

'তা-ই হোক, রাজা। তবে একটা কথা, আমাকে কথা দিতে হবে, শেষটা আপনার মনমত না হলে আমাকে দোষ দেবেন না। কাছে এসে এই পানির ভেতর তাকান, আমি আমার দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা শুরু করি। তাকিয়ে থাকুন, আশাকরি দেখতে পাবেন তিনদিন পর, যেদিন আপনি বিয়ে করবেন বলে ভাবছেন সেদিন আসলে কী ঘটবে। মা, তুমি গান শুরু করো–সেই প্রাচীন পবিত্র গান, যেটা আমি তোমাকে শিখিয়েছি।'

ঘরের ভেতর জলাধারটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন আসতি। মাথা নুইয়ে দুহাত বাড়িয়ে দিলেন পানির ওপর। তুয়া তার বীণার তারে টোকা দিয়ে গান শুরু করলো নিচু কণ্ঠে, অদ্ভুত এক উদাস করা সুরে। জ্যানিসের মনে হলো সেই কণ্ঠ আর সুর তার গরম রক্তের ওপর বরফ হয়ে ঝরে পড়ে শিরা-উপশিরা পর্যন্ত জমিয়ে দিচ্ছে। কিছুক্ষণ তুয়ার সুন্দর মুখটার দিকে তাকিয়ে রইলো সে। তারপর কে যেন তার চোখ দুটোকে আস্তে আস্তে টেনে নামিয়ে স্থির করলো জলাধারের পানির ওপর।

পানির ওপরটা ঝাপসা হয়ে উঠছে কুয়াশার মত। তারপর আস্তে আস্তে কেটে গেল কুয়াশা। পানিতে আয়নার প্রতিবিম্বের মত ভেসে উঠলো একটা দৃশ্য। জ্যানিস দেখলো, তার নগ্ন গলাকাটা মৃতদেহ পড়ে আছে তারই প্রাসাদের বড় মিলনায়তনের মর্মর মেঝেতে।

মিলনায়তনটা আগুনে পুড়ে কালো হয়ে গেছে। ধসে পড়া কয়েকটা স্তম্ভ উঁচিয়ে রাখা আঙুলের মত ইশারা করছে চাঁদের দিকে। তার একারই মৃতদেহ পড়ে আছে সেখানে। আর তার পাশে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করছে একটা কুকুর–তার নিজের পোষা কুকুরটা।

তুয়ার গানের রেশ মিলিয়ে যেতে মিলিয়ে গেল ছবিও। জ্যানিস জলাধারের প্রান্ত থেকে সরে এসে আগুন ঝরা চোখে তাকালো আসতির দিকে।

'যাদুকরী ডাইনী!' চিৎকার করলো সে। 'আমার অতিথি এবং ভাবী রানীর মা না হলে এই জঘন্য কৌশলের জন্য আজ রাতেই তোমার জন্যে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর ব্যবস্থা করতাম।'

'মনে হয় না আপনার নির্যাতনে আমি মরতাম,' বললেন আসতি। 'আমি জানি আপনি কী দেখেছেন। হতে পারে তা আপনার বা আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা। কিন্তু, আপনার কাছে মিনতি করছি, রাজা, আমাদের এখন ঘুমাতে দিন। আমরা ভয়ানক ক্লান্ত। ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা আপাতত ভবিষ্যতের গর্ভেই লুকানো থাক। তিনদিন পরেই জানা যাবে কী আছে আপনার এবং আমাদের ভাগ্যে।'

আর একটাও কথা না বলে জ্যানিস চলে গেল ঘর ছেড়ে।

'পানিতে কী দেখা গেছিল, দাই মা?' তুয়া জিজ্ঞেস করলো; 'আমি কিছুই দেখতে পাইনি।'

'মৃত এক মানুষের ছায়া,' বললেন আসতি। 'কোন দেবতা ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়েছেন এই হতভাগ্য রাজার দিকে। তার অপরাধ, তোমাকে কামনা করেছে। সুতরাং তাকে মরতে হবে। দেখছি তোমাকে যারা কামনা করে তাদের সবাইকে একই পরিণতি বরণ করতে হয়। ও আমেনের নক্ষত্র, মাঝে মাঝে আমার ভয় হয়, তোমার দিকে চোখ তোলার কারণে আমার ছেলেরও না জানি একই পরিণতি হয়। আর তা যদি ঘটে তাহলেই বোধহয় তোমাকে আমি একটু ঘৃণা করতে পারবো।'

সে রামেসের মৃত্যুর কারণ হতে পারে, এই চিন্তাতেই চোখে পানি এসে গেল তুয়ার। 'এমন অলক্ষুণে কথা বলছো কেন, মা?' ধরা গলায় বললো সে। 'তুমি তো ভাল করেই জান ওর জন্যেই আমি এত সব সহ্য করছি। সেই ওকেই যদি নিয়ে নেওয়া হয় তাহলে আমিও ওর পেছন পেছন চলে যাব ওপারে। তাছাড়া তুমি তো ঠিক বলোনি। কেশ-এর যুবরাজকে কে মেরেছে, আমি না অন্য কেউ?'

'অন্য কেউ। তবে-তোমার জন্যে।'

'আর সেই শুয়োর, আমার বাবা এবং তোমার স্বামীর হত্যাকারী আবির শাস্তির ব্যবস্থা করেছে কে? একটু আগে রাজা জ্যানিসকে চৌবাচ্চায় মৃতদেহের ছবিই বা দেখিয়েছে কে? আমি নাকি আসতি? কী বলবো আসতিকে, যাদুকরী ডাইনী নাকি আমেনের দূত? দাইমা, তুমি তো জানো, আমি আর দশটা নারীর মত নই। এটা হয়তো সত্যি, আমার দেহে যে রক্ত বইছে তার একাংশ মানবীয় নয়। এটাও তো সত্যি, জন্ম-মুহূর্তে আমার যে বিধিলিপি লিখে দেয়া হয়েছে, তা-ই আমি পূরণ করে চলেছি। এসব যে ঘটবে তা তো তুমি জান, তারপরেও আমাকে দোষ দাও কেন?' বলতে বলতে হু হু করে কেঁদে ফেললো তুয়া।

'কাঁদে না, মা, কাঁদে না, আমি তোমাকে দোষ দেইনি,' তুয়াকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন আসতি। 'আমেনের নক্ষত্র এবং কন্যা, আমার রানীকে দোষ দেব, অত বড় সাহস কি আমার আছে? আমি জানি তোমার জীবন তোমার বিধিলিপি অনুযায়ী এগিয়ে চলেছে। এই বিধিলিপিই তোমাকে পৌঁছে দেবে শেষ দরজার কাছে। রামেসের জন্যে দুশ্চিন্তা থেকেই এত কঠিন কথা বলে ফেলেছি। ও আমার একমাত্র ছেলে। অথচ গুপ্তবিদ্যায় আমার এত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ও এখন কেমন আছে তা আমি জানতে পারছি না। ওর আর আমার আত্মার মাঝখানে একটা কালো পর্দা যেন ঝুলে আছে, সে-পর্দা ভেদ করে দৃষ্টি চলে না। তাই ভয় হয়, তোমাকে ভালবাসার অপরাধে কোন ঈর্ষাকাতর দেবতা আমার রামেসকেও সময় হওয়ার আগেই কবরের কাছে পাঠিয়ে দেন কিনা। একথা ভাবলেই আমার বুকটা ভেঙে যেতে চায়।'

এবার সান্ত্বনা দেয়ার পালা তুয়ার। 'আমি বুঝতে পারছি, মা, বুঝতে পারছি। কিন্তু তুমি কি ভুলে গেছ দেবরাজ আমেনের প্রতিশ্রুতির কথা? আমার মা আহুরাকে কি তিনি বলেননি আমি এক রাজকীয় প্রেমিক খুঁজে পাব, এবং আমাদের প্রেমের ফসল হিসেবে আসবে বহু রাজা এবং রাজপুত্র? এই প্রতিশ্রুতি সত্য হলে রামেস অবশ্যই বেঁচে থাকবে।'

'কী করে এত নিশ্চিত হচ্ছো? রাজকীয় পুরুষ তো কম নেই পৃথিবীতে, যেখানে ওকে আদৌ রাজকীয় বলা যায় কিনা সন্দেহ।'

'না, দাইমা,' আসতির বুকে মুখ গুঁজে তুয়া বললো, 'আমার কাছে আর কোন রাজকীয় পুরুষ নেই। সুতরাং রামেস বেঁচে আছে, থাকবে। তা যদি না থাকে দেবরাজ মিথ্যে বলেছেন।'

তুয়াকে চুমু খেলেন আসতি। এক মুহূর্ত ভেবে বললেন, 'এবার কাজে লেগে যেতে হয়। বীণা নিয়ে জানালার কাছে যাও। ভিখিরি কেফারকে ডাকো।'

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো তুয়া। নিচে বিরাট উঠানটা চাঁদের নরম আলোয় আলোকিত। বীণার তারে ঝঙ্কার তুলে তিনবার ডাকলো সে: '*কেফার! কেফার! কেফার!*'

প্রতিটা ডাক প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এলো ওদের কাছে। শেষ পর্যন্ত মনে হতে লাগলো কেফার নামে ভরে উঠেছে আকাশ বাতাস।

১৬
ভিখিরি ও রাজা

তৃতীয় দিন বিকেল। তুয়া আর আসতি বসে আছেন তাঁদের বিলাসবহুল কারাগারে। একপাশের জানালার কাঠের জাফরি দিয়ে দেখা যাচ্ছে নিচে দরবার বসেছে রাজার। রীতি অনুযায়ী প্রতিদিন এই সময় রাজা জ্যানিস তার প্রজাদের অভাব-অভিযোগ শোনে, বিচার করে। দুই নারীর মনেই উদ্বেগ। কারণ রাজার বেঁধে দেয়া সময় শেষ হয়ে আসছে।

'রাত কাছিয়ে আসছে,' তুয়া বললো, 'রাতের সঙ্গে সঙ্গে আসবে জ্যানিস। দেখ, একটু পরপরই কেমন এই জানালার দিকে তাকাচ্ছে, ক্ষুধার্ত সিংহ যেমন খাবারের দিকে তাকায়। কেফার এখনও এলো না। কে জানে, হয়তো সত্যিই সে ভবঘুরে ভিখিরি। তার যা বয়েস, হয়তো মারা গেছে এর মধ্যে। আমেনকে এত ডাকলাম, তিনিও সাড়া দিলেন না। ভীষণ হতাশ লাগছে আমার, দাইমা। তুমি তো জ্ঞানী, বলতে পারো কী করবো এখন আমি?'

'দেবতাদের ওপর বিশ্বাস রাখো। সূর্য অস্ত যেতে এখনও তিন ঘণ্টা বাকি, আর দেবতারা চাইলে তিন ঘণ্টায় পৃথিবী ধ্বংস করে আবার গড়ে দিতে পারেন। মেফিসের মিনারে যখন না খেয়ে ছিলাম সে-সময়কার কথা মনে করে দেখ। মনে করে দেখ মিনারের জানালা দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার পর রা-য়ের তরণীতে করে উদ্ধার পাওয়ার কথা এবং সেই জাহাজের চালকদের কথা। দেবতাদের ওপর ভরসা রাখো, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'ভরসা তো করি, কিন্তু, তবু-ওহ! চলো আমরা অন্য কিছু নিয়ে

আলাপ করি। অমন অদ্ভুতভাবে আমাদের মেক্সিস ছেড়ে আসার পর সেখানে কী ঘটেছে জানতে বড় ইচ্ছে হয়। তোমার কি মনে হয় সত্যিই আমার সেই ভয়ঙ্কর কা আবিকে বিয়ে করে সেখানকার সিংহাসনে বসেছে? তা-ই যদি হয় তো আবির জন্যে দুঃখ না পেয়ে উপায় নেই। আমার কা–ওর চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু দেখেছি যাতে আমার এই নশ্বর দেহের রক্ত হিম হয়ে আসে, আর তুমি বলো ও আমারই একটা অংশ, অমর এক আত্মা, জন্মের সময়ই আমার সাথে দিয়ে দেয়া হয়েছে! আমার আরও একটা কা থাকলে বেশ হতো, দাই মা! তুমি আমার ভেতর থেকে বের করে এনে তাকে দিয়ে এই জ্যানিসকে বিমোহিত করে রাখতে, এই ফাঁকে আমরা পালিয়ে যেতাম।...দেখ, বিচার শেষ, জ্যানিস রায় দিচ্ছে। রায় দিক আর যা-ই দিক ওর মন কিন্তু এদিকে। ওর চোখের দৃষ্টি এই আড়াল ভেদ করে এসে যেন আমাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। রায় শেষ, এখন উঠছে। কিন্তু! কে এসেছে? ওঠো, দাই মা, দেখ!'

জানালার কাছে গিয়ে আসতি দেখলেন, নিচে উঠানের ফটকে শতচ্ছিন্ন পোশাক পরা শাদা দাড়িওয়ালা দীর্ঘদেহী এক অতিপ্রাচীন লোক কাঁটাময় লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। শূন্য দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন তিনি, যেন সূর্যের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। রক্ষীরা মূর্তিমান আপদ ভেবে তাঁকে ঠেলে সরিয়ে দিতে গেল। কিন্তু বৃদ্ধের লাঠির এক ঝটকায় তারা ছিটকে এসে পড়লো অনেকটা পেছনে, যেন বিশেষ কোন শক্তি সঞ্চিত ছিল ঐ লাঠিতে। এরপর মনে হলো তাঁর কচ্ছপের মত চোখ দুটো চকচকে সিংহাসনটা এবং তার ওপর বসে থাকা রাজাকে দেখতে পেয়েছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে তিনি এগিয়ে গেলেন সিংহাসনের সামনে। আবার ভর দিলেন লাঠিতে।

'কে এই বুড়ো?' হুঙ্কার ছাড়লো জ্যানিস, 'এত বড় সাহস, রাজাকে কুর্ণিশ করে না!'

'তুমি রাজা?' বললেন কেফার। 'আমি খুবই অন্ধ। ভেবেছিলাম তুমি আমার মতই সাধারণ মানুষ, কেবল গায়ের পোশাকটা একটু চকচকে। বলো তো রাজা হয়ে সবকিছু পায়ের নিচে মাড়িয়ে চলতে কেমন লাগে? তুমি কি এখনও সাধারণ মানুষের মত আশা কর, কষ্ট পাও, মৃত্যুকে ভয় পাও? তোমার ঐ সোনা-দানায় তৈরি পোশাকের নিচে যে শরীর তা আমার এই ছেঁড়া কাপড়ের নিচের শরীরটার চাইতে কি আলাদা? অতীত দিনের স্মৃতি কি তোমাকে কষ্ট দেয়, যারা আর কখনও ফিরে আসবে না তাদের স্মৃতি? হতাশার বেদনা আর দুঃখ কি

তুমি বোঝো?'

'এই গর্দভের ধাঁধার জবাব দেয়ার জন্যে আমি এখানে বসেছি নাকি?' ঝাঁঝিয়ে উঠলো জ্যানিস। 'বের করে দাও বুড়োটাকে, আমার কাজ আছে।'

রাজার নির্দেশ পালনের জন্য লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল রক্ষীরা। কেফার আবার তাঁর লাঠি দিয়ে ঝটকা মারলেন। এবারও সব ক'জন রক্ষী দূরে ছিটকে পড়লো।

'কাজ আছে, তাই না?' বললেন কেফার। 'কাজ মানে তো ঐ যে ওখানে যে আছে তার সর্বনাশ করা,' তুয়া যে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে সেদিকে ইশারা করলেন তিনি। 'তারও তো তিন ঘণ্টা বাকি, এর মধ্যে সূর্য ডুববে না। সুতরাং আমার আবেদন শোনার সময় নেই কথাটা ঠিক নয়। কথা তোমাকে শুনতে হবে, কারণ যে মহিলার সঙ্গে তোমার কাজ আমার কথাও তাকে নিয়েই।'

'নির্বোধ বুড়ো, ঐ মহিলা আর তার সঙ্গে আমার কাজ সম্পর্কে কী জানো তুমি?' আগের মতই ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো জ্যানিস।

'অনেক কিছুই জানি, রাজা, কারণ আমি তার বাবা। আরও বলবো?'

'বাবা! মিথ্যে কথা বলার আর জায়গা পাও না?'

'হ্যাঁ, বাবা। আমি তোমাকে জানাতে এসেছি যে আমাদের বংশ তোমার বংশের চেয়ে অনেক প্রাচীন। আমার মেয়ে যেমন তোমাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি হয়নি, তেমনি আমিও তোমাকে জামাতা হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি নই।'

রাজার পারিষদদের কয়েকজন হো হো করে হেসে উঠলো একথা শুনে। কিন্তু জ্যানিস হাসলো না। তার কালো মুখটা রাগে শাদা হয়ে উঠেছে। 'উন্মাদটাকে টেনে নিয়ে এসো!' চিৎকার করে উঠলো সে। 'কেটে ফেল বেয়াদব জিহ্বাটা!'

আবার লাফ দিয়ে এগোলো রক্ষীরা। কিন্তু তারা কাছে পৌঁছুনোর আগেই কেফার কথা বলতে শুরু করেছেন অন্য এক স্বরে। এমন ভয়ানক কঠিন সে কণ্ঠস্বর যে তার আওয়াজেই দাঁড়িয়ে গেল তারা।

'সাবধান, টাট-এর রক্ষীদল!' বললেন কেফার, 'আমার গায়ে আঙুল ছোঁয়ানোর আগে ভেবে দেখ এই শতচ্ছিন্ন পোশাকের ভেতর কে আছে তা তোমরা জান কিনা। জ্যানিস, তুমি নিজেকে রাজা বলে দাবি করো, তোমার চাইতে আরও বড় রাজা, যার সিংহাসন ঐ সূর্যের ওপরে, তার নির্দেশ শোন! যে নারীকে তুমি জোর করে আটকে রেখেছ

তাকে এবং তার সঙ্গিনীকে রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সব জিনিসপত্রসহ তোমার দক্ষিণ ফটকে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেবে। তাদের যেন কোন ক্ষতি না হয়। রাজাদের রাজা যিনি, যিনি থাকেন ঊর্ধ্বাকাশে, তোমার ওপর এ-ই তাঁর নির্দেশ।'

'এই নির্দেশ যদি আমি পালন না করি?' ব্যঙ্গের সুরে বললো জ্যানিস।

'তাহলে? মহিয়সী আসতি সেদিন তোমাকে যে ছবি দেখিয়েছেন তা মনে করে দেখ। ঐ ছবি সত্যি হবে।'

'সে তো মিশরীয় যাদুকরীর একটা নোংরা কৌশল। বুঝতে পারছি ওতে তোমারও হাত ছিল। তোমার বা তোমার ঐ রাজা–কারো নির্দেশই আমি মানি না। আজ রাতেই ঐ মেয়ে আমার স্ত্রী হবে।'

'তাহলে জ্যানিস, টাটের রাজা, শুনে নাও তোমার জন্যে কী শাস্তি নির্ধারিত হয়ে আছে। আজ রাতে অন্য এক জীবনসঙ্গিনী পাবে তুমি, তার নাম মৃত্যু। শুধু তা-ই নয়, তোমার অনেক প্রজা তাদের পাপের কারণে, দেবতাদের নির্দেশ লঙ্ঘনের অপরাধে তোমার সঙ্গে অন্ধকারের দিকে যাত্রা করবে। এবং আগামীকাল থেকে টাট শাসন করবে অন্য এক রাজা। সেই রাজা তোমার বংশের কেউ না।'

কথা শেষ করে ধীর পায়ে কেফার চলে গেলেন রাজার দরবার ছেড়ে। তাঁর চেহারায়, পা ফেলার ভঙ্গিতে এমন এক কর্তৃত্ব আর আভিজাত্য ফুটে উঠেছে যে তাকে বাধা দেয়ার সাহস কেউ পেলো না। অবশ্য একটু পরেই, যেন সম্মোহনের ঘোর থেকে বেরিয়ে এসে জ্যানিস চিৎকার করে উঠলো:

'বদমাশ যাদুকরটাকে ধরে এনে এখানেই হত্যা করো!'

সঙ্গে সঙ্গে বর্শা উঁচিয়ে ছুটলো রক্ষীরা। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না কেফারকে। এক মহিলা তাকে এক জায়গায় দেখেছে বললো তো এক শিশু বললো আরেক জায়গায় দেখেছে। কয়েকজন ক্রীতদাস বললো, তারা তাকে ঐ ওখান দিয়ে চলে যেতে দেখে ভয়ে পালিয়ে এসেছে, কারণ তার কোন ছায়া পড়ছিল না। এইভাবে ধোঁকা খেতে খেতে রক্ষীরা সন্ধ্যার দিকে দক্ষিণ ফটকে পৌঁছে কিছুটা নির্ভরযোগ্য তথ্য পেলো। দ্বাররক্ষকরা জানালো, ফটক বন্ধ করার মুহূর্তে ওরকম একজনকে তারা বেরিয়ে যেতে দেখেছে বটে, তবে হঠাৎ ওঠা এক বালুঝড়ে মুহূর্তের মধ্যে সে হারিয়ে যায়। প্রাসাদে ফিরে রক্ষীরা যখন এই সংবাদ জানালো, প্রচণ্ড ক্রোধে রাজা তাদের চাবকানোর হুকুম দিলো।

অন্ধকার হয়ে গেছে। নির্ধারিত সময়ে জ্যানিস মনটাকে শক্ত করে তুয়া আর আসতিকে যে কামরায় আটকে রাখা হয়েছে সেখানে এলো। খোজা প্রহরীদের বাইরে দাঁড়াতে বলে নিজে ঢুকলো ভেতরে। প্রদীপ জ্বলছে ঘরে। জানালাগুলো সব বন্ধ। তবু বাইরে থেকে ভেসে আসছে প্রচণ্ড ধূলিঝড়ের গর্জন। জানালার কপাটের ফাঁক-ফোকর দিয়ে ঘরেও ঢুকছে ধুলো। ঘরের মাঝখানের জলাধারটির কাছে দাঁড়িয়ে আছে তুয়া আর আসতি।

'সময় হয়েছে,' তুয়ার উদ্দেশ্যে বললো রাজা। 'এবার তোমার জবাব চাই।'

তুয়া জবাব দিলো, 'শুনুন, রাজা, আমার নয়, আপনার স্বার্থে বলছি, দেখে যা মনে হয় আমি তার চাইতেও বেশি কিছু। পৃথিবীতে যেমন আমার বন্ধু আছেন, তেমনি আছেন আকাশে। তাদের একজন বিকেলে আপনার দরবারে এসেছিলেন। পাগলামি ত্যাগ করুন, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনার ভাল ছাড়া মন্দ চাই না। কিন্তু যদি কথা না শোনেন ভয়ানক পরিণতি অপেক্ষা করছে আপনার জন্যে। তেমন কিছু যদি না-ও হয় আমি আত্মঘাতি হবো।'

'অনেক ভয় দেখিয়েছ, আর নয়,' শান্ত শীতল কণ্ঠে বললো জ্যানিস, 'আমি তোমার জবাবের অপেক্ষায় আছি।'

'রাজা, শেষবারের মত আমি আপনাকে মিনতি করছি। আপনি ভাবছেন নিজেকে বাঁচানোর জন্যে আমি মিথ্যে বলছি। না, এই দেখুন,' অবগুণ্ঠন সরিয়ে গলার নিচেটা অনাবৃত করে ফেললো তুয়া। 'দেখুন, আমার বুকে কিসের চিহ্ন আঁকা! এই পবিত্র চিহ্ন যার দেহে আছে তার ওপর শক্তি প্রয়োগের আগে ভাল করে ভেবে দেখুন।'

তুয়ার অনাবৃত মুখের সৌন্দর্য দেখে উন্মাদ হয়ে উঠলো জ্যানিস। ঢোক গিলে বললো, 'হ্যাঁ, অমন একজনের কথা শুনেছি বটে। থিবিতে তার জন্ম, অদ্ভুত এক পিতার ঔরসে। কিন্তু সে এখানে আসবে কেমন করে? শুনেছি ফারাও হিসেবে এখন মিশর শাসন করছে সে।'

'এখানে কী করে আসবে, আপনার দরবারে কোন দৈবজ্ঞ থাকলে তাকে জিজ্ঞেস করুন। আমি শুধু বলবো, জনশ্রুতি সবসময় মিথ্যা হয় না, অদ্ভুত সেই পিতার কন্যাকে ছেড়ে দিন।'

'এর মধ্যেই আরও একজন তোমার পিতৃত্ব দাবি করেছে– শতচ্ছিন্ন পোশাক পরা এক ভিক্ষুক।'

'আপনার সৈন্যরা অনেক চেষ্টা করেও যাকে খুঁজে পায়নি, বা যার গায়ে আঙুলটাও ছোঁয়াতে পারেনি,' এই প্রথম কথা বললেন আসতি।

তার কথায় কান না দিয়ে বলে চললো জ্যানিস, 'যা-ই হোক, তোমার বাবা ভিখিরি হোক আর দেবতাই হোক, বা তুমি মর্ত্যে নেমে আসা খোদ হাথোরও যদি হও, তুমি আমার। তৃতীয়বারের মত জিজ্ঞেস করছি, স্বেচ্ছায় আমার রানী হবে নাকি আমার লোকেরা তোমার সামনেই ঐ ডাইনীটাকে এই পানিতে ডুবিয়ে মেরে তোমাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে আসবে?'

তুয়া কোন জবাব দিলো না। মুখের ওপর থেকে ঘোমটাটা পুরো সরিয়ে দিয়ে দু'হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে রইলো কেবল। আর আসতি বিদ্রূপ করে বলে উঠলেন, 'ও হে, রাজা, ডাকো তোমার লোকদের, বাতাসে কেবল ধুলো, আমার গলা শুকিয়ে আসছে, ওরা এসে তোমার কথামতো যদি আমাকে একটু পানি খাইয়ে দিতো।'

প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়লো জ্যানিস, 'এই! কে আছ! এসো, যা বলে রেখেছি সেই মত শুরু করো!'

তার কথা শেষ হতে না হতেই দড়াম করে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো, না কোন খোজা রক্ষী নয়, ঘরে ঢুকলেন কেফার। শতচ্ছিন্ন পোশাক নয়, তাঁর গায়ে এখন শাদা আলখাল্লা। মাথায় উষ্ণীষ। তাঁর পেছন পেছন রক্তে লাল হয়ে থাকা তলোয়ার হাতে এলো বুনো চেহারার মরুসর্দাররা। গালে কালো দাড়ি, ভাবলেশহীন মুখ, চোখ গোল গোল, গলায় সবার সোনার শিকল। ভয় কাকে বলে কেউ জানে না।

এক পলক দেখেই পরিস্থিতি বুঝতে পারলো জ্যানিস। সাঁৎ করে খাপ থেকে তলোয়ার বের করেও দাঁড়িয়ে রইলো দ্বিধার সঙ্গে। এর মধ্যে বুনো লোকগুলো ঘিরে ফেললো তাকে।

'সম্ভব হলে মাফ করে দিন ওকে, বাবা,' তুয়া বললো, 'প্রেম ওকে পাগল করে দিয়েছিল।'

'এখন আর তা সম্ভব নয়!' শান্ত-গম্ভীর গলায় বললেন কেফার। 'দেবতাদের সাবধানবাণীর তোয়াক্কা যে করে না দেবতাদের প্রতিহিংসা তাকে ভোগ করতে হয়। জ্যানিস, অসহায় এক নারীর ওপর তুমি জোর খাটাতে যাচ্ছিলে, পরিণামে তোমার প্রাসাদ এখন পুড়ছে, তোমার নগরী আমার দখলে, তোমার পক্ষে যে অল্প ক'জন ছিল তারা সবাই নিহত। কাল থেকে অন্য এক রাজা শাসন করবে তোমার জায়গায়। পিতা আমেন তোমার জন্যে এই শাস্তির বিধান দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ, এখন আর তা সম্ভব নয়,' প্রতিধ্বনি করলো জ্যানিস। 'নশ্বর মানুষদের নিয়ে যে দেবতারা খেলা করেন, তাঁদের সঙ্গে মানুষ লড়বে

কী করে? এক দেবী আমাকে নির্দেশ দিলেন ভালবাসার, আরেকজন আদেশ দিচ্ছেন মৃত্যুর। তা-ই হোক। আনন্দের সঙ্গেই আমি মরব। জন্মেছি অথচ দুঃখ আর মৃত্যু কাকে বলে জানবো না তা তো হতে পারে না। ও প্রেরিত পুরুষ, আপনি শুধু বলুন, কোন অশুভ শক্তির প্রভাবে আমাদের জন্মাতে হয় আর দুঃখ ভোগ করতে হয়?'

কেফার ইশারায় কাছে ডাকলেন তুয়া আর আসতিকে। এগোলো ওরা বৃদ্ধের দিকে। জ্যানিস রইলো কঠোর চেহারার লোকগুলোর ঘেরাওয়ের মধ্যে। তুয়া যখন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছে, সে বললো:

'বিদায়, অপরূপা। টাট-এর রাজা এই জ্যানিসের কথা মনে রেখো, মনে রেখো, সে প্রাণে বাঁচতে পারতো, কিন্তু তোমাকে ভালবেসে মৃত্যুর পথকেই সে বেছে নিয়েছে।'

চলে গেল ওরা। মর্মর পাথরের বিরাট কামরাটার দরজা পেরোতেই দেখলো খোজা রক্ষীদের মৃতদেহ পড়ে আছে মেঝেতে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে প্রাসাদের সিংহদরজার কাছে গিয়ে দেখলো সেখানেও বেশ কিছু সৈন্যের মৃতদেহ পড়ে আছে। পিছন ফিরে দেখলো পুরো প্রাসাদটায় আগুন জ্বলে উঠেছে। রাজপ্রাসাদের বাইরের চত্বরে পৌঁছে ওরা কেফারের নির্দেশে উঠে বসলো একটা পালকিতে। কৃষ্ণাঙ্গ বাহকরা পালকি বয়ে নিতে শুরু করলো, কোথায় তা ওরা জানে না।

সারারাত ওদের বয়ে নেয়া হলো। কখনও জেগে রইলো, কখনও ঘুমালো। সকালবেলা থামলো পালকি। নেমে এসে দেখলো একটা মরূদ্যানের ভেতর রয়েছে ওরা। মরুচরদের বিশাল এক বাহিনী ঘিরে রেখেছে মরূদ্যানটা। টাট নগরীর কোন চিহ্ন কোথাও নেই। রাতের স্বপ্নের মত ওদের জীবন থেকে তা হারিয়ে গেছে। মরূদ্যানে যে তাঁবুতে ওদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে তার ভেতর রয়েছে ওদের মুক্তা ও সোনা আর তুয়ার হাতির দাঁতের বীণাটা।

ভীষণ ক্লান্ত লাগছে দুজনেরই। শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো আবার। ঘুম যখন ভাঙলো তখন নতুন একটা দিনের সূর্যোদয় হচ্ছে। উঠে পাশে সাজিয়ে রাখা খাবার খেয়ে নিয়ে তাঁবুর বাইরে এলো ওরা। একপাশে একটা খেজুর গাছের নিচে দেখা পেলো কেফারের। তাঁর সাথে রয়েছে মরুচর গোত্রপ্রধানরা। তুয়া আর আসতিকে দেখে মাথা নুইয়ে সম্মান জানালো তারা।

'শুনুন, সম্মানিতা নেফারতি এবং তাঁর সঙ্গিনী আসতি,' কেফার বললেন, 'আমার এখানকার কাজ শেষ। রুটি ভিক্ষার জন্যে এবার অনেক দূর যেতে হবে। আমি চলে যাচ্ছি বলে ভয় পাবেন না।

মরুভূমির এই সর্দাররা আপনাদের আজ্ঞাবহ, আপনাদের আজ্ঞা পালনের জন্যেই ওদের জন্ম। এখন থেকে চলার পথে ওরাই আপনাদের সাহায্য করবে।' সর্দারদের দিকে তাকিয়ে কেফার যোগ করলেন, 'বলো, কী আদেশ দেয়া হয়েছে তোমাদের?'

সর্দাররা সমস্বরে বলতে শুরু করলো, 'ও যাযাবর, আমাদের পিতা-পিতামহদের কাছে আপনি আমাদের জাতির অভিভাবক বলে পরিচিত, আপনারই সহায়তায় বিজয় আমাদের সবসময়ের সঙ্গী, আপনার আদেশ, আমরা মরুভূমি ও পাহাড়ের ভেতর দিয়ে বহু চাঁদব্যাপী এক যাত্রায় এই স্বর্গীয় নারী এবং তাঁর সঙ্গিনীর সাথী হবো; পৌঁছে দেব স্বর্ণনগরীর প্রধান ফটকে। সেখানেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হবে। আমাদের একজনও জীবিত থাকা পর্যন্ত এই নির্দেশ প্রতিপালিত হবে।'

'শুনলে তো, মা,' কেফার বললেন তুয়াকে। 'এদের ওপর ভরসা রেখো। দিনের বেলায় শান্তিতে এগিয়ে যাবে, রাতে ঘুমাবে স্বস্তিতে। এর অন্যথা হতে ওরা দেবে না। যদি ওরা বা অন্য কেউ ঘটনাক্রমে তোমাদের বিপদে ফেলে, তোমার বীণায় টোকা দিয়ে আমাকে ডেকো, যেমন ডেকেছিলে জ্যানিসের প্রাসাদ থেকে, আমি হই বা অন্য কেউ, এগিয়ে আসবে তোমার সাহায্যে। মরু-সর্দারগণ, এই স্বর্গীয় নারীকে তোমাদের হেফাজতে দিয়ে যাচ্ছি। খেয়াল রেখো যেন ও নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছুতে পারে। কাজ শেষে ফিরে এসে আমাকে খবর জানাবে। বিদায় সবাইকে!'

আর একটাও কথা না বলে লাঠি তুলে নিয়ে হন হন করে হাঁটতে শুরু করলেন কেফার। মরুচর সেনাবাহিনীর সৈনিকরা উটগুলোকে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে এবং নিজেরা সালাম দিয়ে তাঁকে সম্মান জানালো। একটু পরেই ওরা দেখলো একটা বালিয়াড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন কেফার। পর মুহূর্তে আর দেখা গেল না তাঁকে।

'কে ইনি, যাঁর নির্দেশে মরু-গোত্রগুলোর এত লোক একত্রিত হয়েছে?' এক সর্দারকে জিজ্ঞেস করলেন আসতি।

'কে উনি তা আমি বা আমরা কেউই জানি না। শুধু এটুকু বলতে পারি উনি মরুভূমির এবং সেখানে যারা বাস করে তাদের সবার রক্ষক। তাঁর নির্দেশে বয়ে যায় মরুঝড়, যেমন গেছিল গতকাল আমাদের এই বাহিনীকে আড়াল দেয়ার জন্যে; তারই নির্দেশে ঝর্নাধারায় পানি প্রবাহিত হয়; কোন গোত্র শক্তিশালী হয় কোন গোত্র শক্তিহীন হয়ে হারিয়ে যায়। আমার মনে হয় উনি স্বর্গের নির্দেশ বা রায়

কার্যকর করার জন্য যখন যেখানে খুশি যেতে পারেন। মরুভূমির লোকেরা তাঁকে মান্য করে, যেমন করি আমরা, যদিও তাঁর দেখা পাই খুব কম। ঐ শতচ্ছিন্ন পোশাকের নিচে শীর্ণ দেহটায় তিনি কেমন শক্তি ধরেন তা তো আপনারা নিজেরাই দেখেছেন।'

'ধন্যবাদ, সর্দার,' বললেন আসতি। 'আমারও মনে হয় এই যাযাবর এক শক্তি, এবং বড় কোন শক্তি, এত বড় যে তাঁর নাম আমি উচ্চারণ করব না। আমরা তৈরি, নিয়ে চলুন আমাদের স্বর্ণ-নগরীতে।'

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস ওরা এগিয়ে গেল মরুভূমির ওপর দিয়ে। প্রথমে দক্ষিণে তারপর পুবদিকে। বিশাল কাফেলার একেবারে মাঝখানে উটের পিঠে তুয়া আর আসতি। দুজনেরই মুখ অবগুণ্ঠনে ঢাকা। একবার এক পাহাড়ী গোত্রের লোকেরা আক্রমণ করেছিল ওদের। মরু-সৈনিকরা সহজেই তাদের পরাজিত ও বিতাড়িত করে। একবার মরুভূমিরই এক গোত্রের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়ে যায়। কাফেলায় এক দেবী আছেন শুনে তারা তাকে নিজেদের দখলে নিতে চেয়েছিল। তাদেরও হারিয়ে দেয় মরু-সৈনিকরা। সেই যুদ্ধে ঘোড়ার পিঠে চেপে নেতৃত্ব দিয়েছিল তুয়া নিজে। ওর শাদা পোশাক পরা রণসাজে সজ্জিত মূর্তি দেখেই শত্রু হতবিহ্বল হয়ে পালিয়েছিল। একবার এক মরূদ্যানে পুরো দুই মাস ওদের তাঁবু করে থাকতে হয়েছিল বৃষ্টি নামার অপেক্ষায়। বৃষ্টি নামার পর আবার শুরু হয়েছিল বিরামহীন যাত্রা। অবশেষে এক রাতে ওরা তাঁবু ফেললো এক পাহাড়ের ওপর।

পরদিন ভোরে আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তুয়া আর আসতি তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন। নিচে প্রশস্ত এক নদী। সেটা যে নীলনদ তা তাদের বুঝতে অসুবিধা হলো না। নদীর তীরে দেখতে পেলেন স্বর্ণ-নগরী নাপাতার পিরামিড আর মন্দিরের সারি। আমেনের দক্ষিণ নগরী হিসেবে পরিচিত এই নাপাতা। অবশেষে আরব্ধ নগরে পৌঁছুতে পারায় ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন তাঁরা।

দিনের প্রথম আলোয় উদ্ভাসিত নগরীর দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন দুজন, এই সময় মরুচর সৈনিকদের প্রধান এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো।

'স্বর্গীয় নারী,' তুয়ার উদ্দেশ্যে বললো সে, 'নারী বা দেবী যা-ই হোন আপনি, দেখুন, মরুভূমির প্রাচীন রাজা কেফারের নির্দেশ আমরা প্রতিপালন করেছি। ঐ যে নাপাতা নগরী। আপনাদের একাই যেতে

হবে ওখানে। আমরা মরুচরেরা যুদ্ধ ছাড়া আর কোন প্রয়োজনে নগরে প্রবেশ করি না। আমার লোকেরা ফিরে যাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। দেশে ওদের স্ত্রী-সন্তানরা পথ চেয়ে আছে। তাছাড়া আমাদের এতজনকে একসাথে দেখে নাপাতার লোকেরা শত্রু ভেবে আক্রমণ করে বসতে পারে।'

'ঠিক আছে,' বললো তুয়া। 'তোমাদের সবাইকে আমার অশেষ ধন্যবাদ। ঈশ্বর তোমাদের এই কাজের পুরস্কার দেবেন। নিজভূমের পথে রওনা হয়ে যাও তোমরা। যাবার আগে সামান্য উপহার নিয়ে যাও আমার কাছ থেকে।'

টাট নগরীতে মুক্তা বিক্রি থেকে যে সোনা জমা হয়েছিল তা নিয়ে আসতে বললো তুয়া। পরিমাণে তা কম নয়। প্রায় পুরোটা সোনা মরুচরদের ভেতর ভাগ করে দেয়ার জন্যে তুলে দিলো সে সেনাপতির হাতে। সামান্য একটু সোনা আর মুক্তাগুলো রেখে দিলো নিজের প্রয়োজনে লাগতে পারে ভেবে। সেনাপতি আর তার সহকর্মীরা তাকে অভিবাদন জানিয়ে তাদের সেনাদলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ভোরের কুয়াশার ভেতর দিয়ে রওনা হয়ে গেল বিশাল বাহিনীটা। একটু পরেই ধুলোর এক মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেল তারা।

উটের পিঠে বসে তুয়া আর আসতি রাতের স্বপ্নের মত ওদের মিলিয়ে যাওয়া দেখলেন। তারপর কালো অবগুণ্ঠনে নিজেদের আবৃত করে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলেন নীলনদের পাড়ের দিকে। ঐ পাড় ধরে কিছুদূর এগোলেই নাপাতার নগর-প্রাচীর। অন্য যাত্রীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে একের পর এক পিরামিডের পাশ কাটিয়ে অবশেষে ওরা পৌঁছুলো নগরীর উত্তর তোরণে। সোনায় মোড়া কপাট তখনও খোলা হয়নি বলে অপেক্ষায় থাকতে হলো ওদের। শহরের বাজারে বিক্রি করার জন্যে তিনটে গাধার পিঠে শাক-সব্জি চাপিয়ে এনেছে এক কৃষক মহিলা। ওদের সঙ্গে আলাপ শুরু করলো সে। জানতে চাইলো কোত্থেকে এসেছে।

আসতি জবাবে বললেন, তাঁরা মিরো নগরী থেকে আসছেন, পেশা মুক্তা বিক্রি করা এবং গান গাওয়া।

'তাহলে তো একেবারে ঠিক জায়গাটিতে এসেছেন,' বললো মহিলা। 'নাপাতায় মুক্তার খুব চাহিদা, দামও ভাল। আর এখানকার তরুণ রাজা গান খুব ভালবাসেন।'

'তরুণ রাজা?' জিজ্ঞেস করলেন আসতি, 'তার নাম কী? পুরোনো রাজার কী হয়েছে?'

'মিরো-তে খুব বেশিদিন ছিলেন না মনে হচ্ছে,' সন্দিগ্ধ সুরে বললো মহিলা, 'থাকলে জানতেন পুরোনো রাজা এখন ওসিরিসের সাথে রয়েছেন, ঐ পিরামিডের নিচে। মিশরের ফারাওয়ের পাঠানো সেনাপতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধে পরাজিত করার পর রাজাকে ওখানে সমাহিত করেন। সেই সেনাপতিই এখন রাজা এখানকার। ওহ! সে এক অবিশ্বাস্য কাহিনী। তিন হাজার মিশরীয় সৈন্য নিয়ে এসেছিলেন সেই সেনাপতি। সঙ্গে ছিল কেশ যুবরাজের মমি করা মৃতদেহ। মনে হয় সেনাপতিই তাকে হত্যা করেছিলেন। শুনেছি দুজনই নাকি মিশরের রানীর পাণিপ্রার্থী ছিলেন। কেশ যুবরাজ নিহত হওয়ার পর রানী তাঁর এই সেনাপতিকে নাপাতায় এসে এখানকার রাজার কাছে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেন, যাতে রাজা তাঁর অপরাধের বিচার করতে পারেন। সেনাপতি তা-ই করেছিলেন। রাজা তাঁকে আমেনের পবিত্র জাহাজের মাস্তুলে ঝুলিয়ে ফাঁসির আদেশ দেন। সেনাপতি তখন বলেছিলেন, যদি রাজার ক্ষমতা থাকে তাঁকে ফাঁসি দেয়ার তাহলে তিনি ফাঁসিতে ঝুলতে রাজি আছেন। এরপর নাপাতার লোকদের সাথে মিশরীয়দের যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধে নাপাতার অনেক সৈন্য মিশরীয়দের পক্ষ নিয়েছিল। রাজা ছিলেন ভীষণ নিষ্ঠুর। এই কারণে তার ওপর অনেকেরই রাগ ছিল। সুযোগ পেয়ে তারা বিদ্রোহ করে বসে। শেষ পর্যন্ত মিশরীয় আর বিদ্রোহীরা জয়ী হয়। রাজা মারা যান যুদ্ধে। তখন সবাই মিশরীয় সেনাপতিকে সিংহাসনে বসায়।

'তাঁর নাম?—ও-হো একদম মনে পড়ছে না। এত নাম তাঁর, কয়টা মনে রাখা যায়? যা-ই হোক, দেখতে অসম্ভব সুন্দর। আর মাথায় কিছুটা ছিট থাকলেও সবাই তাঁকে ভালবাসে। এই তো, ফটক খুলছে। চলি তাহলে।' গাধার লাগাম ধরে টানতে টানতে ভিড়ের ভেতর হারিয়ে গেল কৃষক মহিলা।

তুয়া আর আসতিও ভিড়ের মধ্যে মিশে শহরে প্রবেশ করলেন। তাঁদের উট প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাগান ঘেরা এক চত্বরের সামনে পৌঁছুলো। চত্বরের এক ধারে অসাধারণ সুন্দর এক প্রাসাদ। এবার কোনদিকে যাবেন বুঝতে না পেরে উট থামিয়ে ফেললেন তাঁরা। এই সময় প্রাসাদের ফটক খুলে বেরিয়ে এলো একদল অশ্বারোহী। প্রত্যেকের গায়ে বর্ম।

'ওদের ঢালে কী লেখা দেখেছ?' ফিস ফিস করে বললেন আসতি।

দেখলো তুয়া। ঢালের ওপরে আঁকা রাজকীয় প্রতীকচিহ্নের ভেতর লেখা রয়েছে তার নিজের নাম আর নতুন উপাধি—*দেবতাদের পিতা আমেনের কৃপায় নাপাতার মহিয়সী নারী, উচ্চ ও নিম্ন ভূমির রানী,*

দক্ষিণের তোরণ উন্মোচনকারিণী নেতের-তুয়া।

'মনে হচ্ছে এখানেও আমার প্রজা আছে,' নিচু স্বরে বললো তুয়া।

এবার প্রাসাদের ফটক দিয়ে চমৎকার এক তেজী ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে এলো এক যুবক। দূর থেকেও তাকে চেনা চেনা মনে হতে লাগলো দুজনের।

'কে ও?' ঢোক গিলে বললো তুয়া।

'আমার মন বলছে ও আমার রামেস,' জিনের রশি শক্ত করে আঁকড়ে ধরে বললেন আসতি।

১৭

প্রেমাস্পদকে ফিরে পেলো তুয়া

কোন সন্দেহ নেই, অশ্বারোহী রামেস। বয়স বেড়েছে তার। সেই সাথে চেহারায় এসেছে কাঠিন্য। একটা বিষণ্ণতাও যেন চেপে বসেছে সেখানে। তারপরেও রামেস ও, আর কেউ নয়। ওদের চোখ জলে ভেসে যেতে লাগলো। হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠলো।

'আমরা কি পরিচয় দেবো?' জিজ্ঞেস করলেন আসতি।

'না, এখানে নয়, এখন নয়,' বললো তুয়া। 'ও বিশ্বাস করবে না। আর আমরাও এত মানুষের সামনে মুখের কাপড় সরাতে পারব না। তাছাড়া, আগে আমি আরও কিছু জানতে চাই। এখন চলে যাক।'

টগবগিয়ে ঘোড়া চালিয়ে রামেস চলে এলো দুই মহিলা যেখানে উটের পিঠে বসে আছে সেই জায়গায়। চলেই যাচ্ছিল সে, কিন্তু দুজনের অবয়বে কিছু একটা আছে যা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। দ্বিতীয়বার তাকালো সে। তারপর তৃতীয়বার। এবার তার চোখ দুটো স্থির হয়ে রইলো উটের পিঠে বসা অবগুণ্ঠন টানা দুই নারীর ওপর। অনেকটা ঝোঁকের বশেই লাগাম টেনে ঘোড়া নিয়ে তাদের সামনে এলো সে।

'এমন সুন্দর উট যাদের তারা কারা?' জিজ্ঞেস করলো রামেস।

মাথা নিচু করে ফেললো তুয়া, যাতে করে অবগুণ্ঠনের ভাঁজে তার মুখের ও দেহের গড়ন ঢাকা পড়ে যায়। তবে আসতি গলার স্বর একটু বিকৃত করে জবাব দিলেন, 'আমরা দুজনই পেশায় ব্যবসায়ী। একজন বীণা বাজিয়ে গান গাইতেও পারে। মিশরে তার এ-বিদ্যায় হাতেখড়ি। থিবিতেও ও গান শিখেছে। শুনেছি স্বর্ণ-নগরী নাপাতায় মুক্তার খুব

চাহিদা, আর এখানকার রাজা গান ভালবাসেন। সেজন্যেই আমরা নীলনদের উজান অঞ্চল থেকে এসেছি এই নগরীতে। কিন্তু আপনি কে, বলবেন কি?'

'আমিও মিশরীয়,' জবাব দিলো রামেস, 'আমি মিশরের রানীর হয়ে এই নগর শাসন করছি–না, যে রানীকে আমি চিনতাম এখন আর সে-রানী নেই, বরং বলা ভাল আমি শাসন করছি মিশরের ফারাওয়ের পক্ষে। গুপ্তচর মারফত খবর পেয়েছি, আমেনের নক্ষত্র, মানে রানী মেম্ফিসের কুমার আবিকে বিয়ে করেছেন। অবশ্য তারা এ-ও বলেছে, তাকে বিয়ে করার মজা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে আবি।' বলে হা হা করে তিক্ত এক হাসি হাসলো রামেস।

আসতি বললেন, 'অনেকদিন হয় আমরা থিবি ছেড়ে এসেছি–সত্যি কথা বলতে কি ব্যবসার কারণে কয়েক বছর ধরে দেশে দেশে ঘুরছি, তাই এসবের কিছুই জানা ছিল না। কিন্তু সত্যিই যদি আপনি এই শহরের প্রশাসক হয়ে থাকেন, আপনার দেশের মেয়ে হিসেবে আপনার প্রতি অনুরোধ আমাদের নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা করে দিন, আর বিকেলে অনুগ্রহ করে আপনার প্রাসাদে আমাদের একটু সময় দেবেন, আমরা আপনাকে মুক্তা দেখাব, পছন্দ হলে কিনবেন না হলে কিনবেন না। সেই সুযোগে আমার এই সঙ্গিনী আপনাকে মিশরের কিছু প্রাচীন সঙ্গীত শোনাবে।'

'আমি সৈনিক,' জবাব দিলো রামেস, 'আমার কাছে মুক্তার চেয়ে তরবারির মূল্যই বেশি। তাছাড়া, আমি একা থাকি, কোন স্ত্রীলোক নেই আমার বাড়িতে। যাহোক, তবু আমার দেশের খাতিরে, নাকি আমেনের ইচ্ছায়, বলতে পারব না, আপনার অনুরোধ আমি রাখবো। এখন আমি যুদ্ধের অনুশীলনে সৈন্যদের নিয়ে বাইরে বেরোচ্ছি। সন্ধ্যার পর আপনারা আসতে পারেন আমার প্রাসাদে, তখন দেখবো আপনাদের পসরা, গানও শুনবো।' ওর পেছন পেছন আসা এক সেনা কর্মকর্তাকে ডেকে রামেস বললো, 'এই মিশরীয়দের নিয়ে যাও, প্রাসাদের অতিথিশালায় এঁদের থাকার ব্যবস্থা কর। খেয়াল রাখবে কেউ যেন এঁদের বিরক্ত না করে। সন্ধ্যার পর নিয়ে আসবে আমার কাছে।'

টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল রামেস। সেনা কর্মকর্তা দুই নারীকে নিয়ে চললো রাজপ্রাসাদের অতিথিশালার দিকে।

সূর্য অস্ত গেছে। শাদার ওপর রাজকীয় লালে কাজ করা চমৎকার একটা পোশাক পরেছে তুয়া। উটের পিঠে করে যেসব জিনিসপত্র ওরা এনেছে

সেগুলোর ভেতর ছিল এই পোশাক। দীর্ঘ কেশরাশি আঁচড়ে খোপা করে তাতে সুগন্ধি দিয়েছে। গলায় পরেছে বড় মুক্তায় তৈরি একটা মালা। সাজসজ্জা শেষ করে মাথার ওপর টেনে দিলো ঘোমটা। তারপর হাতির দাঁত আর সোনায় তৈরি বীণাটা হাতে নিয়ে অপেক্ষায় রইলো, কখন রামেসের কাছ থেকে লোক আসে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। আসতিও অপেক্ষা করছেন। তবে তিনি পরেছেন সাধারণ কালো পোশাক, তার ওপর কালো ঘোমটা। একটু পরেই সেই সেনা কর্মকর্তা এলো। জানতে চাইলো, ওঁরা প্রশাসকের কাছে যাবার জন্যে তৈরি কিনা।

'প্রশাসক?' আসতি বললেন, 'আমি তো ভেবেছিলাম উনি রাজা।'

'রাজাই উনি,' বললো কর্মকর্তা, 'কিন্তু ওনার খেয়াল, নিজেকে বলেন আমেনের নক্ষত্র, মিশরের সিংহাসন দখলকারী আবির স্ত্রী নেতের-তুয়ার নিয়োগ করা প্রশাসক। যেখানে নিজের যোগ্যতায়ই ফারাও হতে পারেন সেখানে এভাবে নিজেকে নিচে নামিয়ে রাখাকে পাগলামি ছাড়া আর কী বলা যায়?'

'আমরা সাধারণ ফেরিওয়ালী, এসব বড় বড় ব্যাপারে নাক গলানো আমাদের সাজে না,' বললেন আসতি। 'ফারাও, সেনাপতি বা প্রশাসক–যা-ই হোন না কেন, তাঁর কাছে নিয়ে চলুন আমাদের।'

সেনা কর্মকর্তা প্রথমে তাদের নিয়ে গেল প্রাসাদের পাশের এক দরজার কাছে। সেখান দিয়ে ঢুকে বহু অলিপথ, সিঁড়ি আর কামরা পেরিয়ে যাওয়ার সময় তুয়া চিনতে পারলো বহু সৈনিক আর কর্মকর্তাকে। মিশরীয় সেনাবাহিনীর বাছাই করা সৈনিক তারা, তারই নির্দেশে রামেসের সঙ্গে এসেছিল। অবশেষে পৌঁছুলো ওরা অনাড়ম্বর মধ্যম আয়তনের একটি কক্ষে। আসন দেখিয়ে বসতে বললো কর্মকর্তা। একটু পরেই পাশের একটা দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো রামেস। শাদাসিধে মিশরীয় সেনাপতির পোশাক পরনে। তার ওপর কোন রাজকীয় চিহ্ন বা প্রতীক ওরা দেখতে পেলো না। কেবল তার কড়ে আঙুলবিহীন ডান হাতের অনামিকায় চক চক করছে একটি রাজকীয় আংটি–তুয়ার খুবই চেনা আংটিটা। রামেসের সাথে ঘরে ঢুকেছে কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা। তাদের সঙ্গে সামরিক বিষয়াদি নিয়ে কথা বলছে সে। দুই মহিলাকে দেখে সৌজন্যের সঙ্গে অভিবাদন জানিয়ে বসিয়ে রাখার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে বললো:

'কী যেন দেখাবেন আমাকে বলেছিলেন? ও, মনে পড়েছে, মূল্যবান রত্ন। মনে হচ্ছে, ভুল বাজারে নিয়ে এসেছেন আপনাদের পণ্য। নাপাতাকে যদিও স্বর্ণ-নগরী বলা হয়, কিন্তু যা সম্পদ এর আছে তা এর

নিজেরই প্রয়োজন। বাড়তি নেই। আমি নিজে সেনাপতির যা বেতন আর এই প্রাসাদ চালিয়ে নিতে যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি অর্থ রাজকোষ থেকে নেই না। তবু, নিয়ে যখন এসেছেন, দেখান আপনাদের জিনিস। আমি নিজে না কিনলেও কোন ক্রেতা হয়তো খুঁজে দিতে পারবো।'

রামেসের এই শাদাসিধে কথা শুনে আসতি আর তুয়ার হৃৎপিণ্ড এত জোরে স্পন্দিত হতে লাগলো যে কিছুক্ষণ তারা কোন কোন কথা বলতে পারলো না। অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকা ছিল বলে রক্ষা। ওদের বিপর্যস্ত চেহারা কেউ দেখতে পেলো না। অনেকক্ষণের চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিয়ে আসতি বললেন, 'আপনি না কিনলেও আপনার স্ত্রী বা প্রাসাদের কোন ভদ্রমহিলা হয়তো কিনবেন।'

মুহূর্তে রাগে মুখ লাল হয়ে উঠলো রামেসের। 'আগেই কি আপনাদের বলিনি আমার কোন স্ত্রী নেই, আর এই প্রাসাদে কোন মহিলা থাকে না?'

'তা আপনি বলেছিলেন,' বিনীত কণ্ঠে বললেন আসতি, আগের মতই বিকৃত গলায় কথা বলছেন তিনি। 'আপনার কথা বিশ্বাস করিনি বলে ক্ষমা করবেন। আমার মেয়ে আর আমি বহু দেশ ঘুরে বহু রাজা-রাজপুত্র দেখেছি। দেখেছি তাদের সবারই স্বভাব এর বিপরীত। তাই বিশ্বাস করতে পারিনি। তবু দেখাই আমাদের জিনিস, নিশ্চয়ই নাপাতার সব পুরুষ অবিবাহিত নয়।'

আর কিছু না বলে আসতি তাঁর পোশাকের তল থেকে সুগন্ধি মাখানো একটা সিডার কাঠের বাক্স বের করে তার ভেতর থেকে মুক্তা গেঁথে বানানো মিশরের রাজ-মুকুটের মত চেহারার একটা উষ্ণীষ বের করে আনলেন। টাট নগরীতে থাকার সময়ই ওটা তৈরি করেছিলেন ওঁরা। সঙ্গে কয়েকটা বড় আকারের মুক্তাও বের করলেন।

'সুন্দর বটে!' বললো রামেস। 'কিন্তু এই মুকুট পরার অধিকার আছে একজনেরই। উচ্চ ও নিম্ন ভূমির রানী তিনি।'

'কেন? তাঁর স্বামীরও নিশ্চয়ই তা পরার অধিকার আছে,' বললেন আসতি।

'যদ্দূর শুনেছি, তাঁর স্বামী মানে আবি। ওর থ্যাবড়া মাথায় এটা মানাবে না।' সকালের মতই তেতো হাসি হাসলো রামেস।

তার কথা শুনতে পায়নি এমন ভঙ্গিতে আসতি বললেন, 'এমনও তো হতে পারে বিরাট এক রাজ্য দখল করেছে যে সেনাপতি সে জোর করে দখল করে নিলো এই মুকুট এবং কেউ তাতে আপত্তি করলো না,

যেহেতু তার দেহে রাজরক্ত আছে।'

তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো রামেস আসতির দিকে। 'অদ্ভুত কথা বলছেন আপনি। নিশ্চয়ই কিছু ভেবে বলেননি। কিন্তু এই মুক্তা আমার জন্যে নয়, আরও ধনী কারো জন্যে। রেখে দিন এগুলো। তার চেয়ে বরং আপনার মেয়েকে গান করতে বলুন–মিশরের প্রাচীন গান। শুনবার জন্যে মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।'

'তা-ই হোক,' বললেন আসতি। 'তবে না কিনলেও উষ্ণীষটা আপনি উপহার হিসেবে রাখুন। আপনার জন্যেই এটা বানানো হয়েছে। তাছাড়া কে জানে?–ভবিষ্যতে এটা আপনার কাজে লাগতেও পারে। আপনার রাজ্যে ব্যবসা করার অধিকার পাওয়ার জন্যে উপহার হিসেবে এটা আমরা বানিয়ে এনেছি। এ-উপহার গ্রহণ না করলে আমার মেয়ে গান করবে না।'

'ওটা রাখুন। এ-নিয়ে পরে আলাপ করবো আপনার সঙ্গে। এখন গান।'

অবশেষে এলো তুয়ার পালা। বীণা হাতে উঠে দাঁড়ালো সে। সোনার তারগুলোর ওপর দিয়ে হাত বুলালো একবার। মৃদু-মধুর টুংটাং শব্দে ভরে উঠলো ঘর। আসতির মতই কণ্ঠ পরিবর্তন করে গান শুরু করলো তুয়া। মৃদু স্বরে ছোট একটা প্রেমের গান গাইলো সে। শিগগিরই তা শেষ হয়ে গেল।

'সুন্দর!' বললো রামেস। 'এ-গান শুনে আমার কী যে মনে পড়ে যাচ্ছে বলতে পারব না। কিন্তু আরও বড় কোন গান কি আপনার জানা নেই? থাকলে শুভরাত্রি জানানোর আগে শোনান না।'

তুয়ার মাথা ঝুঁকে পড়লো। জবাব দিলো প্রায় ফিস ফিস করে, 'যদি চান শোনাবো সেই পুরুষের কাহিনী, অনেক উঁচুতে হৃদয় সঁপে দেয়ার পরিণামে যার পতন হয়েছিল ক্রুদ্ধ দেবীর রোষে।'

'শোনান। অনেকদিন আগে একবার ওরকম একটা গান আমি শুনেছিলাম।'

আবার শুরু করলো তুয়া। সমস্ত মন-প্রাণ সঁপে দিয়ে গাইলো সেই গান, যেটা থিবিতে কেশ-যুবরাজের সম্মানে আয়োজিত ভোজসভায় গেয়েছিল। অপূর্ব মধুর মৃদু স্বরে গানের প্রথম পংক্তি শেষ হওয়ার আগেই হতচকিত রামেস দাঁড়িয়ে গেল। তুয়া গেয়ে চলেছে প্রেমকাতর নকলনবিশ কী করে গভীর রাতে প্রেমিকার খোঁজে লুকিয়ে মন্দিরের নিভৃতকক্ষে ঢুকে পড়ায় ক্রুদ্ধ দেবীর রোষে প্রাণ দিয়েছিল। একই সময় সুন্দরী পূজারিণী পেমাম্পদকে ভুলে থাকার শক্তি প্রার্থনা করতে মন্দিরের

নিভৃতকক্ষে এসে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় প্রেমিকের মৃতদেহের ওপর। প্রেমিককে মৃত দেখে সেখানেই মারা যায় পূজারিণী। এই বিষাদময় দৃশ্যে প্রেমের দেবীর মন গলে এবং তাদের প্রাণবায়ু ফিরিয়ে দেন। তবে অন্যলোকে চলে যাওয়া প্রাণকে আর পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব ছিল না বলে দেবী তাদের পাতালপুরীতে থাকার ব্যবস্থা করে দেন, এবং সেখানেই তাদের মিলন হয়।

ধীর লয়ে নিচু হতে হতে এক সময় মিলিয়ে গেল সঙ্গীতের রেশ। এই পুরোটা সময় স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে রামেস। মুখটা তার শাদা হয়ে গেছে। শরীর কাঁপছে অল্প অল্প। একটা থামে ভর দিলো সে। আর তুয়া অবসন্নের মত বসে পড়লো তার আসনে। হাত থেকে পড়ে গেল বীণা।

'এই বীণা আপনি কোথায় পেয়েছেন?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলো রামেস। 'নিশ্চয়ই এরকম বীণা দুটো নেই পৃথিবীতে। নিশ্চয়ই চুরি করে এনেছেন। না, কিন্তু তাহলে গান এবং গলাও চুরি করবেন কীভাবে? ক্ষমা করবেন আমাকে। আমি একটা অনুগ্রহ চাইবো–ভুল বুঝবেন না; আমার কোন দুরভিসন্ধি নেই, শুধু একটু অনুগ্রহ করবেন আমাকে, আপনার মুখখানা একবার দেখতে দিন।'

তুয়া কোন কথা বললো না, মুখের কাছে হাত তুলে অবগুণ্ঠনের বাঁধন আলগা করে দিলো শুধু। পায়ের কাছে পড়ে গেল কাল কাপড়টা। অসাধারণ মোহনীয় মুখটা অনাবৃত হলো। রামেসের দুই চোখ মিলিত হলো তার সাগর-নীল চোখ দুটোর সাথে। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত দুজন একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত।

'এ কী কৌশল আপনাদের!' নীরবতা ভাঙলো রামেস, গলায় ঝাঁঝ। 'আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আমেনের নক্ষত্র, মিশরের রানী। যে বীণা বাজিয়ে তিনি গান গাইলেন সেটা উপহার দিয়েছিল কেশ-এর যুবরাজ, সেই উপহার দেয়ার রাতেই যে আমার তলোয়ারে প্রাণ দিয়েছিল। কণ্ঠস্বর মিশরের, গান মিশরের! না, তা কী করে সম্ভব? আমি পাগল হয়ে গেছি, আর আপনারা যাদুর কৌশল দেখিয়ে আমাকে বিদ্রূপ করছেন। আমেনের নক্ষত্র তো হাজার মাইলেরও বেশি দূরে বসে শাসন করছেন। শুনেছি তাঁর বাবার হত্যাকারী আবিকে তিনি স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছেন! যাদুকরী ডাইনী, চলে যান এখান থেকে, নইলে, আমেনকে বিদ্রূপ করার অপরাধে আমেনের পুরোহিতদের নির্দেশ দেব আপনাদের আগুনে পুড়িয়ে মারার।'

ধীরে, খুব ধীরে তুয়া তার গলার কাছের আবরণ সরালো। তার

জন্মচিহ্ন, জীবনের প্রতীক অনাবৃত হলো। 'এই পবিত্র চিহ্ন যার দেহে আছে তাকে পুড়িয়ে মারার সাহস পাবেন আমেনের পুরোহিতরা? বলুন মার্মিসের পুত্র?' মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলো তুয়া।

'কেন না?' বললো রামেস। 'একটা ব্যাপারে বোকা বানানোর ক্ষমতা যাদের আছে তারা সব বিষয়েই বোকা বানাতে পারে। মিশরের সম্রাজ্ঞীর সৌন্দর্য যে চুরি করতে পারে সে তাঁর দেহের একটা চিহ্নও চুরি করতে পারে।'

'তাহলে, রামেস, বলো, তোমার হাতে ঐ যে রাজকীয় আংটি ওটা কি তুমি চুরি করেছ না কোন রানী তোমাকে ওটা উপহার দিয়েছে? যতটুকু জানি এককালে এক ফারাও ওটা পরতেন। আর ঐ হাতের কড়ে আঙুলটা কীভাবে খোয়ালে তুমি? থিবিতে কোন এক মন্দিরের গোপন পুকুরে বিশেষ এক পবিত্র প্রাণীর থাবায় নয় কি?'

অপেক্ষা করে আছে তুয়া। কিন্তু রামেস মুখ খুলেও কিছু বলতে পারলো না। অদ্ভুত এক জড়তা তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে।

'দাইমা,' একটু পরে আবার বললো তুয়া, 'এই প্রশাসককে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারছি না, আমিই মিশরের সম্রাজ্ঞী, আর কেউ নয়। এবার তুমি চেষ্টা করে দেখ।'

এবার আসতিও অবগুণ্ঠন সরালেন। তাঁর ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক চেহারা আর ধূসর চুলের দিকে বিস্ময়াবিষ্ট চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো রামেস। তারপর তীব্র এক চিৎকার 'মা! আমার মা! ওরা কসম কেটে বলেছিল তুমি মেম্ফিসে মারা গেছ!' বলে আসতির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে রামেস কেঁদে ফেললো হু হু করে।

ছেলের মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে আসতি বললেন, 'হ্যাঁ, বাপ, আমি তোর মা, যে তোকে গর্ভে ধরেছিল। আর আমার সাথে এই মেয়ে আর কেউ নয়, এ হচ্ছে সে, যার হৃদয় তোকে ভালবাসে, সেই শুরুতে যেমন বাসতো এখনও তেমনি বাসে। চাঁদের পর চাঁদ–পুরো দুই বছর–বিপদ আপদ তুচ্ছ করে, ভয়ঙ্কর মরুভূমি পার হয়ে এসেছে। অবশেষে ওর পিতা আমেন ওকে পৌঁছে দিয়েছেন তোর পাশে। এখন বিশ্বাস হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, মা।'

'তাহলে, বিশ্বস্ত সেনাপতি,' বললো তুয়া, 'মিশরের রানীর কাছ থেকে এই উপহার গ্রহণ করো। যেটা কিছুক্ষণ আগে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলে সেটা পরে নাও মাথায়, প্রভু হও আমার আর মিশরের।' বলে তুয়া মুক্তা দিয়ে মিশরের রাজমুকুটের আদলে তৈরি উষ্ণীষটা পরিয়ে

দিলো রামেসের মাথায়, যেমন দিয়েছিল থিবিতে সেই ভোরে যেদিন রামেস রওনা হয়ে আসে নাপাতার পথে।

রাত গভীর। তুয়া আর আসতির অবিশ্বাস্য অভিযান ও ভ্রমণের কাহিনী বলা মাত্র শেষ হয়েছে। 'এ-ই আমাদের কাহিনী, রামেস,' আসতি বললেন। 'এবার তোমার কাহিনী শোনাও।'

'আমার কাহিনী সংক্ষিপ্ত, মা। ঐ যে মহামান্য রানী,' তুয়ার উদ্দেশ্যে কুর্ণিশ করলো রামেস, 'ওঁর নির্দেশে নীলনদের ওপর দিয়ে এই শহরে এসে পৌঁছাই। বুড়ো রাজা তার ছেলের মৃত্যুর কথা শুনেই খেপে গিয়ে আমাকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু তার সেই নির্দেশ পালনের জন্য কেউ এগিয়ে আসার আগেই আমার সৈনিকদের নিয়ে তাকে আক্রমণ করি। তার কিছু সৈন্যও আমার সঙ্গে যোগ দেয়। তারপর আর কী? রাজা-মারা গেল। তাতে এখানকার কেউ তেমন দুঃখ পেয়েছে বলে মনে হয়নি। প্রজারা তার জায়গায় আমাকে বসিয়ে দিলো। সেই থেকে এখানকার মানুষের অভাব-অভিযোগ দূর করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। অনেক আগেই মিশরে ফিরে গিয়ে এই বিজয়ের সংবাদ দিতাম, কিন্তু গুপ্তচরদের কাছে ওখানকার খবরাদি শুনে আর যাওয়ার ইচ্ছে হয়নি। কী বলেছে শুনবে? বলেছে আবি আর তার সঙ্গী-সাথীরা জাদু করে ফারাওকে হত্যা করেছে, আর তাঁর মেয়ে, আমেনের নক্ষত্র, আমার কাছে যে শপথ করেছিল তা ভুলে প্রাণ আর সিংহাসন বাঁচানোর জন্যে তার বুড়ো চাচা আবিকে বিয়ে করেছে।'

'তুমি বিশ্বাস করেছিলে এসব?' জিজ্ঞেস করলো তুয়া।

'না করেই বা উপায় কী? সবাই শপথ করে বলেছে, তারা মেম্ফিসে এবং আরও কয়েক জায়গায় মহামান্য রানীকে সিংহাসনে বসে আবিকে নানা কাজে কুত্তার মত খাটাতে দেখেছে। আমি কী করে জানবো, ওটা রানী নয়, রানীর দ্বিতীয় সত্তা?'

'আমার মনে হয় আবি এতদিনে জেনে গেছে সে কাকে বিয়ে করেছে,' বললো তুয়া। 'কিন্তু আমরা এখন কী করবো?'

'প্রথমে আমাকে বিয়ে, তার পরেরটা পরে ভাবলে চলবে না?' পরামর্শ দিলো রামেস।

'হ্যাঁ, প্রতিশ্রুতিমত বিয়ে তোমাকে করবো, তবে একটা মাত্র জায়গায়, মিশরে আমেনের মন্দিরে। তার আগে আমার সিংহাসন উদ্ধার করে দাও।'

'সেটা করা যাবে,' বললো রামেস, 'কিন্তু কী করে তা আমি জানি

না। অন্য একজন বসে আছে তোমার সিংহাসনে, সে সরে যেতে না-ও চাইতে পারে।'

'ওকে আমরা একটা খবর পাঠিয়ে দেব, বাবা,' বললেন আসতি, 'এখন তুমি যাও, আমরা ঘুমাবো।'

'খবর যে পাঠাবে, কাকে দিয়ে পাঠাবে?' জিজ্ঞেস করলো রামেস।

'এত বছর ধরে তুমি আমাকে চেন, অথচ জান না আমার অনেক ভৃত্য আছে যাদের দেখা যায় না?'

মধ্যরাত। রামেসের প্রাসাদে নিজেদের ঘরে পাশাপাশি হাঁটু গেড়ে বসে দেবতাদের পিতা আমেনের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করছেন আসতি আর তুয়া। নিবেদন শেষ করে আসতি উঠে দাঁড়ালেন। রানী আহুরার আত্মার শিখিয়ে দেয়া মন্ত্র আবার উচ্চারণ করলেন, যেমন করেছিলেন মেম্ফিসে সেখেত মন্দিরের সুউচ্চ মিনারে। মন্ত্র শেষ হতে না হতেই ফিসফিসানি আওয়াজ উঠলো, অনেকটা পাখা ঝাপটানোর শব্দের মত। তারপর প্রদীপের আলোর ওপাশে কুয়াশার মতো কিছু একটা জমতে শুরু করলো। অল্প সময়েই তা রাজকীয় পোশাক পরা এক অপরূপা নারীমূর্তির অবয়ব নিলো। নেতের-তুয়ার মতো দেখতে সেই মূর্তি, তবে আরও বেশি গর্বিত আর অপার্থিব। চোখ দুটো চকচকে।

'কোথা থেকে এলে, ও দ্বিতীয় সত্তা?' জিজ্ঞেস করলেন আসতি।

'তোমার আদেশ যেখানে আমাকে খুঁজে পেয়েছে সেই আবির গৃহ থেকে। সে এখন থিবিতে, ভাবছে সে-ই ফারাও।'

'কেমন আছে আবি? আর মিশরেরই বা খবর কী?'

'আবির অবস্থা খুবই খারাপ। শান্তি বলে কিছু সে জানে না–সারাক্ষণ দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা আর যন্ত্রণা। তবে মিশর ভাল আছে–এত ভাল কখনও ছিল না। আমার ওপর যা যা আদেশ ছিল সব অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। এবার আমি যেখান থেকে আমাকে টেনে আনা হয়েছে সেখানে–ঐ বুকে গিয়ে বিশ্রাম নিতে চাই,' তুয়ার দিকে ইশারা করলো অবয়ব।

'এখনই না, ও দ্বিতীয় সত্তা, আরও কিছু কাজ রয়ে গেছে তোমার। এই ক'টা শেষ হলেই তুমি পাবে বিশ্রাম, পুনর্জাগরণের দিন পর্যন্ত। থিবিতে ফিরে গিয়ে আবি আর তার পরামর্শদাতাদের কানে কানে একটা মিথ্যে গল্প শোনাও। বলবে, মিশর থেকে যাকে কেশ রাজার কাছে পাঠানো হয়েছিল সেই রামেস কেশ দখল করে রক্তের অধিকারে নিজেকে ফারাও ঘোষণা করেছে, একই সাথে তোমার–মানে তুয়ার স্বামী

বলেও নিজেকে দাবি করেছে। বলবে, রামেস বলে বেড়াচ্ছে, আগের ফারাও, মানে তুয়ার বাবা তুয়ার সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই গল্প বলে আবিকে বোঝাও, যেন এখনই বিরাট এক সেনাবাহিনী নিয়ে রামেসকে দমন করার জন্যে দক্ষিণ দিকে রওনা হয়। এর মধ্যে গোপনে তুমি সেনাপতিদের বলবে, আবি যে অপরাধ করেছে তার জন্যে আমেন তার ওপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়েছেন। সময় মতই তিনি আবির্ভূত হয়ে এর শাস্তি দেবেন। বলবে, যারা আবির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে তারা তাঁর কৃপা পাবে। মিশরের দক্ষিণ-ফটকে, যেখান থেকে নীলনদ উত্তর দিকে বাঁক নিয়েছে সেখানে রামেস আবির সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হবে। তুমি যার ভেতর থেকে এসেছ সে, এবং যাকে তোমার মানতে হবে সেই আমিও থাকবো রামেসের সঙ্গে। আমাদের সবার চাইতে অনেক অনেক বড় যিনি তিনিও হয়তো থাকবেন। ঐ দক্ষিণের তোরণেই তোমার দায়িত্ব শেষ হবে। তুমি পাবে প্রার্থিত বিশ্রাম।'

'আপনার এ-নির্দেশ প্রতিপালিত হবে,' শান্ত-শীতল নিরাবেগ কণ্ঠে বললো তুয়ার কা। 'তবে, ও গোপন বিদ্যার অধিশ্বরী, স্বর্গের ইচ্ছা সম্পাদনকারিণী, বেশি দেরি করবেন না। যদি অতিরিক্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ি তাহলে ঐ বুকে ফিরে আসতে হবে অগ্নিশিখার মত, আর তাহলে পেছনে পড়বে ধ্বংস আর মৃত্যুর চিহ্ন।'

এরপর যেমন আবির্ভূত হয়েছিল তেমনি অস্পষ্ট হতে হতে একসময় মিলিয়ে গেল অবয়বটা।

সকাল হয়েছে থিবিতে। ফারাওয়ের প্রধান সচিবালয়ে বসে রাজকাজ দেখছে আবি। পাশে দাঁড়ানো প্রধানমন্ত্রী কাকু। মেফিসে ষড়যন্ত্র করে ফারাওকে হত্যা করার সময় যা ছিল তা থেকে আমূল বদলে গেছে দুজনের চেহারা। কাজ, ভয় আর দুর্দশায় আবির স্বাস্থ্য এমনই ভেঙে পড়েছে যে রাজকীয় পোশাক তার গায়ে ঢলঢলে হয়ে ঝুলে থাকে। আর কাকু এমনই থুত্থুরে বুড়ো হয়েছে যে হাঁটার সময় রীতিমত পা কাঁপে তার।

'শেষ হলো কাজ?' জিজ্ঞেস করলো আবি।

'না, মহানুভব,' জবাব দিলো কাকু, 'এখনও যা বাকি আছে তাতে দুপুর পর্যন্ত বসে থাকতে হবে আপনাকে। তারপর উপদেষ্টা আর রাজদূতদের সঙ্গে বৈঠক।'

'আজ আর পারব না ওদের সাথে দেখা করতে,' বললো আবি। 'কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুক ওরা। কাজ করাতে করাতে মেরে ফেলতে

চাও নাকি আমাকে? শুধুই যখন মেম্ফিসের কুমার ছিলাম, কত শান্তি ছিল তখন। আর এখন দিনে একটা ঘন্টাও বিশ্রাম পাই না।'

'মহানুভব,' বিনীতভাবে কুর্ণিশ করে বললো কাকু, 'ক্লান্ত হোন আর যা-ই হোন, ওঁদের সঙ্গে বৈঠকে আপনার বসতেই হবে। তেমনই আদেশ দিয়েছেন মহামান্য রানী। তাঁর আদেশ অমান্য করা সম্ভব হবে না।'

'রানী!' ভীত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে তাকাতে নিচু স্বরে বললো আবি। 'ওহ, কাকু, এই রানীকে যদি কখনও না দেখতাম তাহলেই শান্তি হতো। ও কোন মেয়েমানুষ নয়, আমার মনে হয় তুমি তা জান। বরফের মত ঠাণ্ডা আর কঠিন হৃদয় আর সাপের ধূর্ততা দিয়ে গড়া এক পিশাচী। আমাকে বলা হচ্ছে ফারাও, অথচ আসলে আমি তার আদেশ পালনের পুতুল ছাড়া কিছু নই। বলা হচ্ছে আমি তার স্বামী, আসলে ও আমার কেন কারও স্ত্রী নয়, অথচ প্রতিটা লোক ওকে ভালবাসে। এবং সেই ভালবাসাই তাদের কাল হয়। কাল রাতে আবার সে আমার সামনে থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল। আমি বসে বসে তার আদেশ নির্দেশ শুনছিলাম, হঠাৎ দেখি নেই। একটু পরেই আবার দেখি বসে আছে আগের জায়গায়। তবে একটু ক্লান্ত মনে হচ্ছিল তাকে। জিজ্ঞেস করলাম কোথায় গেছিল। বললো, এক বছরে আমি যতদূর যেতে পারব তার চেয়েও বেশি দূরে। আমাকে যতটা ঘৃণা করে ততটাই ভালবাসে যাকে গিয়েছিল তার কাছে। কে হতে পারে সেটা, কাকু?'

'মনে হয় রামেস। নিজেকে সে কেশ-এর রাজা বলে ঘোষণা করেছে,' ভয়ে ভয়ে জবাব দিলো কাকু। 'রানী যখন মানবী ছিলেন তখন ভালবাসতেন ছেলেটাকে। এখন যে তিনি কাকে ভালবাসেন তা কেবল শয়তানই জানে। আমরা সবাই এখন তাঁর কব্জায়। তাঁর কথামত কাজ না করলে মৃত্যু এড়ানো যাবে না। আর যা-ই হোক মৃত্যু আমাদের দুজনের কারোই কাম্য নয়–মৃত্যুর সিংহদরজার ওপারেই আমাদের অপেক্ষায় রয়েছেন ফারাও।'

গোঙানির মত একটা আওয়াজ বেরোলো আবির মুখ দিয়ে। পোশাকের কোনা দিয়ে মুখের ঘাম মুছে বললো, 'ঠিকই বলেছ তুমি। যাও, লিপিকরদের ডাকো, রানীর দেওয়া কাজ ফেলে রাখা যাবে না।'

কাকু রওনা হতে যাবে, এই সময় ঘোষকের চিৎকার শোনা গেল : 'মহামান্য রানী সবাইকে নিয়ে দরজার বাইরে অপেক্ষায় আছেন। তিনি তাঁর স্বামী, উচ্চ ও নিম্ন ভূমির ফারাওয়ের সাথে দেখা করার অনুমতি চাইছেন।'

আবি আর কাকু একে অন্যের দিকে তাকালো। দুজনেরই চোখে ফুটে উঠেছে হতাশা। 'মহামান্য রানীকে আসতে বলো,' নিচুস্বরে বললো আবি।

ঘোষক চলে গেল। পর মুহূর্তে দরজায় দেখা গেল রানীকে। যথারীতি অসাধারণ রূপ, জমকালো পোশাক আর রাজকীয় অলঙ্কারে সুশোভিত রানী। তার পেছনেই রয়েছে দিবারাত্রির পরিচারিকা মেরিত্রা। তার এক হাতে একটা বসার গদি, অন্য হাতে চামর। রানীর ইচ্ছা এই মহিলা কোন বিরতি বা বিশ্রাম ছাড়াই দিনরাত তার সঙ্গে থাকবে, তার কাজ করবে। এটাই এক আতঙ্ক, এর বাইরেও আবি আর কাকুর মত মৃত্যুভয় মেরিত্রাকেও সবসময় তাড়া করে ফেরে। ফলে এক কালে মেরিত্রার মুখটা সুন্দর থাকলেও এখন তাতে কালি পড়েছে, দেহের বাঁধুনি গেছে টুটে।

মেরিত্রার পেছন পেছন এলো রক্ষী আর উচ্চ মর্যাদার পুরোহিতরা। তাদের পর রাজপরিষদের সদস্যবর্গ এবং সেনাবাহিনীর অধিনায়কগণ। ধীর পায়ে কামরার মাঝ দিয়ে হেঁটে গিয়ে আবির সিংহাসনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো রানী। ইশারা করতেই আবির পায়ের কাছে গদি পেতে দিলো মেরিত্রা। গদির ওপর হাঁটু গেড়ে বসে রানী বললো, 'পতিব্রতা স্ত্রী হিসেবে স্বামী ফারাওয়ের কাছে একটা আর্জি নিয়ে এসেছি। পুরো দরবারের সামনেই তা বলতে চাই।'

'ওঠো, ওঠো,' শশব্যস্ত হয়ে বললো আবি। 'উঠে কথা বলো, রানী। আমার সামনে তোমার হাঁটু গেড়ে বসা মানায় না।'

'না, রানী হলেও ফারাওয়ের কাছে আর্জি ফারাওয়ের সামনে হাঁটু গেড়ে বসেই জানাতে হবে। সেটাই শোভন।' বললো বটে, তবে উঠেও দাঁড়ালো। তাড়াতাড়ি একটা আসন এনে দেয়া হলো। তাতে বসে রানী আবার বললো, 'মহামহিম ফারাও, কাল রাতে স্বপ্নে দেখলাম সেনাধ্যক্ষ রামেসকে। রামেস হচ্ছে মার্মিসের ছেলে, আমাদের বংশের আগে যারা মিশর শাসন করতো তাদের শেষ উত্তরাধিকারী। এই রামেস কেশ-এর যুবরাজকে হত্যা করেছিল। ফারাও অসুস্থ থাকায় রাজ-পরিষদের অনুমোদন নিয়ে আমি তাকে নাপাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, যাতে কেশ-এর রাজা তার বিচার করতে পারেন। কিন্তু মনে হচ্ছে কেশ-এর রাজা তার বিচার করতে পারেননি, বরং রামেসই তাকে হত্যা করে কেশ রাজ্য দখল করে নিয়েছে।

'স্বপ্নে দেখলাম, উচ্চাভিলাষী রামেস শুধু কেশ রাজ্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে রাজি নয়। সে আপনাকে হত্যা করবার জন্যে মিশর আক্রমণের

পরিকল্পনা করছে। মিশর দখল হয়ে গেলে প্রাচীন রক্তের অধিকারে সে নিজেকে ফারাও ঘোষণা করতে চায়। শুধু তা-ই নয় সিংহাসনের ওপর তার অধিকার যাতে নিরঙ্কুশ হয় সেজন্য সে আমাকে পেতে চায় তার স্ত্রী হিশেবে।'

আবি বললো, 'এই রামেস যেমন দুর্বিনীত বলে শুনেছি তাতে তার পক্ষে এমন পরিকল্পনা করা খুবই সম্ভব। তবে এ-নিয়ে তেমন উদ্বিগ্ন হবার কিছু আছে বলে তো মনে হয় না। কারণ এ-মুহূর্তে সে রয়েছে নাপাতায়, যেখান থেকে এখানে আসতে সময় লাগে কয়েক মাস। তাছাড়া তার সঙ্গে খুব বেশি সৈন্য নেই। তাহলে দুশ্চিন্তা কী?'

'মহান ফারাও, স্বপ্ন শুধু তো এটুকু নয়। স্বপ্নে আমি দুটো দৃশ্য দেখেছি। প্রথমত, রামেস থিবি আক্রমণ করে দখল করে নিয়েছে এবং আমাকে ধরে তোমার লাশের ওপর দিয়ে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় দৃশ্য হলো, তুমি তোমার সেনাবাহিনী নিয়ে দক্ষিণ ভূমির তোরণে রামেসের মোকাবেলা করে তাকে হত্যা করার পর কেশ রাজ্য এবং তার স্বর্ণ-নগরী দখল করে মিশরের অন্তর্ভুক্ত করছো, এবং মৃত্যুদিন পর্যন্ত তা শাসন করছো।'

'দুটো স্বপ্ন যদি থেকে থাকে তাহলে তুমিই বলো, রানী, কোনটাকে আমরা ধরব? দুটোই তো সত্যি হতে পারে না।'

'আমি তা কেমন করে জানবো? তোমার পক্ষেও জানা সম্ভব নয়। তবে তোমার পাশেই একজন আছেন, তার পক্ষে সম্ভব।' কাকুর দিকে ইশারা করলো রানী। 'উনি একই সঙ্গে যাদুকর এবং দেবতাদের ইচ্ছার ব্যাখ্যাকার। ওকেই বলো বিষয়টা পরিষ্কার করতে।'

'ম-ম-মহামান্য রা-রানী,' তোতলাতে তোতলাতে বললো কাকু, 'এ-এটা বড় উঁচু পর্যায়ের ব্যাপার। আমার জ্ঞান এর নাগাল পাবে না। আমি বলতে–'

'তুমি সবসময় অতিবিনয়ী, কাকু,' তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো রানী। 'মহানুভব ফারাও, ওকে আদেশ করো, যাতে ওর জ্ঞানের ছটায় আমাদের কিছুটা আলোকিত করে। আমার কোন সন্দেহ নেই ও সত্য জানে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও জানে,' বললো আবি। 'ও সবই জানে। কাকু, আর দেরি নয়, মহামান্য রানীর স্বপ্নের অর্থ ব্যাখ্যা করো।'

'আ-আমি পা-পারব না! ব-বলবো না!' তো তো করে বললো কাকু। 'আমার স্ত্রী মেরিত্রাকে বরং জিজ্ঞেস করুন। ঐ যে ওখানে। ও আমার চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখে এসব ব্যাপারে।'

'মেরিত্রার ব্যাখ্যা এর মধ্যেই আমি শুনেছি, বন্ধু,' বললো রানী। 'আমরা তোমার ব্যাখ্যা শোনার অপেক্ষায় আছি।'

আর এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। কিন্তু কী বলবে কাকু? রামেসের নামটাই যেন এক আতঙ্ক। তাই ও ঠিক করলো, স্বপ্নের ব্যাখ্যা করবে এভাবে, রামেস যতদিন না আক্রমণ করে ততদিন অপেক্ষা করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এর মধ্যে চলতে থাকবে যুদ্ধের প্রস্তুতি। কিন্তু কথা বলতে শুরু করেই কাকু অনুভব করলো রানীর জ্বলজ্বলে চোখ দুটো সেঁটে আছে তার মুখের ওপর। এরপর ওর নিজের অজান্তেই ওর মুখ দিয়ে স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা বেরোলো তা সে মোটেই বলতে চায়নি।

'আমার ভেতর একটা আলো উজ্বল হয়ে উঠেছে, মহানুভব,' বললো কাকু। 'সেই আলোয় আমি দেখতে পাচ্ছি, মহামান্য রানীর দ্বিতীয় স্বপ্নটাই সত্যি হবে। সেনাবাহিনী নিয়ে আপনার দক্ষিণ সিংহদ্বারে যাওয়াই উচিৎ। সেখানে আপনি জবরদখলকারী রামেসের মোকাবেলা করে তাকে তার নির্ধারিত পরিণতির দিকে এগিয়ে দেবেন।'

'নির্ধারিত পরিণতি! কিসের নির্ধারিত পরিণতি?' চিৎকার করে উঠলো আবি।

'নিঃসন্দেহে রানীর স্বপ্ন নির্ধারিত পরিণতি। আমার দায়িত্ব হচ্ছে আপনাকে দক্ষিণ সিংহদ্বারের দিকে অভিযানে যেতে বলা।'

'হতভাগা জ্যোতিষী, ঐ দক্ষিণ ফটক যদি তোর ওপর তৈরি করা হতো তাহলেই ভাল হতো,' আগের মতই চেঁচালো আবি। 'মাত্র দু'বছর আমি মিশর শাসন করছি, এর মধ্যে তিন তিনটে যুদ্ধ করতে হয়েছে। এই বয়েসে, এই শরীরে আবার আমাকে যুদ্ধে যেতে হবে! ফাজলামোর আর জায়গা পাও না? কুত্তা রামেস আসুক, তাকে আমি থিবির সিংহদ্বারে ফাঁসিতে ঝোলাবো।'

'না, না, মহানুভব ফারাও,' কাকু বললো, 'আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যেন আপনাকে বলি, আপনি তাকে ফাঁসিতে ঝোলাবেন থিবি থেকে শত শত মাইল দূরে মরুভূমির ভেতর। এটাই ঐ স্বপ্নের ব্যাখ্যা, এটাই দেবতাদের নির্দেশ।'

'দেবতা তাঁর প্রেরিত পুরুষের মাধ্যমে কথা বলেছেন,' বিজয়ীর ভঙ্গিতে বলে উঠলো রানী। 'এবার, ফারাও, পুরোহিতগণ, পারিষদবর্গ ও সেনাপতিগণ, প্রস্তুতি শুরু করুন দক্ষিণ সিংহদ্বারে যাবার। ঐখানে মরুভূমির ভেতর কুকুর রামেসকে ফাঁসিতে ঝোলাতে হবে। সেটা করা গেলেই মিশর এবং মিশরের সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর সামনে আর কোন বিপদ থাকবে না। স্বর্ণ-নগরীর সম্পদ আপনাদের সবার মধ্যে ভাগ করে দেয়া

হবে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যত শিগগিরই সম্ভব আমাদের রওনা হতে হবে! মহামান্য রানীও থাকবেন আমাদের সাথে,' সমস্বরে বললেন পুরোহিত, পারিষদ আর সেনাপতিরা। তাদের সবার ওপরে শোনা গেল কাকুর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। এবারও তার অনিচ্ছাতেই তার মুখ দিয়ে বেরোলো এই সম্মতি।

'হ্যাঁ, আমিও যাব,' বললো রানী। 'আমি নারী হতে পারি, তাই বলে আমার স্বামী ফারাও যে কাজে যাওয়ার সাহস দেখাচ্ছেন, আমি তাতে পিছ পা হতে পারি না। নতুন চাঁদ উঠলেই আমরা রওনা হবো।'

সেই রাতে আবি আর কাকু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। 'এ তুমি কী করলে কাকু?' বললো আবি, 'তোমার কি মনে নেই মেম্ফিসে আমার সেই ভয়ানক স্বপ্নে মৃত ফারাও তার মেয়েকে বিয়ে করতে বলার পাশাপাশি আর কী বলেছিল? তোমার কি মনে নেই, ফারাও বলেছিল স্ত্রীর অধিকারে আমি ততদিনই মিশর শাসন করতে পারবো যতদিন না মার্মিসের পুত্র রামেসের সাথে দেখা হয়। যখন দেখা হবে ওর সঙ্গে থাকবে এক ভিক্ষুক। আমার জন্যে কী এক বার্তা নিয়ে আসবে সে?'

'হ্যাঁ, মনে আছে,' নিরুপায় কণ্ঠে জবাব দিলো কাকু।

'কী বার্তা সেটা, বলো, কে নিয়ে আসবে, রামেস নাকি সেই ভিখিরি? আমার আর তোমার মৃত্যুবার্তা নয় তো? গতকাল আমাদের সমাধিগৃহ তৈরির কাজ শেষ হয়েছে।'

'হতে পারে, মহানুভব।'

'তাহলে তুমি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় কেন বললে রামেসের মোকাবেলা করতে এখনই আমাকে দক্ষিণে রওনা হতে হবে?'

'এছাড়া আমার আর উপায় ছিল না, মহানুভব,' গুঙিয়ে উঠলো কাকু। 'মোটেই আমি ঐ কথা বলতে চাইনি, রানী নামের ঐ আত্মা আমাকে দিয়ে তা বলিয়ে নিয়েছে। আবি, আমাদের রেহাই পাবার উপায় নেই। আমরা নিয়তির জালে বন্দী–যদি না, যদি না আপনি–'ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো কাকু আবির কোমরে ঝেলানো তলোয়ারে দিকে।

'না, কাকু, আমার সাহস নেই। যতক্ষণ পারা যায় বেঁচে থাকতে চাই। দক্ষিণের ফটকে কী অপেক্ষা করছে জেনেও ওখানে যাব আমি।'

'ঐ ফটকে আমাদের দেখা হবে রামেসের সাথে, প্রতিশোধ নেবে সে। আর দেখা হবে সেই ভিখিরির সাথে, যার কাছে আমাদের দুজনের জন্যে থাকবে ভয়ানক এক বার্তা।'

১৮
দেবতার বিচার

তিনমাস পর। ফারাওয়ের বিরাট বাহিনী তাঁবু ফেলেছে দক্ষিণ ফটকের কাছে। নীলনদের দুই তীরে নোঙর ফেলেছে শত শত যুদ্ধজাহাজ। যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। গুপ্তচরেরা খবর এনেছে, কেশ-এর রাজা রামেস দ্রুত ধেয়ে আসছে দক্ষিণ ফটকের দিকে। তবে তার সাথে সৈন্য খুব কম। এত কম যে সহজেই তাদের পরাস্ত করতে পারবে মিশরীয় বাহিনী। সুতরাং আরও এগিয়ে যাওয়ার কষ্ট না করে আবি অপেক্ষা করতে লাগলো। ভয়াবহ রানীও তাকে পীড়াপীড়ি করেনি।

ক'দিন পর এক সন্ধ্যায় যখন সূর্য ডুবছে, গুপ্তচর খবর নিয়ে এলো, রামেস তার বাহিনী নিয়ে এসে গেছে। নীলনদের ডান তীরের পাহাড়ী এলাকা দখল করে সেখানকার হাজার হাজার বছরের পুরোনো আমেন মন্দিরের কাছে তাঁবু ফেলেছে।

'ভালই হলো, কালই ফারাও গিয়ে ওকে শায়েস্তা করবেন। তাই না, ফারাও?' বলে রানী চকচকে চোখে তাকালো আবির দিকে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যত শিগগির এর শেষ হয় ততই ভাল,' বললো আবি। 'একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছি আমি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব থিবিতে ফিরতে চাই। তবে,' দুর্বল এবং অনিশ্চিত গলায় যোগ করলো সে, 'কেন জানি না এই যুদ্ধের ব্যাপারে মনে তেমন জোর পাচ্ছি না। কাকু, তুমি অমন একদৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছ কেন?'

পারিষদবর্গ এবং অন্য সবাই ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন প্রধানমন্ত্রীর দিকে। কাকুকে বেশ বিচলিত মনে হচ্ছে।

'দেখুন,' কম্পিত আঙুলে আকাশের দিকে ইশারা করলো সে।

সবাই দেখলেন, সন্ধ্যার লালিমার ঠিক উপরে জ্বল জ্বল করছে সুন্দর একটি তারা। তার কাছেই রয়েছে অন্য একটি তারা–একেবারেই নিষ্প্রভ সেটি। কয়েক মুহূর্ত পরেই মনে হলো হারিয়ে গেল তারাটা।

'আমেনের তারা,' ঢোক গিলে কম্পিত কণ্ঠে বললো কাকু, 'আর আপনার তারা, মহানুভব ফারাও। আমেনের তারা আপনার তারাকে গিলে ফেললো। আপনার তারা ডুবে গেছে, আর কখনও উঠবে না, কোন জীবিত মানুষ আর কখনও ঐ তারা দেখতে পাবে না। ওহ! আবি, বহু বছর আগেই আমি আপনাকে জানিয়েছিলাম, এরকম ঘটবে।

আপনার দিন শেষ, আবি, আপনার রাত ঘনিয়ে এসেছে।'

'তা-ই যদি হয়, কুত্তা, অবশ্যই সে-রাতের অংশীদার হবি তুই,' খেঁকিয়ে উঠলো আবি।

আবির কথা শেষ হতে না হতেই নারীকণ্ঠের তীব্র এক চিৎকার শোনা গেল। এগিয়ে আসছে চিৎকারের আওয়াজ। একটু পরেই ঝড়ের মত সেখানে ঢুকলো কাকুর স্ত্রী মেরিত্রা।

'দেবতাদের প্রতিহিংসা!' চিৎকার করে উঠলো সে। 'দেবতাদের প্রতিহিংসা নেমে আসছে! শুনুন, আবি, একটু আগে ভয়ানক এক স্বপ্ন দেখেছি। রাতে ঘুমাতে পারি না, তাই একটু ফাঁক পেয়ে শুয়েছিলাম বিকেলে। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলাম মৃত ফারাওয়ের আত্মা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। যাঁকে আমরা যাদুর কৌশলে হত্যা করেছি তিনি আমার সামনে এসে বললেন, "খুনী আবি, আর তোমার স্বামী বদমাশ যাদুকর কাকুকে গিয়ে বলো, আরেকটা সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই আমি তাদেরকে আমার কাছে আসার নির্দেশ দিয়েছি। তুমিও আসবে তাদের সঙ্গে।" মৃত্যু আপনার দরজায় পৌঁছে গেছে, আবি! মৃত্যু আর দেবতাদের ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ!' বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মেরিত্রা। ফেনা বেরোতে লাগলো মুখ দিয়ে।

প্রচণ্ড ভয়ে আবি পাগলের মত হয়ে গেল। 'যাদুকর-ডাইনী ওরা!' চিৎকার করে উঠলো সে। 'ওরা আমাকে যাদু করবে! ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখো দুজনকে। আর কাকুকে চাবকাও, যতক্ষণ না ওর সুমতি হয়। কাল রামেসকে হত্যা করার পর এই যাদুকরকে আমি জাহাজের মাস্তুলে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেব!'

হেসে উঠে রানী আবির কথারই প্রতিধ্বনি করলো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার স্বামী, কাল তুমি রামেসকে হত্যা করার পর এই যাদুকরকে মাস্তুলে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয়া হবে। ভয়ের কিছু নেই, যা-ই ঘটুক, আমি দেখবো যেন ফাঁসিটা হয়।'

আবি ও তার পারিষদদের সামনে থেকে তুলে এনে এক তাঁবুতে একটা বিছানায় শুইয়ে দেয়া হয়েছে মেরিত্রাকে। জ্ঞান ফিরে এসেছে তার। এক নারীমূর্তি ঢুকে তার পাশে দাঁড়ালো। চোখ তুলে মেরিত্রা দেখলো রানী দাঁড়িয়ে আছে।

'যা বলি মন দিয়ে শোনো,' বরফ শীতল কণ্ঠে বললো রানী, 'যা বলছি সব গিয়ে হুবহু আবিকে বলবে। বলবে, সময় হয়ে যাওয়ায় আমি তাকে ছেড়ে যাচ্ছি। আবার যদি ও আমেনের নক্ষত্র, মিশরের

মহামহিয়সী নারী নেতের-তুয়াকে দেখতে চায় তাহলে যেন রমেসের শিবিরে তাকে খোঁজ করে। পাহাড়ে শিবিরের মাঝখানে আমেন-মন্দিরে তাকে পাওয়া যাবে।'

অদৃশ্য হয়ে গেল রানীর অবয়ব।

হন্তদন্ত হয়ে বিছানা থেকে নেমে এমন চিৎকার জুড়লো মেরিত্রা যে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো রক্ষীরা। তক্ষুনি তাকে আবির কাছে নিয়ে যেতে বললো সে। শেষ পর্যন্ত এক রক্ষী গিয়ে বিষয়টা আবিকে জানালে সে এলো মেরিত্রার তাঁবুতে।

'আবার কী হলো, ডাইনী?,' জিজ্ঞেস করলো আবি। 'আরও কোন অশুভ স্বপ্ন দেখেছ?'

'না, ফারাও, স্বপ্ন নয়, রানী রামেসের কাছে পালিয়ে গেছেন!' এরপর হুবহু সে বলে গেল রানীমূর্তি তাকে যা বলতে বলেছে।

'মিথ্যা কথা!' চিৎকার করে উঠলো আবি। 'তিন সারি রক্ষাব্যূহ ভেদ করে পালাবে কী করে?'

'তাহলে খুঁজে দেখুন, মহানুভব ফারাও।'

খুঁজে দেখলো আবি। কেউ তাকে যেতে দেখেনি, তার সাথে কেউ ছিলও না, তবু কোথাও রানীকে পাওয়া গেল না। খোঁজ চলতে লাগলো। মাঝরাতের দিকে চাঁদের আলোয় দেখা গেল শতচ্ছিন্ন পোশাক পরা দীর্ঘদেহী এক মূর্তি শিবিরের ভেতর ঘোরাঘুরি করছে। বুক পর্যন্ত তার নেমে এসেছে শাদা দাড়ি, হাতে কণ্টকময় লাঠি।

'কে লোকটা?' আবি জিজ্ঞেস করলো।

আবির কথা শেষ হওয়ার আগেই ভারি ভরাট গলায় চিৎকার করে উঠলো মূর্তি, 'মিশরের পারিষদবর্গ, সেনাপতি ও সৈন্যগণ, শোন! আমেন তাঁর বার্তাবহ যাযাবর কেফারের মাধ্যমে নির্দেশ পাঠিয়েছেন, শোনো! কেশ-এর রাজা রামেসের বিরুদ্ধে কেউ তলোয়ার তুলবে না। সে আমার সেবক, তোমাদের ফারাও হবে, বিয়ে করবে তোমাদের রানীকে, পিতা হবে ভবিষ্যৎ রাজাদের। সিংহাসনের অবৈধ দখলদার, ফারাওয়ের হত্যাকারী আবিকে গ্রেপ্তার করো। সেই সাথে গ্রেপ্তার করো যাদুকর কাকু আর বিশ্বাসঘাতিনী মেরিত্রাকে। কাল সকালে ওদেরকে নিয়ে আসবে ঐ পাহাড়ের ওপর আমার মন্দিরে। মন্দিরের নিভৃতকক্ষে আমি তোমাদের প্রতি আমার পরবর্তী নির্দেশ জানাবো। আমার কথামত কাজ করলে শান্তি নেমে আসবে সারা মিশরে, তোমাদের নাকেও প্রাণবায়ু থাকবে।'

ভীতিকর এই কথা শুনে আবির মনে পড়ে গেল মৃত ফারাওয়ের

সেই ভবিষ্যদ্বাণী–এক ভিখিরি তার কাছে বার্তা নিয়ে আসবে। তলোয়ার বের করে অবয়বটার দিকে তেড়ে গেল সে। কিন্তু কাছে পৌঁছানোর আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল মূর্তিটা। সবাই শুনতে পেলো দূর থেকে ভেসে আসছে তার উচ্চারণ করা বার্তা। সেখানে ছুটে গেল সবাই। তখন বার্তা ভেসে আসছে জাহাজের ওপর থেকে। জাহাজের গলুইয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই দীর্ঘ অবয়ব–একবার এই জাহাজে, পরক্ষণে অন্য জাহাজে।

'দেবতা স্বয়ং কথা বলছেন!' চিৎকার করে উঠলো পুরোহিতরা। 'দেবতার নির্দেশ পালন করতে হবে!' লাফ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে তারা আবির ওপর চড়াও হয়ে তাকে ধরে বেঁধে ফেললো। কাকু আর মেরিত্রাকেও বেঁধে ফেলা হলো। তারপর সবাই অপেক্ষা করতে লাগলো ভোরের জন্য। শাদা দাড়িওয়ালা ভিখিরির পোশাক পরা মূর্তিটাকে কোথাও আর দেখা গেল না।

ঠিক সেই সময় পাহাড়ের ওপর আমেন-মন্দিরের এক কক্ষে ঘুমিয়ে আছে তুয়া। আসতি পাশে বসে তাকিয়ে আছেন তার মুখের দিকে। হঠাৎ এক ঝলক বাতাস যেন সাঁ করে ঢুকলো কামরার ভেতর। আসতি মুখ তুলে দেখলেন, বিছানায় ঘুমিয়ে আছে যে তুয়া হুবহু তার মতো দেখতে একটি অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সামনে।

'বলো, কী চাও তুমি?' জিজ্ঞেস করলেন আসতি।

'বিশ্রাম,' জবাব দিলো তুয়ার কা। 'কাজ শেষ। ভীষণ ক্লান্ত আমি। গোপন মন্ত্র উচ্চারণ করো, যাতে আমি ফিরে যেতে পারি যে বুক থেকে বেরিয়ে এসেছি সেখানে। ওখানে আমি ঘুমাবো পুনর্জাগরণের মহাদিন না আসা পর্যন্ত।'

তুয়ার কা-য়ের ফিরে যাওয়ার সময় যে হয়েছে তা আসতিও জানেন। তাকে তার জায়গায় ফেরত পাঠানোর গোপন মন্ত্র পাঠ করতে শুরু করলেন তিনি। আসতি মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করা মাত্র উজ্জ্বল অবয়বটা অস্পষ্ট হতে হতে এক সময় অদৃশ্য হলো। তুয়া উঠে বসলো বিছানায়। একবার আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলে আবার শুয়ে ঘুমিয়ে গেল। পরদিন সকালের আগে সে-ঘুম ভাঙলো না। ঘুম যখন ভাঙলো, মনে হলো ও যেন অন্য মানুষ।

'আমেনের নির্দেশে যা তোমার ভেতর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল কাজ শেষে সে আবার ফিরে এসেছে বলেই অমন মনে হচ্ছে,' বললেন আসতি। 'এখন উঠে পড়ো। সেজেগুজে নাও। আজ তোমার বিজয় আর বিয়ের দিন।'

সূর্য যখন উঠছে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো তুয়া। সুন্দর সকালটার চেয়েও সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। মন্দিরের ফটকে দেখা হলো রামেসের সঙ্গে। বর্ম পরে যুদ্ধের জন্য তৈরি। নিচ থেকে ভেসে আসছে অনেক মানুষের কোলাহল।

'কিসের আওয়াজ?' রামেসের চোখে চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো তুয়া। ওর নীল চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে প্লাবনের সময় নীলনদের উপচে পড়া পানির চেয়েও বেশি ভালবাসা।

'মনে হয় আবি আমাদের আক্রমণ করতে আসছে, রানী,' হাঁটু পর্যন্ত মাথা নুইয়ে বললো রামেস। 'তোমার জন্যে ভয় হচ্ছে আমার। আমাদের সৈন্য খুব কম, আর ওর রয়েছে বিরাট বাহিনী।'

'আবি বা অন্য কাউকে তোমার আর ভয় পেতে হবে না, রামেস, যদিও আজ তোমার স্বাধীনতা হারানোর দিন,' মিষ্টি একটু হেসে বললো তুয়া।

রামেস বুঝতে পারলো না শেষের কথায় কী বোঝাতে চাইলো তুয়া। ও আর কিছু বলার আগেই ওর বাহিনীর দুই কর্মকর্তা এলো ছুটতে ছুটতে। জানালো, আবির সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে শান্তি প্রস্তাব নিয়ে এসেছে এক দূতদল। তাদের নেতৃত্বে আছেন কয়েকজন পুরোহিত।

'আমার সেনাপতিদের আসতে বলো, আর পুরোহিতদেরও নিয়ে এসো,' নির্দেশ দিলো রামেস। 'তবে সবাইকে হুঁশিয়ার করে দাও। শান্তি প্রস্তাবের আড়ালে ওদের কোন কুমতলবও থাকতে পারে। এসো, রানী, তোমার সাথেই ওরা কথা বলবে, আমি তো তোমার কেশ প্রদেশের সাধারণ একজন সেনাপতি।'

তুয়াকে মন্দিরের ভেতর দিকের একটা মিলনায়তনে নিয়ে গেল রামেস। পাশেই মন্দিরের নিভৃত-কক্ষ। সেই কামরার সামনে একটা আসন পাতা। রামেসের অনুরোধে তুয়া মিশরের পরাক্রমশালী রানী হিসেবে বসলো সেই আসনে।

একটু পরেই রামেসের সেনা কর্মকর্তাদের সাথে সেখানে এলেন শান্তি-দূতেরা। তাঁদের সঙ্গে রয়েছে তিনটে ঢাকনা বন্ধ পালকি। তুয়া রামেস দুজনই খেয়াল করলো, মিশরের প্রধান পুরোহিতরা ছাড়াও দূতদলে রয়েছেন মিশরের প্রধান সেনাপতিরা। পালকি বহনকারী সৈনিকরা ছাড়া বাকি সবাই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে রানীকে সম্মান জানালেন। তারপর তাঁদের ভেতর থেকে এগিয়ে এলেন থিবির আমেন মন্দিরের সম্মানিত প্রধান পুরোহিত। তুয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন মাথা

নিচু করে। তুয়া হাত নেড়ে তাঁকে কথা বলার নির্দেশ দিলো।

'ও আমেনের ভোরের তারা,' শুরু করলেন প্রধান পুরোহিত, 'কাল রাতে আপনি আমাদের শিবির ছেড়ে আসার পর আমাদের কাছে এক দূত আসেন। দেবতাদের পিতা–'

'একটু দাঁড়ান, প্রধান পুরোহিত,' তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললো তুয়া, 'আপনার এবং অন্য সবার অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, আমি আপনাদের শিবির ছেড়ে আসিনি। আমি কখনও ছিলাম না ঐ শিবিরে। দীর্ঘ দুই বছর আমি পবিত্র মিশরের মাটিতে পা রাখিনি। হ্যাঁ, মৃত্যু এড়াতে এবং মৃত্যুর চেয়েও যা খারাপ, ফারাওয়ের হত্যাকারী, আমার চাচা আবির সঙ্গে বিয়ে এড়াতে আমি মেম্ফিস থেকে পালিয়ে আসি।'

প্রধান পুরোহিত ঘাড় ফিরিয়ে বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকালেন তাঁর সঙ্গীদের দিকে। অন্যরা তাকিয়ে আছেন রানীর দিকে।

'ক্ষমা করবেন আমাকে,' বললেন প্রধান পুরোহিত। 'এটা কী করে সম্ভব? দুবছর ধরে আমরা প্রতিদিনই আপনাকে আমাদের মাঝে দেখেছি আবির স্ত্রী হিসেবে।'

এবার তুয়া তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আসতির দিকে তাকালো। আসতি প্রধান পুরোহিতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকে তো চেনেন?'

'হ্যাঁ, মহোদয়া, আপনাকে আমরা চিনি। এক রাজকীয় বৃক্ষের শেষ শিকড় মার্মিসের স্ত্রী আপনি। এখানে আছেন কেশ রাজ্যের অধিপতি রামেস, যার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করতে এসেছি তাঁর মা আপনি। আমরা আপনাকে ভাল করেই চিনি। আপনি মিশরের সবচেয়ে বড় ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, গোপন বিদ্যার অধিশ্বরী। কিন্তু আমরা তো জানতাম ফারাও যেখানে মারা গেছেন আপনিও মেম্ফিসের সেই সেখেত-মন্দিরে মারা গেছেন। এখন বুঝতে পারছি যাদুশক্তিবলে আপনি কেবল অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন।'

'কী নিয়ে এসেছেন আপনারা?' পালকিগুলোর দিকে ইশারা করলেন আসতি।

'বন্দীদের বের করে সামনে আনো,' নির্দেশ দিলেন পুরোহিত।

ঢাকনা খুলে ফেলা হলো পালকির। সৈন্যরা সেগুলোর ভেতর থেকে বের করে আনলো আবি, কাকু আর মেরিত্রাকে। তিনজনেরই হাত বাঁধা। রানীর সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো তাদের।

'আমার বাবা ফারাওয়ের হত্যাকারী এরা, আমাকেও চরম লজ্জায় ফেলতে চেয়েছিল। এদেরকে কেন আনা হয়েছে আমার সামনে?'

বিরক্তির সঙ্গে বললো তুয়া।

'মহামান্য রানী, ঈশ্বরের দূত, ভিখিরির পোশাক পরা মানুষটি এমনই নির্দেশ দিয়ে গেছেন,' বললেন প্রধান পুরোহিত। 'এখন বুঝতে পারছি আপনার পিতা, ভালমানুষ ফারাওয়ের হত্যার বিচারের জন্যেই এদের এখানে আনতে বলা হয়েছে।'

'স্ত্রী কি কখনও স্বামীর বিচার করতে পারে?' জিজ্ঞেস করলো আবি।

'শুনুন, জনাব, আমি কখনোই আপনার স্ত্রী ছিলাম না,' বললো তুয়া। 'কী করে আপনার স্ত্রী হবো যেখানে ফারাও মারা যাওয়ার পর থেকে আপনাকে আমি দেখিইনি? শুনুন, সবাই শুনুন সেই আশ্চর্য কাহিনী। আমার জন্মের সময় আমেন আমার মধ্যে একটা কা দিয়েছিলেন–প্রধান পুরোহিত, আপনার তো বিষয়টা জানার কথা। আমেন চেয়েছিলেন আমার এই কা–অর্থাৎ সত্তার মধ্যেকার সত্তা আমাকে সবসময় বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করবে। বিপদ যখন এলো, আমার পালক মা আসতি, যাদুকরী আসতি, তাকে ডেকে আনলেন। আমার স্বর্গীয় গর্ভধারিণী আহুরার আত্মা তাঁকে যে মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন সেই মন্ত্রবলে আসতি আমার কা-কে ডেকে আনেন, এবং যেখানে আমি ছিলাম তাকে সেখানে থেকে গিয়ে আবিকে বিয়ে করতে বলেন। বুঝতে পারছেন, আবি কোন রক্ত-মাংসের নারীকে বিয়ে করেনি? এমন এক স্ত্রী সে পেয়েছিল, পৃথিবীর কোন মানুষ যা কখনও পায়নি। আমেন আমাকে এবং আমার দাইমাকে রক্ষা করেন। রা-য়ের তরণীতে করে পৌঁছে দেন দূরের দেশে। পরেও না কষ্ট আর বিপদ-আপদ থেকে আমেন আমাদের রক্ষা করেছেন। শেষে আমরা পৌঁছাই নাপাতা নগরীতে। সেখানে দেখা পাই আমার এক অনুগত সেবকের, ঘটনাক্রমে যে অনেক আগে থেকে আমার ভালবাসার পাত্র।' রামেসের দিকে তাকিয়ে হাসলো তুয়া।

'এর মধ্যে আমার ছায়া, আমার দ্বিতী সত্তা, তাকে যে কাজ দেয়া হয়–মিশর শাসন করা আর আবির সর্বনাশ ঘটানো–তা সে নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেছে। গত রাতে সে আমার ভেতর ফিরে এসেছে, আমার জীবনকালে তাকে আর কেউ দেখতে পাবে না, তবে মৃত্যুর পরে আমার সমাধিমন্দিরে গেলে তার দেখা পাওয়া যেতেও পারে। এখন আপনারাই বিবেচনা করুন আমার এই কাহিনী সত্যি কিনা আর আমি সত্যিই আমেনের কন্যা নেতের-তুয়া কিনা।'

গলার কাছের কাপড় সরিয়ে ফেললো তুয়া। সবাই দেখলো তার বুকের ওপর দিকের পবিত্র চিহ্নটা। বলে চললো সে, 'প্রধান পুরোহিত

এই চিহ্ন চেনেন। আমার জন্মের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন।'

বৃদ্ধ পুরোহিত এগিয়ে এসে ভাল করে দেখে বললেন, 'সেই চিহ্নই। এখানে আপনাদের সামনে আলো ছড়াচ্ছেন আমেনের নক্ষত্র, আর কেউ নন। কিন্তু অনেক কিছুই এখনও আমাদের অজানা রয়ে গেছে। আসতি, আপনি পুরো ঘটনা আমাদের শোনান।'

আসতি একটু সামনে এগিয়ে বলতে শুরু করলেন। কোন কিছুই বাদ দিলেন না। তারপর রামেস বললো তাঁর কাহিনী। তার সঙ্গে সামান্য যোগ করলো রানী নেতের-তুয়া। সবার কাহিনী যখন শেষ হলো তখন সূর্য মাথার ওপর উঠে এসেছে। তবু কেউ ক্লান্ত হয়নি, কেবল আবি, কাকু আর মেরিত্রা ছাড়া। এই তিনজন প্রতিটা শব্দে শুনেছে মৃত্যু।

অখণ্ড নীরবতা মিলনায়তনে। কারো মুখে কথা নেই। প্রধান পুরোহিত এতক্ষণ মাথা নিচু করে শুনছিলেন। এবার উপর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন:

'ও আমেন, এই রানীর আত্মার পিতা, আপনার অভিপ্রায় কী জানান, যাতে আমরা শিখতে পারি, প্রতিপালন করতে পারি।'

আবারও কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা। হঠাৎ পেছনের নিভৃত-কক্ষ, যেখানে দেবতার প্রতিমা রয়েছে, সেখান থেকে পাথরের মেঝেতে লাঠি ঠোকার আওয়াজ ভেসে এলো। নিভৃত-কক্ষের পর্দা সরে গেল। সেখানে দেখা গেল অতিপ্রাচীন এক শ্মশ্রুমণ্ডিত অবয়ব। চোখ দুটো পাথরের মত ভাষাহীন, পরনে ভিখিরির শতচ্ছিন্ন পোশাক। ইনি সেই বৃদ্ধ যিনি মরুভূমিতে দেখা হওয়ার পর তুয়া ও আসতির খাবার খেয়ে নিয়েছিলেন, যিনি মরু-রাজ্যের রাজার কবল থেকে তাদের রক্ষা করেছিলেন, যিনি গত রাতে আবির শিবিরে গিয়ে ঈশ্বরের নির্দেশ শুনিয়ে এসেছিলেন।

'আমি সেই বার্তাবহ, সৃষ্টির শুরু থেকে যাকে কেফার নামে ডাকা হয়,' বললেন তিনি। 'আমি মরুপ্রান্তরের বাসিন্দা, যাকে তোমাদের পূর্বপুরুষরা চিনতো, চিনবে উত্তরপুরুষরাও। আমি দান ভিক্ষা করে নেই, এবং জীবন ও মৃত্যুর মাধ্যমে তা পরিশোধ করি। আমি লিপিকর থটের কলম, ওসিরিসের চাবুক। আমি দেবতাদেরও দেবতা আমেনের কণ্ঠস্বর। মিশরের মানুষ, শোনো, অকারণে বা সামান্য কারণে এত কিছু ঘটানো হয়নি। তোমরা জেনে নাও, এসবের পেছনে আছে স্বর্গের বিশেষ পরিকল্পনা, পৃথিবীতে বিচার আর বিচারের পর দণ্ডবিধান। ঈশ্বরের একনিষ্ঠ সেবক ফারাওকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে তারই ভাই, যাকে সে বিশ্বাস করেছিল। ফারাওয়ের কন্যা, আমেনেরও কন্যা নেতের-তুয়াকে ঠেলে দেয়া হয়েছিল চরম অবমাননার মধ্যে। রাজকীয় বংশের

উত্তরাধিকারী রামেসকে পাঠানো হয়েছিল, যাকে সে ভালবাসে এবং যে তাকে ভালবাসে তার থেকে অনেক অনেক দূরে বিপদ আর মৃত্যুর মুখে। এ-সবই ঈশ্বরের নির্দেশ। এই নির্দেশের পরিণতি হলো শুভ পরিণয়ের মাধ্যমে এই যুগল মিশরকে তাদের ঐতিহ্য হিসেবে গ্রহণ করবে, নিয়ে আসবে অপার শান্তি আর সফলতা। তবে হত্যাকারী আর যাদুকরদের–' আবি, কাকু আর মেরিত্রার দিকে ইশারা করলেন তিনি, 'ওদেরকে রেখে দেয়া হোক আমেনের নিভৃতকক্ষে। কী প্রাপ্য তিনি পাঠান তাদের জন্যে তার অপেক্ষায় থাকবে তারা।'

কথা শেষ করেই যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানে চলে গেলেন কেফার। সেই প্রজন্মের কেউ আর কখনও তাঁকে দেখেনি।

কেফারের নির্দেশ মত আবি, কাকু আর মেরিত্রাকে বাঁধন খুলে ঠেলে দেয়া হলো অন্ধকার নিভৃতকক্ষে দেবতার বিরাট প্রতিমার সামনে। বন্ধ করে দেয়া হলো দরজা। ভেতরে তারা আর্তনাদ করে কাঁদতে কাঁদতে অভিশাপ দিতে লাগলো। আর বাইরে প্রধান পুরোহিত রামেস আর তুয়ার হাত মিলিয়ে দিয়ে তাদের চিরদিনের জন্য স্বামী-স্ত্রী হিশেবে ঘোষণা করলেন।

বিয়ের পর সোনার রথে চেপে নবদম্পতি ফারাও ও তার রানী মিশরীয়দের সংবর্ধনায় যোগ দিলো, এবং অল্প আগে যারা থিবির পথে রওনা হয়েছিল এগিয়ে গিয়ে তাদের আনুগত্য গ্রহণ করলো। রাতেই তারা ফিরে এসে পাশাপাশি বসে যোগ দিলো বিয়ের ভোজে। আরও একবার তুয়া তার হাতির দাঁত আর সোনায় তৈরি বীণা বাজিয়ে সেই প্রাচীন প্রেমের গানটা গাইলো।

রামেস আর আমেনের ভোরের তারা তুয়ার মিলনে স্বর্গেও আনন্দের ফল্গুধারা বয়ে গেল। হাজার হাজার বছর আগে তারা অমর্ত্যলোকে চলে গেলেও সেই আনন্দধারা এখনও তাদের সাথী হয়ে আছে।

কিন্তু পরদিন ভোরবেলা আসতি যখন বিরাট দরজা খুলে আমেনের নিভৃতকক্ষে উঁকি দিলেন ভয়াবহ এক দৃশ্য তাঁর চোখে পড়লো। বিশাল দেব-প্রতিমার পায়ের কাছে পড়ে আছে ভ্রাতৃঘাতি আবি, জাদুকর কাকু, আর বিশ্বাসঘাতিনী মেরিত্রার মৃতদেহ। তারা নিজেরাই নিজেদের অথবা একজন আরেকজনকে হত্যা করেছে। দেবতার পাথুরে চোখদুটো তাকিয়ে আছে সেই দিকে।

***

অনুবাদ

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

মর্নিং স্টার

রূপান্তর: নিয়াজ মোরশেদ

রানী নেতের-তুয়া প্রাচীন মিশরীয় দেবরাজ আমেন-এর কন্যা।
ছেলেবেলার খেলার সাথী রামেসকে ভালবেসে বড় হলো,
বাবা ফারাওয়ের ইচ্ছায় হলো রানী। রামেসের দেহে রাজরক্ত থাকলেও
তুয়া আর রামেসের মিলনের পথে বাধা দুস্তর মরুভূমিসম।
কিন্তু কোন বাধা মানতে রাজি নয় আমেনের ভোরের তারা নেতের-তুয়া।
এদিকে মেম্ফিসের কুমার আবি বিয়ে করতে চায় তুয়াকে।
থিবি থেকে বাবা ফারাওয়ের সাথে মেম্ফিসে বেড়াতে এসেছিল তুয়া,
ঘৃণ্য কৌশলে তাদের বন্দী করল আবি। ফারাওকে হত্যা করল
জ্যোতিষী কাকুর জাদুর সহায়তায়, নেতের-তুয়া আর তার দাই মা
আসতিকে করল না খাইয়ে মারার ব্যবস্থা।
স্নেহধন্য কন্যাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন দেবরাজ আমেন।
শতাব্দী আগে মিশরের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া কেশ রাজ্যকে মিশরের
কোলে ফিরিয়ে আনল নির্বাসিত রামেস।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০